

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهِ

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত

(কাদিয়ানী ধর্মমত সম্পর্কে ত্রিশটি প্রশ্নের দালীলিক উত্তর)

সংকলক

হযরত মাওলানা আব্বাস ওসায়ী

অনুবাদক

বাহাউদ্দিন যাকারিয়া

ভাইস প্রিন্সিপাল

খানকাহ্ সিরাজিয়া

বনানী, ঢাকা

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত

(কাদিয়ানী ধর্মমত সম্পর্কে ত্রিশটি প্রশ্নের দালীলিক উত্তর)

সংকলক

হযরত মাওলানা আব্বাহ ওসায়্যাহ

অনুবাদক

বাহাউদ্দীন যাকারিয়া

ভাইস প্রিন্সিপাল

প্রকাশনায়

খানকায়ে শিরাজিয়া বনানী ঢাকা

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-২

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত

(কাদিয়ানী ধর্মমত সম্পর্কে ত্রিশটি প্রশ্নের দালীলিক উত্তর)

সংকলক :

হযরত মাওলানা আব্বাহ ওসায়া

সম্পাদনায় :

হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ

শাইখুল হাদীস, বাবুল উলুম

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবিদ

শিক্ষক, তাফসীর বিভাগ জামিয়া খায়রুল মাদারিস মুলতান

হযরত মাওলানা মুফতী নিয়ামউদ্দীন শামযাই রহ.

শাইখুল হাদীস, বিনুনুরী টাউন করাচী

অনুবাদক :

বাহাউদ্দীন যাকারিয়া

ভাইস প্রিন্সিপাল

জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ

মিরপুর ঢাকা-১২১৬

স্বত্ব : অনুবাদক

প্রকাশকাল :

জানুয়ারী ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ

সফর ১৪৩৩ হিজরী

পৌষ ১৪১৮ বাংলা

প্রকাশনায় :

খানকায়ে শিরাজিয়া

১. আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়ক (বিরউত্তম শহীদ জিয়াউর রহমান সড়ক)

ঢাকা-১২১৩. ফোন : ৮৭১২৮৭৩

ধানমণ্ডি আ/এ, সড়ক নং ৯/এ, বাড়ি নং ১০৯

ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৯১১৩৬১৩

মূল্য : ২৫০ (দুইশ পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমীরে খতমে নবুওয়ত, শাইখুল মাশাইখ
হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ.
কায়েদে খতমে নবুওয়ত, মুজাহিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী রহ.

ড. সৈয়দ মুহাম্মদ আলী রহ,
মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান রাহিমী রহ.

ও জনাব শামছুজ্জোহা খান রহ.
এর পরলৌকিক শান্তি কামনায়।

শাইখুল মাশাইখ হযরতে আকদাস
মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ.-এর
অভিমত

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم

المرسلين. اما بعد

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসাই ইমানের ভিত্তি। উম্মত একদিকে যেভাবে দ্বীন ইসলামের সংরক্ষণ করে যাচ্ছে, অপরদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা, তাঁর সম্মানের সুরক্ষার দায়িত্বও অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পালন করে যাচ্ছে। তাঁর জীবদ্দশাতেই ভণ্ড নবীর ফেৎনা দেখা দেয়। কিন্তু উম্মত ভণ্ড নবুওয়তের দাবীর সূচনা হতেই আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণের লক্ষ্যে কুরবানী দিতে কোন প্রকার কার্পন্য করেনি। বিগত শতাব্দিতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়তের দাবী যখন করেছিল, আলহামদুলিল্লাহ তখন হতেই উম্মতের সকল চিন্তাশীল মহল বিশেষ করে উলামায়ে দেওবন্দ বলিষ্ঠভাবে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আলমী মজলিসে তাহাফুফুয়ে খতমে নবুওয়ত বহুবীধ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। সম্প্রতি খতমে নবুওয়তের মুবাশ্শিগ শ্লেহাস্পদ মাওলানা আল্লাহ ওসায়্য বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের মুরব্বীদের অনুরোধে ত্রিশটি প্রশ্নের উত্তরে উক্ত গ্রন্থ ‘আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত’ নামে সংকলন করেন। ফকীর প্রার্থনা করছে, আল্লাহ পাক যেন তাঁর এ প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমীন! ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যভাজন হবার মাধ্যম হবে। আমি সকল মুসলমান বিশেষ করে আমার সম্পৃক্তদেরকে বলব, তারা যেন এ গ্রন্থ অবশ্যই পাঠ করে। আল্লাহ তাআলা সংকলক এবং বিভিন্নভাবে সহায়তাকারীদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

ফকীর আবুল খলীল খান মুহাম্মদ
খানকায়ে সিরাজিয়া কুন্দিয়ান

পীরে তরীকত, শাইখে কামেল হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বাহলুভী রহ.-এর খলীফা
হযরত মাওলানা আবেদ দা.বা.-এর

অভিমত

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى اله
واصحابه اجمعين. قال النبي ﷺ انا خاتم النبيين لا نبي بعد. اما بعد!

নবী করীম সাব্বান্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্বই সৃষ্টিকুলের জন্য অগণিত খায়ের ও বরকতের মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে সকল নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, তা গণনা করা অসম্ভব। তিনি নবী হবার সাথে সাথে আবার সায্যিদুল মুরসালীনও বটে। এর সাথে সাথে খতমে নবুওয়তের মুকুটও তাঁর মাথায় পড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এরই বদৌলতে তাঁকে এমন উচ্চ মর্যাদা-সম্মান দেয়া হয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। উম্মতে মুহাম্মদীয়া প্রথম দিবস হতেই নবুওয়তের রাজ সিংহাসনকে সুরক্ষার জন্য সর্বপ্রকারের কুরবানী দেয়াকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করে আসছে। বিগত শতাব্দিতে ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। সে সময় মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়তের দাবী করে আরেকবার উম্মতে মুসলিমার বিবেককে নাড়া দেয়। অবস্থা এতোই নায়ুক ছিল যে, রাষ্ট্রীয় আইন বেঙ্গল-গান্ধারদের পক্ষে ছিল। তবুও নবী প্রেমিক উম্মতকে দমিয়ে রাখা যায়নি। মৃত্যুর পরওয়া করেনি। অবিভক্ত ভারতে আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণে হযরত মাওলানা সায্যিদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

ভারত বিভক্তির পর কাদিয়ানী ফেতনা পাকিস্তানে নব উদ্যোগে মাথাচারা দিয়ে উঠে। এ সময়ে উলামায়ে কেরাম সোচ্চার হয়ে উঠেন। ১৯৫৩ সালে গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ পরিস্থিতিতে মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়ত নামে একটি সংগঠন দাঁড় করানো হয়। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠাতারা খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণের নিমিত্তে কিছু যুগান্তকরী কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। যার ওপর ভিত্তি করে উলামায়ে কেরাম অত্যন্ত সাহসিকতা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাদিয়ানী ফেতনার বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালিয়ে যান। এর সুফল দেশ-বিদেশের মুসলমানরা পেতে থাকে। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয় কিছু আইন যা গান্ধারদের পক্ষে চলে যেত।

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-৬

কিন্তু ১৯৭৪ সালে চূনাবনগর স্টেশনে কাদিয়ানী মাস্তানরা সাধারণ মুসলমানের ওপর নগ্ন হামলা চালালে এমন গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়, যার ফলে কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আলমী মজলিসে তাহাফুযে খতমে নবুওয়ত আজ অবধি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আদালতে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরী খোলা হয়। কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সাপ্তাহিক ‘খতমে নবুওয়ত’ নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

এর সাথে সাথে উলামায়ে কেরামকে এ বিষয়ে আরো সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। তাই বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের দায়িত্বশীলদের নিকট আকীদায়ে খতমে নবুওয়তকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করা হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে বুনিয়াদী জ্ঞান লাভ হবে। বিশেষ করে যারা এ ময়দানে কাজ করে তারা উপকৃত হবেন।

আলহামদুলিল্লাহ! বেফাক কর্তৃপক্ষ এতে সম্মত হন। নতুন আঙ্গিকে পুরাতন তথ্যগুলো উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে ত্রিশটি প্রশ্ন তৈরী করা হয়।

হযরত খাজা খান মুহাম্মদ রহ.-এর নির্দেশে হযরত মাওলানা আল্লাহ ওসায়্যা অত্যন্ত মেহনত করে ত্রিশটি প্রশ্নের উত্তর তৈরী করেন। যার নাম দেয়া হয় ‘আইনায়ে কাদিয়ানীয়ত’। এ বিষয়ের ওপর যারা কাজ করেন, তাদের অবশ্যই জানা আছে যে, বুনিয়াদীভাবে তিনটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়ে থাকে। (১) মিথ্যার মিথ্যা। যাতে কুফরের নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত। (২) খতমে নবুওয়ত, (৩) হায়াতে ঈসা আ.। আলহামদুলিল্লাহ! মাওলানা আল্লাহ ওসায়্যা এ তিন বিষয়ের ওপর দালিলীক আলোচনা করেছেন। উলামায়ে কেরামও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। ২০০১ সালের অক্টোবরে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি পুনরায় উলামায়ে কেরামের খেদমতে পেশ করা হয়। বেফাকের প্রধান মাওলানা সলিমুল্লাহ খান খুবই ব্যস্ততার মাঝে এর কিছু ত্রুটি সনাক্ত করে তা শুদ্ধ করে দেন। এ ছাড়াও হযরত মাওলানা ইউসুফ লুথিয়ানভী রহ.-এর জানেশিন হযরত

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-৭

মাওলানা সাঈদ আহমদ জালালপুরীও গ্রন্থটি আদ্যপান্ত পাঠ করেন এবং কিছু সংশোধনী দেন। মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জালন্ধরী রহ.-এর পুত্র হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান জালন্ধরী, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ, শাইখুল হাদীস মাওলানা মুফতী নেযামউদ্দীন শামযাই রহ. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আহমদ, মাওলানা মনজুর আহমদ চিনিউটী রহ. এবং আল্লামা খালেদ মাহমুদও পাঠ করেন। আমিও এটি আদ্যপান্ত পাঠ করি। প্রয়োজনে কিছু সংজ্ঞায়ন এবং বিয়োজন করি। ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। এটি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় এডিশন। দেশব্যাপী খতমে নবুওয়তের ওপর উলামায়ে কেরামকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এর দ্বারা তারা উপকৃত হবেন। মূলতঃ এ গ্রন্থটির মাধ্যমে এ বিষয়ের ওপর উলামায়ে কেরামের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হবে। এটাই শেষ স্তর নয়। এর জন্য আরো পড়াশুনা করতে হবে।

বাস্তব কথা হচ্ছে আকাবিরে দেওবন্দ এ ময়দানে যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, সে সম্পর্কে এ প্রজন্মের উলামারা সম্পূর্ণরূপে বেখবর। এ বিষয়ে যদি এখনই সচেতন না হওয়া যায়, তবে ভবিষ্যত প্রজন্ম না জানি এ ফেতনায় পুনরায় শিকার হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা শহীদে খতমে নবুওয়ত হযরত মাওলানা ইউসূফ লুথিয়ানভী রহ.কে উত্তম প্রতিদান দান করুন। যিনি ‘দারুল উলূম দেওবন্দ এবং তাহাফুফুয়ে খতমে নবুওয়ত’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ‘আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত’ কে সাধারণ এবং বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্য উপকারী করে দিন। এবং সংকলককে তাঁর নৈকট্যভাজন করে নিক। আমীন!

মুহাম্মদ আবেদ গুফিরা লাহু
শিক্ষক, জামিয়া খায়রুল মাদারিস
খাদেম, হযরত বাহলভী রহ.

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের জেনারেল সেক্রেটারী হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ হানীফ জালদারীর অভিমত

কাদিয়ানীদের প্রতারণা, ধোঁকা থেকে সাধারণ মুসলমানকে সতর্ক করা এবং 'খতমে নবুওয়তের রাজশ্রাসাদে' আক্রমণকারীদের হিংস্র থাবা থেকে মুসলমানদের ঈমানের হেফাযত করা একটি উত্তম ইবাদত। এ দায়িত্ব পালনের সূচনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হতেই শুরু হয়েছে। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে ভণ্ড নবী মুসাইলামা কায্যাবের প্রতিরোধের জন্য সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ জারী করেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে খলীফাতুল মুসলিমীন সায়্যিদেনা আবু বকর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তানুযায়ী মুরতাদ এবং খতমে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। এ ফেতনা সমূলে দমন ব্যতীত তরবারী কোষবদ্ধ করেননি। পরবর্তীতে যারাই নবুওয়তের দাবী করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও দূর্বীর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। মিথ্যা, ভণ্ডনবীর দাবীদারদের একজন হল মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধনে ভারতবর্ষে সে নবুওয়তের দাবী করে। মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৮৯১ সালে মসীহ মাউদ এবং ১৯০১ সালে নবুওয়তের দাবী করে। উলামায়ে কেরাম কাদিয়ানী ফেতনার সূচনালগ্ন হতেই মুসলমানদের সতর্ক এবং তাদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় কোন অবহেলা করেননি। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় এরা ক্যাসারের ন্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। উলামায়ে কেরামের সময়মত সজাগ হওয়া এবং তৎপরতার বরকতে সাধারণ মুসলমান কাদিয়ানীদের প্রতারণা, ধোকা, হঠকারিতা সম্পর্কে অবগত হয়। উম্মতের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাদিয়ানী সম্প্রদায় গান্ধার, বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়। মির্খা কাদিয়ানীও নিজেই নিজে একটি পৃথক ফেরকা মনে করে। মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে যারা না মানবে, তাদেরকে কেবল কাফেরই বলে ক্ষান্ত হয়নি; তাদেরকে বেশ্যার সন্তান, কুকুরের বাচ্চা, হারামযাদা

বলেছে। তার অনুসারীদের তাদের জানাযার নামায পড়া হতেও বারণ করেছে।

বাস্তব কথা হল, উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের মূল ভিত্তিই হল ‘আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত।’ যে ব্যক্তি দ্বীনের অত্যাৱশ্যকীয় বিষয়াবলী এবং খতমে নবুওয়তের ওপর নিঃশর্ত এবং দ্বিধাহীনভাবে ঈমান রাখবে, তাকেই মুমিন বলা হবে। চাই সে যে কোন মাসলাক এবং মাযহাবের অনুসারী হোক না কেন। কিন্তু যে ব্যক্তি এ ঐক্যকে ভাঙতে চায়, যিল্লী-বুরুখীর আবরণে খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ ৯০ বছর আন্দোলন-সংগ্রাম করার পর ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানী এবং লাহোরী গ্রুপকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা দেয়।

পাকিস্তান সংসদের এ সিদ্ধান্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের রায় ছিল না; বরং এটি গোটা দেশ ও মুসলিম মিল্লাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল। সারা দুনিয়ার মুসলমান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী এবং রসূল বলে বিশ্বাস করে। কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাঁকে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস করে না। আজ অবধি তারা সরল-সোজা মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্য বলে বেড়ায় ‘আমরাও তো কলেমা পড়ি। তবুও কেন মুসলমান হব না?’ অথচ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকদের এ কথা ভালভাবেই জানা আছে যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের মৌলিক এবং বুনিয়াদী আকীদাকে অস্বীকার করবে তাকে কেবল কলেমা পাঠের দ্বারা মুসলমান বলা হয় না।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের এ জাতীয় প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকা এবং মুসলমানকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সকলের জন্য জরুরী। বেশ কিছু দিন ধরে দাওরায়ে হাদীস ফারেগ ছাত্রদের কাদিয়ানী ফেতনা সম্পর্কে কেবল প্রাথমিক ধারণা অর্জনই নয়; বরং তাদের মিথ্যার অসারতা সম্পর্কে দলীল-প্রমাণভিত্তিক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছে। যাতে একজন আলেমে দ্বীন হিসেবে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতারণা, ভণ্ডামি, কুফরকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে এবং আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে কাদিয়ানীদের

অপপ্রচারের দাতভাজা উত্তর প্রদানে সক্ষম হয়ে উঠে। সেমতে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তানের আবেদনে মাখদুমুল উলামা হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ.-এর নির্দেশে মজলিসে তাহাফুফুয়ে খতমে নবুওয়তের মুবািল্লিগ হযরত মাওলানা আল্লাহ ওসায়া 'আইনায়ে কাদিয়ানীয়ত' সংকলণ করেন। গ্রন্থটি অধ্যয়নের পর এ বাস্তবতা কারো নিকট অস্পষ্ট থাকবে না যে, ইসলামের ইমারত আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ ইমারত ধ্বংসের অপচেষ্টা চালাবে, উম্মতে মুসলিমা কোন অবস্থাতেই বরদাশত করবে না।

এমনিভাবে এ গ্রন্থে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ধোকা, প্রতারণা, মিথ্যা বক্তব্য, মিথ্যা ভবিষ্যদ্বানীর গোমর ফাক করে দেয়া হয়েছে। কাদিয়ানী ফেতনার মোকাবেলায় ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থটি দাওরায়ে হাদীস ফারেগ নবীন আলেমদের জন্য পাথয়ের ভূমিকা রাখবে।

আল্লাহ তাআলার দরবারে এ প্রার্থনা সংকলক, প্রকাশক, সম্পাদনকারী সকলকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং কাদিয়ানী ফেতনার মূলত্বপাটনে পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের ন্যায় অনবদ্য ভূমিকা রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ জালদারী

সেক্রেটারী জেনারেল

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান

মুহতামিম, জামিয়া খায়রুল মাদারিস মুলতান

১৯/১০/১৪২৪ হিজরী

আলমী মজলিসে তাহাফুযে খতমে নবুওয়তের আমীর, খানকায়ে
শিরাজিয়া কুন্দিয়ান শরীফ পাকিস্তান-এর সম্মানিত পীর
হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ.-এর
সুযোগ্য সাহেবযাদা

হযরত মাওলানা আযীয আহমদ দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

উপমহাদেশ পাক, ভারত, বাংলাদেশে সকল ফেৎনার মাঝে সবচেয়ে
মারাত্মক ফেৎনা খতমে নবুওয়ত আকীদার অস্বীকার করা। এর সাথে
সাথে দ্বীনের স্বীকৃত বিধান জিহাদ ইত্যাদিকেও অস্বীকার করা।

আজকে সবচেয়ে প্রয়োজন হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সত্তা, সম্মান, ইজ্জত-আব্রার সংরক্ষণ করা এবং এর জন্য সর্বাত্মক
পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ প্রয়োজনীয়তা এবং কর্তব্যবোধের দাবী হল
কাদিয়ানী সম্প্রদায় কর্তৃক উত্থাপিত নানান প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং তাদের
ষড়যন্ত্র, ধোঁকা, প্রতারণা, প্রবঞ্চণা হতে সাধারণ মুসলমানকে সতর্ক করার
প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হতে ত্রিশটি প্রশ্ন বাছায়
করে গ্রন্থাকারে দালীলিক উত্তর লেখা হয়। এ মহান দায়িত্ব পালন করেন
খতমে নবুওয়তের মুবাল্লিগ হযরত মাওলানা আল্লাহ ওসায়া দামাত

বারাকাতুহ্ম। এ গ্রন্থটি ইংরেজি, আরবী এবং ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষায় অনুবাদের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। সে মতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবদ মিরপুর ঢাকা-এর নায়েবে মুহতামিম হযরত মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া দামাত বারাকাতুহ্মকে অনুবাদ করার অনুরোধ করলে তিনি সম্মতি প্রদান করেন। কম্পিউটার কম্পোজ এবং এর সৌন্দর্যবর্ধনসহ যাবতীয় দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয়। তিনি ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত মেহনত করে অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন, এ জন্য হৃদয়ের গভীর হতে শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন!

এ গ্রন্থটি মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের জন্য দুর্লভ উপঢৌকন হিসেবে পরিগণিত হবে। এর সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

খানকায়ে সিরাজিয়া (সিদ্দীকে আকবর ফাউন্ডেশন) বনানী, ঢাকা মুসলিম সমাজের সম্মুখে এটি ছাপিয়ে প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের পরিশ্রম কবুল করুন এবং মুক্তির উসিলা হিসেবে পরিগণিত করুন। আমীন!

আযীয আহমদ
খানকায়ে সিরাজিয়া বনানী ঢাকা
০৬-০৫-২০১১ঈ.

জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মিরপুর ঢাকা'র
সম্মানিত মুহতামিম, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ'র
(বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) সহ সভাপতি
হযরত মাওলানা মোস্তফা আজাদ দা.বা.- এর

অভিমত

দীন ইসলামের মূল নীতিমালাসমূহের মাঝে অন্যতম নীতি হচ্ছে মহান আল্লাহর একত্ববাদ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। তিনিই সায়্যিদুল মুরসালীন এবং খাতামুলবীয়ীন। নবীকুল শিরোমনী এবং সর্বশেষ নবী। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করলে যেমন কেউ মুসলমান পরিচয় প্রদানের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তেমনিভাবে যদি কেউ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী না মানে, তাহলে সেও নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পারে না। ইসলামের পরিভাষায় এ বিশ্বাসকেই 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত' বলা হয়। এ আকীদায়ে খতমে নবুওয়তই হচ্ছে উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের মূল ভিত্তি। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই মুসলিম উম্মাহ আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণের জন্য সব ধরনের কুরবানী দিয়ে আসছে। যখনই কেউ নবুওয়তের দাবী করেছে তখনই মুসলিম উম্মাহ প্রত্যাখ্যান করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নস্যাত করার জন্য মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দিয়ে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করায়। মিথ্যা, ভণ্ড নবীর দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বৃটিশ বেনিয়া খ্রীষ্টান শক্তির সহায়তায় পরাধীন মুসলমানদের মাঝে ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। শত প্রতিকূলতার মাঝেও তৎকালীন উলামায়ে কেরাম কাদিয়ানী ফেৎনার সূচনা থেকেই

মুসলমানদেরকে সতর্ক করতে থাকেন এবং ভয়াবহ এ ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

ভারত বিভক্তির পর কাদিয়ানী ফেৎনা পাকিস্তানে নতুন উদ্যমে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ইংরেজ সৃষ্ট কাদিয়ানী ফেৎনার মুকাবেলার জন্য আলেম সম্প্রদায় ‘মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়ত’ নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করেন এবং তারা মানুষের ঈমান-আকীদা হেফযতের জন্য সারা দেশব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলশ্রুতিতে কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা করা হয়।

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা বর্তমান সময়ে ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান বিধর্মীরা যে কাজ করতে সাহস পায় না, কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলিম পরিচয়ের আবরণে অবলিলায় সে কাজটি করে যাচ্ছে। তারা নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় দাবী করে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদের নামে বিকৃত ব্যাখ্যাসহ কুরআন ছাপিয়েছে। আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত বিরোধী বই-পুস্তক ছেপে বাংলাদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে মুরতাদ বানাচ্ছে। কাদিয়ানীদের ঈমান বিধ্বংসী এসব বই-পুস্তক বাজেয়াপ্ত করার জন্য আমরা অতীতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে জোর দাবী জানিয়েছি। এখনো দাবী করছি কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণের।

কাদিয়ানী ফেৎনা বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা, মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী রহ. কাদিয়ানীদের ঈমান বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য ‘খতমে নবুওয়ত আন্দোলন পরিষদ’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টি করেন। পবিত্র কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং কুফরী মতবাদগুলি উল্লেখ করে বই-পুস্তক রচনা করেছেন এবং মুসলিম জনসাধারণের ঈমান-আকীদা হেফযতের জন্য ব্যাপকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান-আকীদা হেফযতের জন্য এ সব বই-পুস্তক, লিটারেচারের প্রচার, প্রসারের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আলমী মজলিসে তাহফফুযে খতমে নবুওয়তের আমীর, কুন্দিয়ান শরীফের পীর, শাইখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ.-এর সুযোগ্য সাহেবযাদা হযরত মাওলানা আযীয আহমদ সাহেব প্রতি বছরই দ্বীনি সফরে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং কুন্দিয়ান শরীফের ভক্ত-মুরিদদের ঈমান-আকীদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উন্নয়নের জন্য ফিকির করেন।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, খতমে নবুওয়তের মুবাল্লিগ হযরত মাওলানা আল্লাহ ওসায়া কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত ‘আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত’ নামক বইটি সুযোগ্য আলেমে দ্বীন, জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মিরপুর ঢাকা-এর নায়েবে মুহতামিম মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া সাহেবকে মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদ করার আবেদন করেছেন ভাই আযীয আহমদ সাহেব। উর্দু ভাষায় রচিত মূল বইটি প্রশ্ন উত্তরের আঙ্গিকে রচনা করা হয়েছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জনাব মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করে ছাপার উপযোগী করেছেন। মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে আমি বঙ্গানুবাদটি পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! অনুবাদ সাবলীল, সুন্দর এবং সুখপাঠ্য হয়েছে। বইটি যদিও স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে, তবুও এটি সর্বস্তরের পাঠকের উপকারে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নতুন প্রজন্মসহ সর্বস্তরের মুসলমান ভাই-বোনদের ঈমান-আকীদা হেফাযতের লক্ষ্যে বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং নাযাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

মোস্তফা আজাদ

০১/০১/২০১২

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما

“মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন; বরং আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে জ্ঞাত।” -আহযাব-৪০

عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله انه سيكون فى امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي

“হযরত সওবান রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যা নবীর দাবীদার হবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলবে। অথচ আমিই হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পরে কোন রকমের নবী নেই।” -আবু দাউদ খ. ২, পৃ. ২২৮; তিরমিযী খ. ২, পৃ. ৪৫.

عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ان الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي

“হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রেসালত ও নবুওয়ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমার পরে না কোন রসূল আসবে না কোন নবী।” -তিরমিযী খ. ২, পৃ. ৫১

عن ابى امامة الباهلى عن النبى قال انا اخر الانبياء وانتم اخر الامم

“হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযি. হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা হলে সর্বশেষ উম্মত।” -ইবনে মাজাহ পৃ. ২৯৭

عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله يا ابا ذر اول الرسول آدم
واخرهم محمد

“হযরত আবু যর রাযি. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু যর! সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ।” -কানযুল উম্মাল খ. ১১, পৃ. ৪৮০

কুরআন শরীফের আয়াত এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। যার ধারাক্রম হযরত আদম আ. থেকে শুরু হয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। তাঁর রেসালত কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। তাঁর পরে কোন ধরণেরই নবী আগমনের সুযোগ নেই। যে মুসলমানের অন্তরে এ কথা বাসা বাধবে যে, তাঁর পরে নবুওয়ত-রেসালতের সুযোগ আছে, সে ইসলামের সীমা হতে খারিজ হয়ে যাবে। মুরতাদ হবার অপরাধে তওবা না করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

এর ওপরই ভিত্তি করে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদারের নিকট দলীল-প্রমাণ তলবকারীকেও ইসলামের সীমা হতে খারিজ বলে ফতুয়া প্রদান করেছেন। মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ‘খতমে নবুওয়ত’ নামক গ্রন্থে অসংখ্য আয়াত এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর পরে কোন নবী-রসূলের আগমনের সম্ভাবনা নেই।

শেষ বয়সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা নবীদাবীদার আসওয়াদে আনাসীকে হত্যার নির্দেশ জারী করে এ কথাই সুস্পষ্ট করেছেন যে, ইসলামী শরীয়তে মিথ্যা নবীদাবীদারকে হত্যা করা ওয়াজিব। তাঁর বিদায়ের পর উম্মত যে বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তা ছিল আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত। রসূলের জানেশীন, প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর রাযি. মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যার

জন্য জিহাদের ঘোষণা প্রদান করেন। সাহাবায়ে কেলাম এ ঘোষণার সাথে কেবল ঐক্যমতই পোষণ করেননি; বরং তারা সতঃস্কূর্তভাবে সে জিহাদে অংশগ্রহণও করেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নে এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, চৌদ্দশ বছরের মুসলিম শাসনামলের কোন সময় এমন যায়নি যে, নিম্নোক্ত বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেননি “তাঁর পরে আর কেউ নবুওয়ত-রেসালত লাভে ধন্য হবেন না। যে কেউ নবী বা রসূলের দাবী করবে, সে ইসলামের সীমানা হতে খারিজ”।

আল্লামা আলী কারী শরাহ ফিকহে আকবরের ২০২ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন:

دعوة النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع

“আমাদের নবীর পর নবুওয়তের দাবী করা সর্বসম্মতভাবে কুফর।”

হাফেয ইবনে জায়ম উন্ডোলসী রহ. الفضل في الملل والاهواء والنحل এর প্রথম খন্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেন:

قد صح عن رسول الله ﷺ ينقل الكواف التي نقلت نبوته واعلامه وكتابه انه اخبر انه لا نبى بعده الا ما جاءت الاخبار الصحاح من نزول عيسى عليه السلام الذى بعث الى بنى اسرائيل وادعى اليهود قتله و صلبه فوجب القرار بهذه الجملة وصح ان وجود النبوة بعده عليه السلام باطل لا يكون اليه

“যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত, নিদর্শন এবং করআন মজীদ বর্ণনা করে আসছেন, তাদের বর্ণনা দ্বারা তাঁর এ ঘোষণাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর পরে কোন নবী প্রেরিত হবে না। অবশ্য বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, হযরত ঈসা আ. অবশ্যই (আকাশ হতে) অবতীর্ণ হবেন। যাকে বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। ইহুদীরা যাকে হত্যা এবং সূলীবিদ্ধ করার দাবী করে। এ কথা সকলেরই অবশ্যই স্বীকার করা ওয়াজিব যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুওয়তের অস্তিত্ব মিথ্যা এবং কখনো সম্ভব নয়।”

হাফিয় ফযলুল্লাহ তুরপশতী ‘আল মুতামিদ ফিলমুতাকিদ’-এর ৯৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “মোটকথা, আকীদা হল এ কথা বিশ্বাস করা যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই, কোন রসূল নেই এবং কেউ রসূল হিসেবে প্রেরিত হবে না। খাতামুলনবীয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি নবুওয়তের ওপর মোহর এটে দিয়েছেন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়ত পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। অথবা এও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের ওপর তাঁরই মাধ্যমে মোহর এটে দিয়েছেন। আল্লাহর মোহর এটে দেয়া এ কথারই নির্দেশ প্রদান করে যে, তাঁর পরে কোন নবী প্রেরণ করা হবে না।”

ফতুয়ায়ে আলমগীরির ২য় খণ্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে যে-

اذا لم يعرف الرجل ان محمدا ﷺ اخر الانبياء فليس بمسلم او قال انا رسول الله او قال بالفارسية من پیغمبرم یرید به من پیغام برم یکنفر.

“হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করবে না সে মুসলমান নয়। যদি বলে, আমি রসূল অথবা ফারসীতে বলে, আমি পয়গম্বর। আর এর উদ্দেশ্য হল আমি পয়গাম (আল্লাহর বাণী) পৌঁছাই, তবে সে ব্যক্তিও কাকের হয়ে যাবে।”

শাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব ‘মুগনিউল মুহতাজ শরহে মিনহাজ’-এর ৪র্থ খণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে:

(او) نفی (الرسول) بان قال لم يرسلهم الله نفى النبوة نبى او ادعى نبوة بعد نبينا ﷺ او صدق مدعيها او قال للنبي ﷺ اسود او امرد او غير قریشی او قال النبوة مكتسبة او تنال رتبها بصفاء النبوت او وحي ولم يدع نبوة (او کذب رسولا) او نبيا او اوسبه او استخف به او باسمه او باسم الله (کفر)

“অথবা কোন ব্যক্তি রসূলগণকে না মানে এবং বলে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রেরণ করেননি অথবা কোন বিশেষ নবীর নবুওয়তকে অস্বীকার করে, অথবা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুওয়তের দাবী করে, অথবা নবীদাবীদারকে সত্য মনে করে, অথবা বলে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নাউযুবিল্লাহ) কালো ছিলেন, অথবা দাড়ি-গোঁফহীন ছিলেন, অথবা কুরাইশী ছিলেন না, অথবা বলে যে, নবুওয়ত চেষ্টা করে লাভ করা যায়, অথবা অন্তরের পরিশুদ্ধতার কারণে নবুওয়তের স্তরে পৌঁছে যায়, অথবা কোন নবীকে হেয় করে, অথবা আল্লাহ তাআলার নামের তুচ্ছজ্ঞান করে, বর্ণিত সব অবস্থাতে উক্ত ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।”

হাম্বলী মায়হাবের নির্ভরযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ মজমুয়ায়ে ফতুয়া মুগনী ইবনে কুদামার ১০ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে:

ومن ادعى النبوة او صدق من ادعاها فقد ارتد لان مسيلمه لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين وكذلك طليحة الاسدي ومصدقوه. وقال النبي ﷺ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه رسول الله

“যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করে এবং নবীদাবীদারকে সত্য মনে করে, সে মুরতাদ। কেননা, মুসাইলামা কাজ্জাব নবুওয়তের দাবী করার পর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় তাদেরকেও মুরতাদ ঘোষণা করা হয়। এমনিভাবে তলীহা আসাদী এবং তাকে যারা সত্য মনে করেছিল তাদেরকেও মুরতাদ ঘোষণা করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত ত্রিশজন মিথ্যা নবীদাবীদার না আসবে। তাদের প্রত্যেকের দাবী হবে, সে আল্লাহর রসূল।”

কাযী আয়ায ‘আশ-শিফার’ ২য় খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

وكذلك من ادعى نبوة احد مع نبينا ﷺ او بعده. او من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها. وكذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي ﷺ لأنه اخبر ﷺ خاتم النبيين لاني بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه رسول كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً اجماعاً وسمعاً.

“এমনিভাবে যে ব্যক্তি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অথবা তাঁর পরে কোন ব্যক্তির নবী হবার দাবী করে, অথবা নিজের জন্য নবুওয়তের দাবী করে, অথবা নবুওয়ত লাভ এবং অন্তরের পরিশুদ্ধতার কারণে নবুওয়তের মর্যাদায় পৌছাকে জায়েয মনে করে, এমনিভাবে যে ব্যক্তি দাবী করে তার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়, চাই সে স্পষ্টভাবে নবুওয়তের দাবী না করুক, তবে বর্ণিত সকলেই কাফের বলে গণ্য হবে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে কোন নবী আগমন করবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিই সর্বশেষ নবী, তিনি মানবজাতীর উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছেন। গোটা উম্মত এর ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বুঝার জন্য কোন তাবীল বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তাই বর্ণিত লোকগুলোর কাফের হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাদের কুফর কুরআন-হাদীস এবং উম্মতের ঐক্যমত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।”

এ প্রমাণাদির ওপর ভিত্তি করে আমাদের মুরশিদ শহীদে ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসূফ লুধিয়ানভী রহ. স্বীয় কিতাব “আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত”-এ কুরআনের আয়াত, হাদীস শরীফ এবং ইজমায়ে উম্মতের বক্তব্য ও ফুকাহায়ে কেরামের বিশ্লেষণ লেখার পর বিশেষ মন্তব্য হিসেবে নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করেন:

“কুরআন মজীদ, বিশুদ্ধ হাদীস, ফুকাহায়ে কেরামের ফতুয়া এবং ইজমায়ে উম্মতের আলোকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসংকোচে নবীগণের সর্বশেষ। এ কারণে তাঁর পরে কেউ কোনভাবেই কোন রকমেই নবী দাবী করতে পারবে না। নবুওয়তের মসনদে সমাসিন হতে পারবে না। যে ব্যক্তি এ জাতীয় দাবী করবে সে কাফের এবং ইসলামের সীমা হতে খারেজ হয়ে যাবে।

সর্বশেষ নবী হওয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম মর্যাদা-সম্মান বহণ করে। তাঁর পরে কারো নবী হিসেবে আগমন করার অর্থ হল তাঁকে অপমান করা। কেননা, যদি তাঁর পরে কোন নবীর আগমনকে মেনে নেয়া হয়, তবে প্রশ্ন হবে যে, নতুন নবীকে কোন

নতুন জ্ঞান দেয়া হয়েছে কি না? যদি বলা হয়, নতুন নবীকে নতুন জ্ঞান দেয়া হয়নি; বরং পুরাতন জ্ঞানই তার নিকট পুনরায় অবতীর্ণ করা হয়েছে, তবে কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ বিদ্যমান থাকাবস্থায় পুনরায় সেই জ্ঞান অবতীর্ণ হওয়া অর্থহীন হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তাআলা সকল অর্থহীন-বেহুদা কাজ হতে মুক্ত, পবিত্র। যদি বলা হয় পরবর্তী নবীকে এমন জ্ঞান দেয়া হয়েছে যা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়নি, তবে এর দ্বারা (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ হওয়া এবং কুরআন মজীদ ‘সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা’ (تبيان لكل شيء) না হওয়া এবং ইসলাম ধর্ম অপূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। আর এরূপ হলে তা হবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন মজীদ এবং ইসলাম ধর্মের অপমান করা।

এ ছাড়াও যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন নবীর আগমনকে মেনে নেওয়াও হয়, তবে তার ওপর তো ঈমান আনা জরুরী। তাকে অস্বীকার করা কুফরী। তাকে যদি না মানা হয়, তবে নবুওয়তের কি অর্থ হতে পারে? এক হিসেবে এরূপ করার মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপমান, হয় করা হয়। এক ব্যক্তি তাঁর ওপর এবং তাঁর দ্বীনের ওপর পূর্ণ ঈমান রাখা সত্ত্বেও কাফের-অমুসলিম বলে গন্য করা হবে, স্থায়ীভাবে দোষখের উপযুক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে এ কথাই বুঝা যাচ্ছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনাও (নাউযুবিল্লাহ) কুফর হতে রক্ষা এবং জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।”

মিথ্যা নবুওয়তের ফেতনার সূচনা তখন থেকেই হয়েছিল, যখন মুসাইলামা কায্যাব নিজ গোত্র বনী হানীফার লোকজনকে সাথে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে তাঁর খলীফা নির্বাচনের আবেদন করেছিল। সে সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে খেজুরের ডাল ছিল। তিনি ডালের দিকে ইশারা করে বলেন, তুমি আমার নিকট খেলাফতের বিষয়ে উক্ত ডালও প্রার্থনা কর, তবুও তা আমি তোমাকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত নই। এ ঘটনা ঐতিহাসিকগণ এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মুসাইলামা কায্যাব বাইয়াতের জন্য খেলাফত অথবা নবুওয়তে অংশিদারিত্বের শর্ত রেখেছিল, তিনি তা গ্রহণ করেননি।

তাই সে ইসলামও গ্রহণ করেনি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকালের পর সে নবুওয়তে অংশিদারের দাবী করে বসে। এ ফেতনাকে প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর রাযি, জিহাদের মাধ্যমে দমন করেন। মুসাইলামা কায্যাব ত্রিশ হাজার অনুসারীসহ জাহান্নামী হয়ে যায়।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিকালের কিছু দিন পূর্বে আসওয়াদ আনাসী মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করে। ভেক্তিভাজির দ্বারা নাজরানের অধিবাসীদের সে তার অনুসারী বানিয়ে নেয়। পরবর্তীতে ইয়েমেন আক্রমণ করে গোটা ইয়েমেন দখল করে নেয়। হযরত আমর ইবনে হাযম এবং খালেদ ইবনে সাঈদ রাযি, মদীনায়ে উপস্থিত হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি ইয়েমেনের কয়েকজন সরদারের নিকট নাজরানবাসী এবং ইয়েমেনবাসীর বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য পত্র লিখেন এবং আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। আসওয়াদ আনাসী ইয়েমেনে সানা শহর দখল করে মুসলিম শাসক শহর ইবনে বাযানকে শহীদ করে তাঁর স্ত্রী আযাদকে নিজের অধিনস্ত করে নেয়। এ পরিস্থিতিতে ঐ মুসলিম নারীর চাচাত ভাই হযরত ফিরোয দাইলামী রাযি, যিনি হাবশার শাসক নাজ্জাশীর ভাগ্নে ছিলেন, তিনি এ বিষয়ে অবগত হবার পর নিজের বোনকে মুক্ত করার পরিকল্পনা আটতে থাকেন। ইতোমধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে জিহাদ এবং আসওয়াদে আনাসীকে হত্যা করার ফরমান জারী করা হয়। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি বোনের সাথে মিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এবং বোন মিলে আসওয়াদ আনাসীকে তার গৃহে হত্যার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এক রাতে সুযোগ বুঝে হযরত ফিরোয দাইলামী তার মহলে ঢুকে পড়েন। এতে আসওয়াদ আনাসীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি সময় নষ্ট না করে লাফ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘর মক্ষিয়ে দেন। ধস্তাধস্তির শব্দে প্রহরী অগ্রসর হল আযাদ বলেন, নিশ্চুপ থাক! তোমাদের নবীর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। আসওয়াদ আনাসীর প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার পর হযরত দাইলামী তার হত্যার ঘোষণা দেন। মুয়াজ্জিন ফজরের আযানে **اشهد ان محمداً رسول الله** এর পরে **اشهد ان عيسى كذاب** বৃদ্ধি করে ইয়েমেনবাসীকে আসওয়াদ আনাসীর হাত হতে মুক্তির সুসংবাদ প্রদান করে। এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরাঈল আ. এ সংবাদ শুনালে তিনি সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে বলেন فازفروز অর্থ্যাৎ ফিরোয সফল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরামের নিকট মিথ্যা নবীদাবীদারের হত্যার ঘটনা সবিস্তারে পৌছে। এভাবে তাঁর একটি সুন্নত জারী হয়। যেই নবুওয়তের দাবী করবে, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তাঁর হাদীস মোতাবেক কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিশজন মিথ্যা নবীর দাবী করবে। ইসলামের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, নবীদাবীদারদের সংখ্যা হাজারের ওপরে হবে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এবং প্রভাব বিস্তারকারী মিথ্যা নবীদাবীদারের সংখ্যা এখনো ত্রিশ পর্যন্ত পৌছেনি। এর ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলা যায় যে, এখনো কিয়ামত পর্যন্ত এমন কিছু ফেতনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে, যা মুসলিম মিল্লাতের রক্তক্ষরণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং ক্ষতিকর হবে কানা দাজ্জাল। যাকে হত্যার জন্য হযরত ঈসা আ. আকাশ হতে অবতরণ করবেন। চৌদ্দশ বছরে যতগুলো মিথ্যা নবীদাবীদারের প্রকাশ ঘটেছে উম্মতে মুসলিমা তার মূলতৎপাটনে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। তাই এদের তেমন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম হল কাদিয়ানী ফেতনা। উনিশ শতাব্দির শেষ এবং বিংশ শতাব্দির সূচনাতে সৃষ্ট এ ফেতনা সাম্রাজ্যবাদী অমুসলিম শক্তির সহায়তায় আজও বিদ্যমান রয়েছে। এবং মুসলিম উম্মতের সীমাহীন ক্ষতি করে চলছে। কাদিয়ানী ফেতনা সম্পর্কে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর মন্তব্য হল, ‘কাদিয়ানী ফেতনা এমন এক মারাত্মক ফেতনা, যার সূচনা উম্মতে মুসলিমাকে শ্রোতে ভাসিয়ে নিবে। কিন্তু উলামায়ে দেওবন্দ এর মুখোশ উম্মোচন করতঃ সাধারণ মুসলমানকে হেফাযত করছে।

কাদিয়ানী ফেতনাকে খ্রীস্টান সাম্রাজ্য এবং জায়েনবাদী ইহুদী সম্প্রদায় সর্বদা পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। তারা ইসলামের লেবাসে মুসলিম জাতিকে গোমরাহ করার অপতৎপরতায় লিপ্ত। এ কাজে তারা নারী, অর্থসম্পদ এবং ভূমিকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সর্বসম্মত মত এবং আকীদার মাঝে সন্দেহ-সংশয় এবং বিতর্কের দ্বারা মুসলমানদের ঈমানকে নড়বড়ে করে দেয়ার পথ অবলম্বন করছে। তাইতো দেখা যাচ্ছে, যখনই কোন বিতর্ক বা আলোচনার তারিখ নির্ধারণ করা হয়, তখনই

হাযাতে মসীহ এবং ঈসা আ.-এর অবতরণ, খতমে নবুওয়তের ব্যাখ্যা, নবুওয়ত অব্যাহত থাকা, ইমাম মাহদীর আগমন ইত্যাদির ন্যায় সুস্পষ্ট এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায়। এগুলো এমন বিষয় যার ওপর তো সাধারণ মুসলমানের ঈমান আছে; কিন্তু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা অনেক আলেমের জ্ঞানের পরিধির আওতাভুক্তও নয়। এ সব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান ছাত্রদের জন্য একটি নেসাব তৈরী করেছে, যার মাধ্যমে এ বিষয়ে সম্মত জ্ঞান লাভ করা যায়। এবং অন্যান্য পাঠ্যসূচীর সাথে সাথে এর পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে আলমী মজলিসে তাহাফুযে খতমে নবুওয়ত বেফাকের নিকট আবেদন করলে বেফাক প্রধান হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান মজলিসে তাহাফুযে খতমে নবুওয়তের আমীর হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ. মজলিসের কেন্দ্রীয় সদস্য এবং মুবাল্লিগ হযরত মাওলানা আল্লাহ ওয়াসাকে এ বিষয়ের ওপর একটি গ্রন্থ সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেহনত করে একটি নেসাবনামা তৈরী করেন। যার আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ, হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান জালন্ধরী এবং এ অধ্যমসহ অনেক উলামায়ে কেরাম। সকলেই একে একটি যুগান্তকারী এবং উপকারী গ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়ণ করেছেন। আমি আশা করি এ গ্রন্থটি উপোরক্ত প্রয়োজনীয়তা কেবল পূর্ণই করবে না; বরং এর পাঠককে খতমে নবুওয়তের একজন মুবাল্লিগ এবং বিতর্ককারী হিসেবে গড়ে তুলবে। তারা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের হীন ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। উলামায়ে কেরামের জন্য উপকারী করুক। আমীন!

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد والہ واصحابہ اجمعین

ড. মুফতী নেয়ামউদ্দীন শামযাই

শাইখুল হাদীস

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া

আল্লামা বিনুরী টাউন করাচি

অনুবাদের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

মানবজাতির বিশুদ্ধ পথপ্রাপ্তির লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম আ. থেকে শুরু হয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে এ ধারার পরিসমাপ্তি হয়েছে। তাই তো তিনি সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর পরে কোন ধরণের নবী-রসূলের আগমন হবে না। ‘খতমে নবুওয়ত’ হচ্ছে তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ‘খতমে নবুওয়ত’ কুরআন-হাদীস এবং উম্মতের ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত। মুমিন-মুসলমান হবার জন্য যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ওপর ঈমান আনা জরুরী। তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়তের ওপর ঈমান আনাও জরুরী। আল্লাহ তাআলাকে এক, অদ্বিতীয় বিশ্বাসের সাথে সাথে তাঁকে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে ঈমানের পূর্ব শর্ত। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিষয় দু’টির যে কোন একটিকে অস্বীকার করবে, সে ইসলামের সীমা হতে খারিজ হিসেবে বিবেচিত হবে। মুসলমান পরিচয় দিবার অধিকার হারিয়ে ফেলবে। মুরতাদ, অমুসলিম, কাফির, অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হবে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ স্বৈরাচারদের হিংস্র থাবা হতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য যখন মুসলমানরা জিহাদে রত, তখন ইংরেজদের চত্র-ছায়ায় মিথ্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করে। সে কখনো নিজেকে ইমাম মাহদী, কখনো প্রতিশ্রুত মসীহ মাউদ বলেও দাবী করে। তার এ সব দাবীর মূল উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে ঈমানচ্যুত করার সাথে সাথে ইংরেজ বিরোধী জিহাদ হতে বিরত রাখা। তাই সে নবুওয়তের দাবী করতঃ জিহাদ হারাম বলে ঘোষণা দেয়। মিথ্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়তের দাবীর সূচনালগ্ন হতে ভারতবর্ষের দূরদর্শী উলামায়ে কেরাম মুসলমানদের ঈমান হেফাযত করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তার ঈমান বিধ্বংসি অপ-তৎপরতার বিরুদ্ধে সচেতন উলামায়ে কেরাম তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিভিন্ন বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে তার

মিথ্যাচারের অসারতা ফুটিয়ে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুবাল্লিগে খতমে নবুওয়ত হযরত মাওলানা আল্লাহ ওসায়া দামাত বারাকাতুল্হম উর্দু ভাষায় ‘আয়নায়ে কাদিয়ানীয়াত’ নামে প্রশ্লোস্তর আকারে গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি ইংরেজী, আরবী এবং ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

কুন্দিয়ান শরীফের পীর, আলমী মজলিসে তাহাফুফুযে খতমে নবুওয়তের আমীর হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ.-এর সুযোগ্য সাহেবযাদা হযরত মাওলানা আযীয আহমদ দামাত বারাকাতুল্হম বাংলায় অনুবাদের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। পরকালের সঞ্চয়ভাণ্ডারে প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশায় আমিও সর্বান্তকরণে তাঁর এ অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করি। চাহিদানুযায়ী বাংলা ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থের এখনো তীব্র সংকট রয়েছে। আমার মরহুম পিতা খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণ আন্দোলনের পথিকৃত, বিশিষ্ট রাজনৈতিক, বাতিলের আতঙ্ক, শাইখুল হাদীস, মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী রহ. বাংলা ভাষায় ‘কাদিয়ানী ধর্মমত’ নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পাঠকবৃন্দের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ‘কাদিয়ানী ধর্মমত’ গ্রন্থটির কয়েক সংস্করণ মূদ্রিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপামর মুসলিম জনসাধারণের ঈমান সুরক্ষায় ‘কাদিয়ানী ধর্মমত’ গ্রন্থের সাথে সাথে অনুবাদকৃত গ্রন্থটিও জোড়াল ভূমিকা রাখবে। এটি পাঠে উলামায়ে কেরামসহ সাধারণ মুসলমানও উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে। ইনশাআল্লাহ।

বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার মাঝে অনুবাদকার্য সম্পাদন করতে হয়েছে। ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার সবিনয় নিবেদন রইল। অনুবাদকার্যে যারা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। খতমে নবুওয়তের মুবাল্লিগ হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সন্দিপী এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ভ্রান্তির বেড়াজাল হতে আলোর মিছিলে शामिल হবার তৌফিক দান করুন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বাহাউদ্দীন যাকারিয়া
মাদানী মনযিল
মিরপুর ঢাকা-১২১৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভিমত	
শাইখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ.-	৪
শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবেদ মুদাযিলছল আলী	৫
হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ হানীফ জালন্ধরী মুদাযিলছল আলী ..	৮
হযরত মাওলানা আযীয আহমদ দামাত বারাকাতুহুম-	১১
হযরত মাওলানা মোস্তফা আজাদ দামাত বারাকাতুহুম	১৩
ভূমিকা	
শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী নিয়ামউদ্দীন শামযাই শহীদ রহ.	১৬
অনুবাদের কথা	২৬
খতমে নবুওয়ত	
প্রশ্ন নম্বর এক : খতমে নবুওয়ত শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা, গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য	৩১
প্রশ্ন নম্বর দুই : খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এবিষয়ে কয়েকটি কিতাবের নাম....	৩৬
প্রশ্ন নম্বর তিন : পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে খতমে নবুওয়ত এবং উম্মতের ঐক্যমত	৪৮
প্রশ্ন নম্বর চার : খতমে নবুওয়ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের অপব্যাখ্যা এবং এর উত্তর	৫৯
প্রশ্ন নম্বর পাঁচ : যিল্লী, বুরখী শব্দের অপব্যাখ্যা এবং এর উত্তর	৬৩
প্রশ্ন নম্বর ছয় : ওহী, এলহাম এবং কাশফের মাঝে পার্থক্য	৬৬
প্রশ্ন নম্বর সাত : বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীস সম্পর্কে কাদিয়ানীদের অপব্যাখ্যার উত্তর	৭৬
প্রশ্ন নম্বর আট : কাদিয়ানী এবং লাহোরী উপদলের পরিচয় এবং এ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম	১০৯
প্রশ্ন নম্বর নয় : হযরত আবু বকর রাযি.-এর যুগ হতে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রশ্ন নম্বর দশ : কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা রোধে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা	১১৮
হায়াতে হযরত ঈসা আ.	
প্রশ্ন নম্বর এক : হযরত মসীহ আ. সম্পর্কে মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা	১৩৫
প্রশ্ন নম্বর দুই : হযরত ঈসা আ.কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার স্বপক্ষে কুরআন-হাদীসের দলীল	১৩৮
প্রশ্ন নম্বর তিন : মির্যা কাদিয়ানীর ঈসা আ.-এর জীবিত থাকার আকীদার বিরোধিতার মূল কারণ	১৫১
প্রশ্ন নম্বর চার : پيغمبرى انى متوفىك এর কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপব্যখ্যা এবং এর উত্তর	১৫২
প্রশ্ন নম্বর পাঁচ : بل رفعه الله এবং رافعه এর ব্যাখ্যা	১৫৭
প্রশ্ন নম্বর ছয় : হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণের প্রমাণ এবং তাঁর অবতরণ খতমে নবুওয়ত আকীদা বিরোধী নয়	১৬৬
প্রশ্ন নম্বর সাত : হযরত মাহদী ও মসীহ আ.-এর আগমন এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপব্যখ্যা খণ্ডন	১৭১
প্রশ্ন নম্বর আট : হযরত ঈসা আ.কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কে কাদিয়ানীদের অপব্যখ্যার উত্তর	১৭৮
প্রশ্ন নম্বর নয় : হযরত ঈসা আ. কে স্বশরীরে আকাশে উঠানো এবং অবতরণের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন	১৮৪
প্রশ্ন নম্বর দশ : হযরত ঈসা আ.-এর জীবিত থাকা সম্পর্কে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সন্দেহ সৃষ্টি এবং এর উত্তর	১৮৯
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিথ্যাচার	
প্রশ্ন নম্বর এক : মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তার দাবীসমূহ	১৯৮

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রশ্ন নম্বর দুই : ঈমানের সংজ্ঞা দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা এবং 'কুফর দুনা'ল কুফরে'র ব্যাখ্যা	২০৬
প্রশ্ন নম্বর তিন : কাদিয়ানীদের কাকের হবার কারণ এবং তাদের নির্মিত মসজিদ এবং মুসলমানদের কবরস্থানে কাদিয়ানীদের দাফন সম্পর্কে শরীয়তের বিধান	২১৩
প্রশ্ন নম্বর চার : নবুওয়তের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী বনাম মির্যা কাদিয়ানীর জীবন এবং নবুওয়তের বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়	২২২
প্রশ্ন নম্বর পাঁচ : মির্যা কাদিয়ানীর ইংরেজ দালালীর প্রমাণ	২২৭
প্রশ্ন নম্বর ছয় : সুফিয়ায়ে কেরামের উক্তির বিকৃতির উত্তর	২৩০
প্রশ্ন নম্বর সাত : মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণী	২৩২
প্রশ্ন নম্বর আট : মুহাম্মদী বেগম এবং মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিবাহ	২৩৬
প্রশ্ন নম্বর নয় : পবিত্র কুরআনের আয়াত لا تقول علينا এর ব্যাখ্যায় কাদিয়ানীদের বিকৃতির উত্তর	২৪১
প্রশ্ন নম্বর দশ : মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর স্বভাব-চরিত্র	২৪৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

খতমে নবুওয়ত

প্রশ্ন নম্বর এক

খতমে নবুওয়ত শব্দের আবিধানিক অর্থ কি? শরীয়তের পরিভাষায় খতমে নবুওয়ত বলতে কি বুঝায় এবং এর গুরুত্ব কি? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এবিষয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করুন।

উত্তর

খতমে নবুওয়তের অর্থ এবং এর ব্যাখ্যা

মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের ধারা শুরু করেছেন সায্যিদেনা হযরত আদম আ. কে প্রেরণের মাধ্যমে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিয়ে। তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কাউকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হবে না।

আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের গুরুত্ব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমান এ বিশ্বাস রাখে যে, নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন ‘খাতামুন নবীয়েন’ তথা সর্বশেষ নবী। এতে কোন প্রকারের সন্দেহ-সংশয় নেই।

(ক) কুরআন মজীদের একশ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী।

(খ) এর স্বপক্ষে দু’শ মুতাওতের হাদীস রয়েছে।

(গ) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পর অন্য কোন নবী আগমন করবেন না। এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ সর্ব প্রথম ঐক্যমত পোষণ করেন। হযরত মাওলানা সাযি়িদ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. স্বীয় রচিত সর্বশেষ গ্রন্থ ‘খাতামুলনবীয়ীন’ -এ উল্লেখ করেন:

“এ উম্মত সর্বপ্রথম মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের হত্যার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। কেননা, মুসাইলামা নবুওয়তের দাবী করেছিল। তাকে হত্যা করার পর তার অন্যান্য অপকর্ম সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম অবগত হন। ঐতিহাসিক ইবনে খলদুন এরূপ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে নবুওয়তের দাবীদারদের কুফর, মুরতাদ এবং হত্যার ব্যাপারে উম্মত সর্বসম্মতভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। শরীয়তধারী এবং অশরীয়তী নবী বিষয়টি ঐক্যমত পোষণে কখনো অন্তরায় হয়ে দাড়ায়নি। -খাতামুলনবীয়ীন পৃ.৬৭

হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্দোলভী রহ. ‘মিসকুল খাতাম ফি খতমে নবুওয়তি সাযি়িদিল আনাম’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

“নবুওয়তের দাবীদারকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে সর্বপ্রথম ঐক্যমত সংঘটিত হয়”। -এহতেসাবে কাদিয়ানীয়ত খ.২ পৃ. ১০

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলামের জন্য যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এতে শাহাদত বরণকারী সাহাবার সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২৫৯ জন। (রহমতুল্লিল আলামিন খ.২ পৃ. ২১৩। কাজী সালমান মনসুরপুরী) ইসলামের ইতিহাসে আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণের জন্য হযরত আবু বকর রাযি.-এর খেলাফতের যুগে মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইয়ামামার ময়দানে। এ একটি যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবা এবং তাবইনের সংখ্যা ছিল বারশ। এর মাঝে সাতশজন কুরআনের হাফেয এবং আলেম শাহাদতের অমিয় সূরা পান করেন। -খতমে নবুওয়ত কামেল। রচনায় মুফতী শফী রহ. খ.৩ পৃ. ৩০৪, মিরকাতুল মাফাতিহ খ. ৫, পৃ. ২৪

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনের মেহনতের ফলাফল হল সাহাবায়ে কেরামের জামাআত। এ জামাআতের বড় একটি অংশ খতমে নবুওয়তের আকীদা সংরক্ষণের জন্য শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। এ থেকে খতমে নবুওয়তের গুরুত্ব, মাহাত্ম ফুটে উঠে। শাহাদত বরণকারী সাহাবাদের একজন হলেন হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী খায়রাজী রাযি। তাঁর শাহাদতের বিবরণ নিম্নরূপ।

“নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারীকে ইয়ামামার বনু হানীফা গোত্রের মুসাইলামা কাজ্জাবের নিকট প্রেরণ করেন। মুসাইলামা কাজ্জাব হযরত হাবীব রাযি.-কে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি সাক্ষ দিচ্ছ মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল? হযরত হাবীব রাযি. উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। পুনরায় মুসাইলামা বলল, (আমি মুসাইলামা) আল্লাহর রসূল, তুমি কি একথাও সাক্ষ দিচ্ছ? উত্তরে হযরত হাবীব রাযি. বললেন, আমি বধির। তোমার কথা শুনে পাচ্ছি না। মুসাইলামা বারবার একই প্রশ্ন করছে, আর হযরত হাবীব রাযি. অভিন্ন উত্তর দিচ্ছেন। এতে মুসাইলামা ক্ষিপ্ত হয়ে একটি একটি করে তাঁর অঙ্গ কেটে ফেলে। অবশেষে তিনি শাহাদত বরণ করেন।” -আসাদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা। খ. ৯, পৃ. ৪১১, মুদ্রণ বয়রুত

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সাহাবায়ে কেরামের নিকট খতমে নবুওয়ত আকীদার কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল। তাঁরা এ বিষয়ে কোন আপোষ কিংবা কোন কৌশলের আশ্রয় নেননি। এ প্রসঙ্গে এক তাবইর ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সওব রহ.। তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার এমন বুয়ুর্গ তাবই ছিলেন, যার জন্য আব্দুল্লাহ তাআলা অগ্নিকে নিষ্কৃত করে দেন, যেভাবে হযরত ইবরাহীম আ.-এর জন্য নমরুদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে বাগানে রূপান্তরিত করে ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সওব ইয়েমেনে জনপ্রিয় হন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর সাক্ষাত লাভে ধন্য হবার সুযোগ পাননি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে আসওয়াদ আনাসী ইয়েমেনে মিথ্যা নবী দাবী করে। সে তার মিথ্যা নবুওয়তের ওপর ঈমান আনার জন্য সাধারণ

মানুষকে বাধ্য করতে থাকে। ইত্যবস্যরে সে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ.কে তার দরবারে ডেকে পাঠায় এবং তার ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। হযরত আবু মুসলিম রহ. সরাসরি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর আসওয়াদ আনাসী জিজ্ঞেস করে, তবে কি মুহাম্মদের ওপর ঈমান এনেছ? হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. সম্মতি সূচক উত্তর প্রদান করেন। এ উত্তর শুনে আসওয়াদ আনাসী একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে তাতে হযরত আবু মুসলিম রহ. কে নিক্ষেপ করে। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আগুনের জ্বালানী ক্ষমতাকে রহিত করে দেন। হযরত আবু মুসলিম রহ. সুস্থ শরীরে নিরাপদে আগুন হতে বের হয়ে আসেন। এ ঘটনায় ভণ্ড আসওয়াদ আনাসী এবং তার চেলা-চামুগুরা ভিত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তার চেলা-চামুগুরা তাকে পরামর্শ দেয় যে, আবু মুসলিম কে এদেশ হতে নির্বাসনে পাঠানো হোক। নতুবা এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আপনার অনুসারীদের বিশ্বাসের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হবে। সুতরাং তাকে ইয়েমেন হতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

হযরত আবু মুসলিম রহ. আর কোথায় আশ্রয় নিবেন। মদীনা মনোয়ারা হল তাঁর একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য রওনা হলেন। মদীনায় উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্তিকাল করেছেন। তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে মসজিদে নববীর পাশে বেধে ভিতরে প্রবেশ করে একটি খুঠির আড়ালে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করেন। হযরত উমর ফারুক রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন অপরিচিত এক মুসাফির নামায পড়ছে। তাঁর সন্নিহিতে গেলেন। মুসাফিরের নামায শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় হতে এসেছেন? ইয়েমেন হতে! হযরত আবু মুসলিম রহ. উত্তর দিলেন। এরপর হযরত উমর ফারুক রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর দুশমন (আসওয়াদ আনাসী) আমাদের এক বন্ধুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিল। আগুন তার কোন ক্ষতি করেনি। পরবর্তীতে ঐ বন্ধুর সাথে আসওয়াদ কি ব্যবহার করেছে? হযরত আবু মুসলিম রহ. বললেন, তার নাম হল আব্দুল্লাহ ইবনে সওব। ইত্যবস্যরে তিনি হযরত উমর রাযি.-এর অন্তরদৃষ্টিতে ধরা পড়ে যান। তিনি তৎক্ষণাত তাকে বললেন, আপনাকে

আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনি কি সেই ব্যক্তি? হযরত আবু মুসলিম রহ. উত্তরে বললেন, জি হ্যাঁ। হযরত উমর রাযি. এ কথা শ্রবনে খুশি এবং আনন্দের অতিশয্যায় তাঁর ললাটে চুমু খেলেন। হযরত আবু মুসলিম রহ. কে হযরত আবু বকর রাযি.-এর দরবারে নিয়ে আসলেন। তাঁকে হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর মাঝে বসালেন এবং বললেন, আল্লাহর শুকর! তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমাকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ঐ ব্যক্তির দর্শন লাভে ধন্য করেছেন, যার সাথে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম খলিলুল্লাহর অনুরূপ আচরণ করেছেন। -হুলিয়াতুল আউলিয়া খ.২, পৃ. ১২৯, তাহযীব খ.৬, পৃ. ৪৫৮, তারিখে ইবনে আসাকির খ.৭, পৃ. ৩১৫, জাহাঁদিদাহ পৃ. ২৯৬, তরজুমানুস্‌সুন্নাহ খ.-৪, পৃ. ৩৪১

খতমে নবুওয়তের মর্যাদালাভ

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে ‘রব্বুল আলামিন’ তথা সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার জন্য ‘রহমতুল্লিল আলামিন’ অর্থ্যাৎ সকল সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত স্বরূপ এবং পবিত্র কুরআনের বেলায় ‘যিকরুল্লিল আলামিন’ অর্থ্যাৎ সকল সৃষ্টি জগতের জন্য উপদেশমালা এবং বায়তুল্লাহর জন্য ‘হুদাল্লিল আলামিন’ অর্থ্যাৎ সকল সৃষ্টি জগতের জন্য হেদায়েত স্বরূপ বলে সম্মোদন করা হয়েছে। এ দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বজনীনতা প্রমাণিত হয়, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘খতমে নবুওয়ত’ বিশেষণের অধিকারী তাও প্রমাণিত হয়। কেননা, তাঁর পূর্বের আখীয়াগণ নিজের দেশ, অঞ্চল, বিশেষ সম্প্রদায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগমন করেছিলেন। এর বিপরিত হলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি হলেন সকল সৃষ্টি জগতের সর্বজনীন নবী।

যেভাবে আল্লাহ তাআলা হলেন সকল সৃষ্টি জগতের ‘রব’ তদ্রূপ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সকল সৃষ্টি জগতের ‘নবী’। এটি শুধু একমাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বিশেষণ। এথেকেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য ফুটে উঠে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের যে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তার একটি হল:

ارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون

“আমাকে সকল সৃষ্টিজগতের নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে। আমার মাধ্যমেই নবুওয়তের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করা হয়েছে।” -মেশকাত পৃ. ৫১২, সায্যিদুল মুরসালিন অধ্যায়, মুসলিম খ. ১, পৃ. ১৯৯, কিতাবুল মাসাজিদ।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। তাঁর কিবলা (বায়তুল্লাহ) সর্বশেষ কিবলা। তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাব হচ্ছে সর্বশেষ ঐশী কিতাব। এসব কিছুই দাবী করে যে, খতমে নবুওয়ত তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাইতো পবিত্র কুরআন মজীদকে ‘যিকরুল্লিল আলামিন’ এবং বায়তুল্লাহকে ‘হুদাল্লিল আলামিন’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁরই সৌজন্যে। তাঁর উম্মত হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। এ সম্পর্কে তাঁর ঘোষণা হল:

انا خاتم الانبياء وانتم اخر الامم

“আমি হলাম সর্বশেষ নবী, আর তোমরা হলে সর্বশেষ উম্মত।”
-ইবনে মাজাহ পৃ. ২৯৭

হযরত আব্বাস জালালউদ্দীন সূউতী রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব খাসাইসুল কুবরায় উল্লেখ করেছেন যে, খতমে নবুওয়ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য। -খাসাইসুল কুবরা খ. ২, পৃ. ১৯৩, ১৯৭, ২৮৪

ইমামুল আসর আব্বাস সায্যিদ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, খাতামুলনবীয়াত বিশেষণটি সকল আশীয়ার মাঝে একমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস। এটা একমাত্র তারই পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। -খাতামুলনবীয়াত উর্দু-১৮৭

প্রশ্ন নম্বর দুই

পবিত্র কুরআনে আব্বাস তাআলা ইরশাদ করেছেন:

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

(ক) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এমনভাবে করুন যাতে খতমে নবুওয়ত বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

(খ) উক্ত বিষয়ে রচিত কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করুন।

উত্তর

খাতামুলবীযীন আয়াতের ব্যাখ্যা

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما

“মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।” -সূরা আহযাব-৪০

উক্ত আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে আরব সমাজে বহু রসুম ও কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এরই মাঝে একটি হল পালক সন্তানকে ঔরসজাত সন্তানের মর্যাদা দেয়া হত। হালাল-হারাম, বিবাহ-শাদী, তালাক ইত্যাদি বিধানে ঔরসজাত সন্তানের সাথে যে আচরণ করা হত, পালক সন্তানের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করা হত। যেভাবে ঔরসজাত সন্তানের মৃত্যু কিংবা তালাক দেবার পর তার স্ত্রী পিতার বিবাহ করা অবৈধ-হারাম ভাবা হত, তদ্রূপ পালক সন্তানের মৃত্যু কিংবা স্ত্রীকে তালাক দেবার পর তার পিতার জন্য হারাম মনে করা হত। এ ধরনের কুসংস্কারের কারণে বহুসমস্যার সৃষ্টি হত। যেমন পারিবারিক বন্ধনে সংমিশ্রতা। শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়ারিস নয় এমন ব্যক্তিকে ওয়ারিস বানিয়ে দেয়া, হালাল কে হারাম ভাবা ইত্যাদি। ইসলামের আগমনের উদ্দেশ্যই হল এ সুন্দর বসুন্ধরাকে সর্ব প্রকার কুফরী, ভ্রষ্টতা ও কুসংস্কার হতে পবিত্র করা। এ সবার মূলত্বপাটনে ইসলাম দু'ধরনের কর্মসূচী প্রণয়ন করে। একটি হল উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে, দ্বিতীয়টি হল বাস্তব আমলের মাধ্যমে। তাইতো আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل ادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله

“এবং তোমাদের পোষ্যদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।” -সূরা আযাব-৪-৫

মূল দাবী এই ছিল যে, বংশ এবং ওয়ারিসে শরিক ধারণা না করা এবং হালাল-হারামের বিধানাবলীসহ বিভিন্ন বিষয়ে সন্তান না ভাবা। কিন্তু পালক সন্তান বানানোর রুসুমের মূলত্পাটন করাই হচ্ছে উক্ত আয়াতের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং উক্ত আয়াতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, পালক সন্তানকে তার পিতার নামে সম্বোধন করা হোক। ওহী অবতীর্ণের পূর্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারেসা রাযি. কে (যিনি তাঁর দাস ছিলেন) স্বাধীন পালক পুত্রের মর্যাদা দান করেছিলেন। সকল মানুষ এমনকি সাহাবায়ে কেলামও আরবের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তাঁকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. বলেন, উক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর হতে আমরা তাকে প্রাচীন প্রথার পরিত্যাগ করে যায়েদ বিন হারেসা বলে ডাকতে শুরু করি। সাহাবায়ে কেলাম এ আয়াত অবতীর্ণের পর হতে আরবের প্রাচীন এ প্রথাকে সর্বাত্মকভাবে বর্জন করতে শুরু করে। যেহেতু প্রচলিত কোন প্রথা বর্জনের কারণে আত্মীয়-স্বজন এমন কি বংশীয় লোকজনের তিরস্কারের টার্গেট হতে হয়, যা সকলের পক্ষে সহনীয় নয়; তাই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হল, এ কুসংস্কারের মূলত্পাটন প্রিয় নবীর মাধ্যমে করার। সুতরাং যখন হযরত যায়েদ বিন হারেসা রাযি. কোন কারণে স্বীয় স্ত্রী বিবি যয়নব কে তালাক প্রদান করেন, তখন আল্লাহ তাআলা প্রিয় রসূলের বিবাহ তাঁর সাথে করিয়ে দেন। যেন এর ফলে বহুযুগ ধরে চলে আসা একটি কুসংস্কারের মূলত্পাটন হয়ে যায়। তাইতো পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في
ازواج ادعياءهم

“অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে।” -সূরা আহযাব-৩৭

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত যয়নবের সাথে সুসম্পন্ন হবার পর আরবের মুশরিকরা এ বলে অপপ্রচার চালাতে লাগল যে, দেখ! এ কেমন নবী, নিজ পুত্রবধুকে বিবাহ করল? এদের অপপ্রচারের জবাবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

“মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী।” -সূরা আহাব-৪০

উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা এ কথাই ব্যক্ত করতে চাচ্ছেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পিতা নন, সেখানে হযরত যায়েদের পিতা হবেন কি ভাবে? সুতরাং যায়েদের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করায় তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচার করা সম্পূর্ণরূপে বোকামী বৈ কিছু নয়। আরবের মুশরিকদের দাবীর খণ্ডনে কেবল এতোটুকু বললেই যথেষ্ট ছিল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের পিতা নন। কিন্তু রব্বুল আলামিন মুশরিকদের অপপ্রচারকে সুদৃঢ়তার সাথে খণ্ডন এবং ভিত্তিহীন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়কে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি কেবল যায়েদেরই পিতা নন, এমন নয়; বরং তিনি কোন পুরুষেরই পিতা নন। অতএব, এমন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অপবাদ দেয়া, যার কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র সন্তান নেই, তিনি তাঁর পুত্র বধুকে বিবাহ করেছেন, এটা কতই না যুলুমের বিষয়। তাঁর সকল পুত্রসন্তান শৈশবেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তারা প্রাপ্ত বয়স হবারও সুযোগ পাননি। তাই উক্ত আয়াতে رجالكم ‘রিজালিকুম’ এজন্যই বৃদ্ধি করা হয়েছে। মোট কথা এ আয়াত অবতীর্ণের উদ্দেশ্য হল কাফের, মুনাফিকদের অপপ্রচারের উত্তর দেয়া। তাঁর মর্যাদা, মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছে ولكن رسول الله وخاتم النبيين ‘কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী।’

পবিত্র কুরআনের আলোকে ‘খাতামুননবীয়ায়ীন’-এর ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআনে ‘খাতাম’ শব্দটি সাত স্থানে ব্যবহার হয়েছে।

(১) সূরা বাকারার সাত নম্বর আয়াত ختم الله على قلوبهم

অর্থ : আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণে মোহরাক্ষিত করেছেন।

- (২) সূরা আনআমের ৪৬ নম্বর আয়াত ختم الله على قلوبكم
অর্থ : আল্লাহ তোমাদের অন্তঃকরণে মোহরাক্ষিত করেছেন।
- (৩) সূরা জাসিয়ার ২৩ নম্বর আয়াত ختم الله على سمعه وقلبه
অর্থ : মোহরাক্ষিত করেছেন তার কর্ণ এবং অন্তঃকরণে।
- (৪) সূরা ইয়াসিনের ৬৫ নম্বর আয়াত اليوم نختم على افواههم
অর্থ : আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব।
- (৫) সূরা শুরার ২৪ নম্বর আয়াত فان يشاء الله يختم على قلبك
অর্থ : আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন।
- (৬) সূরা মুতাফ্ফিফিনের ২৫ নম্বর আয়াত يسقون من رحيق مختوم
অর্থ : তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।
- (৭) সূরা মুতাফ্ফিফিনের ২৬ নম্বর আয়াত ختامه مسك
অর্থ : তার মোহর হবে কস্তুরী।

উক্ত সপ্ত আয়াতের অগ্রপ্চাত এবং বর্ণনাভঙ্গি দেখে এ কথাই বুঝা যায় যে, ‘খাতাম’ শব্দটি সাধারণত এ অর্থ ব্যবহার হয়েছে যে, কোন বস্তুকে এমনভাবে বন্ধ করা যাতে বাহির থেকে তাতে কোন কিছু প্রবেশ করতে না পারে এবং ভিতর থেকেও কোন জিনিস বের হতে না পারে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, “আল্লাহ কাফেরদের অন্তঃকরণে মোহর এঁটে দিয়েছেন”। এর ব্যাখ্যা হল, “কুফর তাদের অন্তর হতে বের হবে না এবং ঈমানও তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না”। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদের অন্তঃকরণে মোহর এঁটে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হল, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবী আগমনের ধারা রুদ্ধ করে দিয়েছেন। নবুওয়তের সিলসিলায় মোহর এঁটে দিয়েছেন। এ ধারা হতে না কোন নবী বের হবে, না কোন ব্যক্তি নবুওয়তের সিলসিলাভুক্ত হবে। এটাই হচ্ছে এ আয়াতের সঠিক, বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। কিন্তু অভিশপ্ত কাদিয়ানী এর অপব্যাখ্যা করে।

হাদীসের আলোকে ‘খতামুলনবীয়ীন’-এর ব্যাখ্যা

عن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔

“হযরত সাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্য হতে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবী হবার দাবী করবে। অথচ আমিই হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পরে কোন নবী নেই।” -আবু দাউদ খ. ২, পৃ. ১২৭, তিরমিযী খ. ২, পৃ. ৪৫

উক্ত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘খাতামুননবীয়ায়ীন’ শব্দের ব্যাখ্যা ‘লা নবীয়া বাদী’- ‘আমার পরে কোন নবী নেই’ করেছেন।

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃতি করেছেন। অতঃপর তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা হল।

وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه انه لا نبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ وأتى بانواع السحر والطلاسم.

“আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাব এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদীসের মাধ্যমে এ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তাঁর পরে কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। মানুষ যেন একথা অবহিত হয় যে, তাঁর পরে যে কেউ নবী হবার দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী, বড় মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ধোঁকাবাজ, পথভ্রষ্ট, অপরকেও গোমরাহীকারী, যদিও সে আজগুবি কিছু প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম কিংবা যাদুর ভেঙ্কিবাজীর প্রদর্শন করে।” -তাফসীরে ইবনে কাসীর খ. ৩, পৃ. ৪৯৪

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবইনদের দৃষ্টিতে ‘খাতামুননবীয়ায়ীন’-এর ব্যাখ্যা

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবইনদের দৃষ্টিতে ‘খাতামুননবীয়ায়ীন’-এর ব্যাখ্যা কি? এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মুফতী শফী রহ. রচিত খতমে নবুওয়ত গ্রন্থটি পাঠ করা জরুরী। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম আবু জাফর ইবনে জারীর তাবারী রহ. স্বীয় রচিত তাফসীর গ্রন্থে হযরত কাতাদাহ রাযি. হতে ‘খাতামুন্নবীয়ীন’-এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ উল্লেখ করেন:

عن قتادة ولكن رسول الله وخاتم النبيين اى اخرهم.

“হযরত কাতাদাহ রাযি. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এবং তিনি আল্লাহর রসূল এবং খাতামুন্নবীয়ীন অর্থাৎ আখিরুন্নবীয়ীন তথা সর্বশেষ নবী।” -ইবনে জারীর খ. ২২, পৃ. ১৬

হযরত কাতাদাহ রাযি.-এর এ অভিমত শাইখ জালালউদ্দীন সূউতী রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ ‘আদুররুল্ল মনসুরে’ আব্দুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মানযার এবং ইবনে আরবী হাতেমের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। -আদুররুল্ল মনসুর খ. ৫, পৃ. ২০৪

এখানে যে অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীস হতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এক, অভিন্ন। অর্থাৎ ‘খাতামুন্নবীয়ীন’ অর্থ ‘আখিরুন্নবীয়ীন’ তথা সর্বশেষ নবী। কোথাও শরয়ী-অশরয়ী, বুরূযী বা যিল্লা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়নি। বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর কীরাতও **ولكن نبينا خاتم النبيين** এর স্বপক্ষে দলীল প্রদান করে। আল্লামা জালালউদ্দীন সূউতী রহ. আব্দুররুল্ল মনসুরে আবদ ইবনে হুমাইদের সূত্রে হযরত হাসান রাযি. হতে বর্ণনা করেন:

عن الحسن فى قوله وخاتم النبيين قال ختم الله النبيين محمد صلى الله وسلم وكان اخر من بعث.

“হযরত হাসান রাযি. হতে ‘খাতামুন্নবীয়ীন’-এর তাফসীরে বলা হয় যে, আল্লাহ তাআলা আদীয়াগণের আগমনের ধারা সমাপ্ত করেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে। তিনি হলেন আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত সর্বশেষ একজন রসূল।”

এজাতীয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরও কি কারোর কোন সন্দেহ-সংশয় এবং অপব্যাক্যার সুযোগ থাকে? অথবা বুরূযী কিংবা যিল্লী বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো কি সমীচীন?

আরবী অভিধান বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ‘খাতামুননবীয়ীন’

‘খাতাম’-এর ‘তা’ যবর দিয়েও পড়া যায় এবং যের দিয়েও পড়া যায়। কুরআন-হাদীসের বিশ্লেষণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবইনদের তাফসীর এবং ইমামগণের বর্ণনা ছাড়াও যদি আরবী অভিধানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়, তবুও আরবী অভিধান হতে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যাবে যে, ‘খাতাম’-এর ‘তা’ বর্ণে যবর দেয়ার সময় এটি দু’টি অর্থ প্রদান করবে। একটি সর্বশেষ নবী, অপরটি হল নবীদের পরিসমাপ্তকারী। ‘তা’ বর্ণে যের দেয়া হলে এর অর্থ হবে সর্বশেষ নবী। কিন্তু উভয় অর্থের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করলে উভয়ের মর্ম অভিন্ন দৃষ্টিগোচর হবে। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কোন প্রকার নবীর আগমন গটবে না।

আল্লামা সায্যিদ মাহমুদ আলুসী রহ. তাফসীরে রুহুল মাআনীতে উল্লেখ করেন:

والخاتم اسم الة لما يختم به كالطابع لم يطبع به فمعنى خاتم النبيين الذى ختم النبيون به ماله اخر النبيين.

“খাতাম (তা বর্ণে যবর) ঐ বস্তুকে বলা হয়, যার দ্বারা মোহর-সিল দেয়া হয়। সুতরাং ‘খাতামুননবীয়ীনে’র অর্থ হল-ঐ ব্যক্তি যার মাধ্যমে নবীদের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এ অর্থের মূলেই হচ্ছে সর্বশেষ নবী।”
-রুহুল মাআনী খ. ২২, পৃ. ৩২

আল্লামা আহমদ মোল্লা যিউন রহ. তাফসীরে আহমদীতে এ শব্দের ব্যাখ্যায় লেখেন:

والمال على كل توجيه هو المعنى الاخر ولذلك فسر صاحب المدارك قراءته عاصم بالآخر وصاحب البيضاوى كل القراءتين بالآخر.

“উভয় সূরতে (তা বর্ণে যবর কিংবা যের দেয়া হলে) এর অর্থ দাঁড়ায় সর্বশেষ। তাই তো তাফসীরে মাদারিকের রচয়িতা আসেমের কেরাত অর্থাৎ তা বর্ণে যবর দেয়া অবস্থায় এর ব্যাখ্যা সর্বশেষ বলে করেছেন।

আল্লামা বায়যাবীও উভয় কেরাতের (তা কে যবর এবং যের দেয়া অবস্থায়) অভিন্ন অর্থ করেছেন।”

রুহুল মাআনী এবং তাফসীরে আহমদীর উদ্ধৃতি থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হল যে, ‘খাতাম’ শব্দের দু’টি অর্থ হতে পারে। উভয়ের মর্ম, সারাংশ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। এর ওপর ভিত্তি করেই বায়যাবীর রচয়িতা উভয় অবস্থায় অর্থের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি। তিনি উভয় অবস্থায় সর্বশেষ নবী অর্থ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা অভিধান বিশেষজ্ঞদের উত্তম প্রতিদান দান করুক। তারা ‘খাতাম’ শব্দের অর্থ আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। যার আলোকে একথা বলিষ্ঠভাবে বলা যায় যে, এর অর্থ হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন নবীদের পরিসমাপ্তকারী, তিনিই সর্বশেষ নবী।

আল্লাহই ভাল জ্ঞাত আছেন যে, আরবী অভিধানের ওপর ছোট-বড় নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য কতই না গ্রন্থ লেখা হয়েছে। অসংখ্য অভিধানের মধ্য হতে কেবল কয়েকটি নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য গ্রন্থের আলোচনা এখানে করা হবে। যা আরব, অনারব সকলের নিকট সমাদৃত। এ অভিধানগুলোতে ‘খাতাম’ (তা যবর এবং যের অবস্থায়) এর অর্থ কি করা হয়েছে তা পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে।

(১) মুফরাদাতুল কুরআন : এটি ইমাম রাগেব ইসফাহানী রহ.-এর বিস্ময়কর সংকলন। এর দৃষ্টান্ত খোঁজে পাওয়া যাবে না। এতে কুরআনের শব্দের বিশ্লেষণ বিশেষ ভঙ্গিতে করা হয়েছে। শাইখ জালালউদ্দীন সূউতী রহ. ইতকান নামক কিতাবে লিখেন, কুরআনের শব্দের বিশ্লেষণ বিষয়ক কোন গ্রন্থ এর থেকে উত্তম আজ পর্যন্ত রচনা করা হয়নি। মুফরাদাতুল কুরআনে ‘খাতামুনবীয়ীন’- এর বিশ্লেষণে লেখা হয়:

وخاتم النبیین لانه ختم النبوة ای تممها بمجيئه.

“হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘খাতামুনবীয়ীন’ (সর্বশেষ নবী) এজন্য বলা হয় যে, তিনি নবুওয়তের ধারাকে সমাপ্ত করেন

অর্থাৎ তিনি আগমন করে নবুওয়তের ধারায় পরিসমাপ্তি টানেন।”
-মুফরাদাতে রাগেব পৃ. ১৪২

(২) আল মুহকাম লি ইবনে সাইয়েদ্যাহ : এটিও আরবী অভিধানের একটি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। এ অভিধান গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা জালালউদ্দীন সূউতীর মন্তব্য হল, এটিও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের শব্দের বিশ্লেষণে এর ওপর আস্থা রাখা যায়। এতে লেখা হয়েছে:

وخاتم كل شيء وخاتمته عاقبته واخره

“খাতাম এবং খাতিমা প্রত্যেক জিনিসের পরিণতি এবং শেষকে বলা হয়।” -লিসানে আরব খ. ২, পৃ. ১৬৩, রচয়িতা আল্লামা ইবনে মনজুর আল আফ্রীকি আল মিসরী

(৩) লিসানুল আরব : এটি একটি গ্রহণযোগ্য অভিধান গ্রন্থ। আরব অনারব সর্বত্র এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এতে উল্লেখ হয়েছে:

خاتمهم وخاتمهم: اخرهم عن اللحياني ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء عليه الصلوة والسلام.

“খাতিম (যেদের সাথে) খাতাম (যবরের সাথে) অর্থ হল সর্বশেষ। এর ওপর ভিত্তি করে লিহয়ানী বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী।” -লিসানুল আরব খ. ৪, পৃ. ২৫, ছাপা বৈরুত।

এথেকে সুস্পষ্ট হয়ে যে, খাতাম (যবর দিয়ে পড়া) কিংবা খাতিম (যের দিয়ে পড়া) উভয় অবস্থাতেই ‘খাতামুল্লাহীয়ায়ীন’ খাতিমুল আদ্বীয়া অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। লিসানুল আরবের উক্ত উদ্ধৃতি হতে একথা প্রতিয়মাণ হয় যে, খাতাম (যবর এবং যের উভয় অবস্থায়) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। যদি কোন সম্প্রদায় কিংবা দলের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় কেবল সর্বশেষ এবং সমাপ্তকারী।

আরবী অভিধান অনুসন্ধান করলে প্রতিভাত হয় যে, খাতাম শব্দটি (যবর-যের অবস্থায়) যখন কোন সম্প্রদায় অথবা দলের সাথে সংযুক্ত হয়,

তখন এর অর্থ সর্বশেষই হয়ে থাকে। বর্ণিত আয়াতে ‘খাতাম’ শব্দটি নবীয়ীন শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, তাই এরও অর্থ সর্বশেষ নবী এবং নবীগণের ধারা সমাপ্তকারী ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কামুসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাজুল উরুস নামক গ্রন্থও এর সমর্থন করেছে।

(৪) তাজুল উরুস : আল্লামা যুবাইদী রচিত তাজুল উরুসে লিহয়ানীর উক্তি এরূপ বর্ণনা করা হয় যে,

ومن اسمائه عليه السلام الخاتم والخاتم وهو الذى ختم النبوة بمجيئه.

“রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণবাচক নামসমূহের অন্যতম হল আল খাতাম (যবরের সাথে), আল খাতিম (যেরের সাথে)। আর খাতাম ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার আগমনের মাধ্যমে নবুওয়তের ধারা সমাপ্ত করেছেন।” -তাজুল উরুস খ. ৮, পৃ. ২৬৭

(৫) কামুস : কামুসে উল্লেখ হয়েছে:

والخاتم اخر القوم كالخاتم ومنه قوله تعالى وخاتم النبيين اى اخرهم

“খাতাম বা খাতিম শব্দটির অর্থ হল সম্প্রদায়ের সর্বশেষ ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলার বাণী খাতামুননবীয়ীন-এর অর্থ হল নবীগণের সর্বশেষ নবী।”

আরবী অভিধানগ্রন্থের সংখ্যা অগণিত। এখানে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল। আশা করি পাঠকবৃন্দ নিশ্চিত হয়েছেন যে, আরবী অভিধানের আলোকে উল্লিখিত আয়াতের খাতামুননবীয়ীন শব্দের অর্থ সর্বশেষ নবী ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

সারাংশ

উক্ত আয়াতে ‘খাতামুননবীয়ীন’ শব্দটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবইনদের ব্যাখ্যার আলোকে এর অর্থ হচ্ছে সর্বশেষ নবী। অভিধান বিশেষজ্ঞগণ তাদের সংকলন দ্বারা একথাই প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে, ‘খাতাম’ শব্দটি যখন বহুবচনের সাথে সংযুক্ত হবে, তখন

এর অর্থ ‘সর্বশেষ’ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সুতরাং মির্যা কাদিয়ানীও ‘খাতাম’ শব্দটি বহুবচনের সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করেছে। সেও ‘সর্বশেষ’ অর্থ করেছে। তার উক্তি এখানে উল্লেখ করা হল:

میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہو اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔

“আমার পরে আমার পিতা-মাতার ঘরে কোন পুত্র-কন্যা আগমন করেনি। আমিই তাদের সর্বশেষ সন্তান ছিলাম।” -তিরইয়াকুল কুলুব পৃ. ১৫৭, রুহানী খাযায়েন পৃ. ৪৭৯, খ. ১৫

খতমে নবুওয়তের ওপর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম

এ বিষয়ের ওপর উলামায়ে কেরাম অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্য হতে কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

(১) খতমে নবুওয়ত কামেল। এটি উর্দু ভাষায় রচিত। রচয়িতা হলেন প্রখ্যাত মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.

(২) মিসকুল খাতিম ফি খতমে নবুওয়তি সাযিদিলা আনাম। রচয়িতা হলেন হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দোলভী রহ.।

(৩) আকীদাতুল উম্মাহ ফি মাআনা খতমিন্নবুওয়ত। রচয়িতা হলেন হযরত আল্লামা ড. খালেদ মাহমুদ দামাত বারাকাতুহুম।

(৪) কুরআন-সুন্নাতে আলোকে খতমে নবুওয়ত। উর্দু ভাষায় রচিত। রচয়িতা হলেন হযরত মাওলানা সরফরায় খান সফদর রহ.।

(৫) ফালসাফায়ে খতমে নবুওয়ত। রচয়িতা হলেন হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারভী রহ.।

(৬) খতমে নবুওয়ত। রচয়িতা হলেন প্রোফেসার ইউসুফ সলিম চিশতী রহ.।

(৭) মাসআলায়ে খতমে নবুওয়ত ইলম ওয়া আকল কি রোশানী মে। রচয়িতা হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক সিন্দলভী।

(৮) খাতামুননবীয়া। রচয়িতা হলেন হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.।

(৯) আলমগীর নবুওয়ত। রচয়িতা হলেন হযরত মাওলানা শামছুল হক আফগানী রহ.।

(১০) আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত। রচয়িতা হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুখিয়ানবী রহ.।

(১১) কাদিয়ানী ধর্মমত। এটি বাংলা ভাষায় রচিত। রচয়িতা হলেন মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী রহ। (অনুবাদক)

প্রশ্ন নম্বর তিন

খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করুন।

উত্তর

খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে অন্য সূরার আয়াত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ হল।

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (১)

“তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্যদ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে আপরাপর দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন।” -সূরা তওবাহ ৩৩, সূরা আস্সাফ-৯

জয়যুক্ত হবার পদ্ধতি হল হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত- রেসালতের ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা এবং সে মোতাবেক আমল করা ফরয করা হয়েছে। সকল নবীর নবুওয়তের ওপর ঈমান আনা এর অধীন করা দেয়া হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সকল নবীর পরে আগমন করেছেন, তাই তাঁর নবুওয়তের ওপর ঈমান আনাই হচ্ছে অতীতের সকল নবীর ওপর ঈমান আনা। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তাঁর পরে কোন নবী আগমন করবে, তবে ঐ নবীর প্রতি ঈমান আনা সকলের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এটিই হচ্ছে দ্বীনের বিধান। যদি এক্ষিপই হত, তবে সকল দ্বীনের জয়লাভ উক্ত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হত না; বরং তাঁর দ্বীন এবং অন্যান্য দ্বীনের প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরে প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান না আনার কারণে মুসলমান বলা যাবে না, কাফের হিসেবে পরিগণিত হবে। এর কারণ হল তাঁর পরে প্রেরিত রসূলই হল বর্তমান যমানার মানুষের জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী। নাউযুবিল্লাহ।

واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه

“আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন নবীদের কাছ থেকে যে, যা কিছু আমি তোমাদের কিতাব ও হেকমত দিয়েছি এবং তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রসূল আসবে তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।” -সূরা আলে ইমরান-৮১

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, সত্যায়নকারী রসূলের আগমন সকল নবীর শেষে হবে। আর তিনিই হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ আয়াতে দু’টি শব্দ চিন্তার বিষয়। একটি হল ‘মিসাকুনুন্নাযীয়ীন’। যা থেকে জানা যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে সকল নবী থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল ‘সুম্মা জাআকুম’। সুম্মা (ثم) শব্দটি বিলম্বের অর্থ দিয়ে থাকে। অর্থাৎ এরপর যা হবে- তা বিলম্বই হবে। মাঝে ব্যবধান থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সর্বশেষে হবে। মাঝে বিরতি হবে। এজন্যই তাঁর আগমনের পূর্বের সময়কে ‘বিরতিকাল’ বলা হয়। যেমন কুরআনে উল্লেখ হয়েছে:

قد جاءكم رسولنا بين لكم على فترة من الرسول

“তোমাদের কাছে এসেছেন আমার রসূল, যিনি রসূল আগমনের বিরতির পর তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।” -সূরা মায়দা-১৯

(৩) وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا

“আমি তোমাকে সকল মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা এবং ভিত্তি প্রদর্শনকারী পাঠিয়েছি।” -সূরা সাবা ২৮

(৪) قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا

“হে নবী! আপনি বলে দিন হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রসূল।” -সূরা আরাফ-১৫৮

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত রসূল। এ সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য হল:

انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی.

“বর্তমানে যাদের আমি জীবিত পেয়েছি এবং যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে আমি সকলেরই রসূল।” -কানযুল উম্মাল খ.১১, পৃ.৪০৪, হাদীস ৩১৮৮৫, খাসাইসে কুবরা খ. ২ পৃ. ৮৮

ওপরের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কেউ নবী হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সকল মানবের নবী। কোন যুগে, কোন সময়ে কোন প্রকারের নবী আগমনের সুযোগ নেই। কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেরই তিনি নবী।

(৫) وما ارسلنک الا رحمة للعالمین

“আপনাকে আমি গোটা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।” -সূরা আশ্বিয়া ১০৭

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান জগৎবাসীর মুক্তির জন্য যথেষ্ট। যদি তাঁর পরে কোন নবী প্রেরিত হয়, তবে তাঁর উম্মতের জন্য ফরয হল ঐ নবীর ওহীর ওপর ঈমান আনা। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখা সত্ত্বেও যদি ঐ নবীর নবুওয়ত এবং ওহীর প্রতি ঈমান না আনে তবে মুক্তি পাওয়া যাবে না। আর এটি ‘রহমতুল্লিল আলামিনের’ও বিরোধী। নাযাতের জন্য তাঁর প্রতি ঈমান আনাও যথেষ্ট নয়। তিনি সর্বজনিन নবীও নন। নউযুবিল্লাহ।

اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا(৬)

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” -সূরা মায়দা-৩

প্রত্যেক নবীই তাঁর যুগের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী শরীয়ত নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেন। জনাবে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আগমনের পূর্বে যুগের প্রেক্ষাপট এবং চাহিদারও পরিবর্তন হত। তাই প্রত্যেক নবীই পরবর্তী নবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করে যেতেন। এক পর্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বসুন্ধরায় শুভাগমন করেন। তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণের ধারা পরিসমাপ্তির মাধ্যমে দ্বীন পরিপূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যায়। তাই তাঁর নবুওয়ত এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ ওহীর প্রতি ঈমান আনাই হচ্ছে পূর্বের সকল নবী এবং তাঁদের ওপর অবতীর্ণ ওহীর প্রতি ঈমান আনা। একারণে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে “তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম”। অর্থাৎ নিয়ামতে নবুওয়ত আমি তোমাদের সম্পূর্ণ করে দিলাম। সূতরাং দ্বীনের পরিপূর্ণতা এবং নিয়ামতে নবুওয়তের পূর্ণতার পরে না কোন নতুন নবী আসার সম্ভাবনা রয়েছে, না ওহী অবতীর্ণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে।

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে জনৈক ইহুদী আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক রাযি. কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, হে আমীরুল মুমিনীন! পবিত্র কুরআনের এ আয়াত যদি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত, তাহলে আমরা ঈদ উদযাপন করতাম। (বুখারী খ. ১, পৃ. ১১, কিতাবুল ঈমান) এ আয়াত অবতীর্ণের পর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮১দিন জীবিত ছিলেন। -মারেফুল কুরআন খ. ৩, পৃ. ৪১

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণের পর হালাল এবং হারাম বিষয়ক আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। অতএব, প্রমাণিত হল তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব হল পরিপূর্ণ এবং সর্বশেষ কিতাব।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى (৭)
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের ওপর, যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় রসূলের প্রতি এবং সে সমস্ত কিতাবের ওপর যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল ইতিপূর্বে।” -সূরা আননিসা - ১৩৬

উক্ত আয়াতের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা প্রতিভাত হয় যে, সকল মানুষের ওপর ফরয হল, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর নিকট অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনা। পূর্ববর্তী সকল নবী এবং প্রেরিত সমস্ত ঐশী গ্রন্থের ওপর ঈমান আনা জরুরী।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যদি কোন নবীর আগমনের সম্ভাবনা থাকত, তাহলে আমাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অবিহিত করা হত। তাঁর ওপর ঈমান আনাও ওয়াজিব হত। যেহেতু পবিত্র কুরআনে এ জাতীয় কোন সংবাদ পরিবেশন করা হয়নি, তাই প্রমাণিত হয় যে, তিনিই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে কোন প্রকারের নবীর আগমন হবে না।

والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون (৮)
اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون

“এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সব বিষয়ের ওপর, যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সব বিষয়ের ওপর, যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর পরকালকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুপথপ্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।” -সূরা বাকারা ৪,৫

لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما (৯)
انزل من قبلك

“কিন্তু তাদের মধ্যে হতে যারা জ্ঞানে পরিপক্ব ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে।” -সূরা নিসা - ১৬২

পূর্ববর্তী এবং উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানব সম্প্রদায়কে এমর্মে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের ওপর ঈমান আন। এজাতীয় অসংখ্য আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান আছে। যা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাব হচ্ছে সর্বশেষ কিতাব, তাঁর পর আর কোন

নবীর আগমন হবে না, পবিত্র কুরআনের পর কোন কিতাব আর অবতীর্ণ হবে না।

(১০) انانحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

“আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক”। -সূরা হিজর -৯

আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিধায় কারো পক্ষে সম্ভব নয় এর বিকৃতি করা, কোন পরিবর্তন করা। কেউই এর একটি শব্দ কিংবা নুকতারও পরিবর্তনের শক্তি রাখে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এর সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কিয়ামত পর্যন্ত এটি অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এ থেকেও আমাদের নিকট প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। এমন কোন কিতাব অবতীর্ণ হবে না, যা তাঁর কিতাবকে রহিত করে দেয়। এমন কোন শরীয়ত প্রেরিত হবে না, যা তাঁর শরীয়তকে বাতিল করে দেয়।

হাদীস শরীফের আলোকে খতমে নবুওয়ত

খতমে নবুওয়তের স্বপক্ষে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এর মধ্য হতে কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হল।

হাদীস নম্বর এক

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجلى بنى بنيانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زوايا من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين.

“হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি এবং পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি অতি সুরম্য ও চমৎকার একটি প্রাসাদ তৈরী করেছে; কিন্তু এক স্থানে একটি ইটের স্থান ফাঁকা রেখে দিয়েছে। লোকজন এর

চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে দেখে প্রাসাদের সৌন্দর্য অবলোকন করে আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছিল এবং একথাও বলছিল, এমন সুন্দর প্রাসাদে একটি ইটের স্থান কেন খালি রাখা হল? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই হলাম সেই ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।” -বুখারী খ. ১, পৃ. ৫০১, সহীহ মুসলিম খ. ২, পৃ. ২৪৮

হাদীস নম্বর দুই

عن ابى هريرة^{رض} ان رسول الله^ﷺ قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبىون.

“হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- (১) আমাকে পরিমিত অথচ সারগর্ভময় বাক্যে কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে।
- (২) শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।
- (৩) যুদ্ধলব্ধ মাল আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে।
- (৪) সমস্ত যমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করে দেয়া হয়েছে।
- (৫) আমাকে সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- (৬) আমার মাধ্যমে নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।”

-সহীহ মুসলিম খ. ১, পৃ. ১৯৯, মিশকাত পৃ. ৫১২

এ বিষয়ের অপর একটি হাদীস সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত যাবির রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে পাঁচটি জিনিস এমন প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। উক্ত হাদীসের শেষে উল্লেখ হয়েছে

وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة.

“পূর্ববর্তী নবীগণকে বিশেষ করে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। আর আমাকে তাবৎ মানবগোষ্ঠির নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।”-মিশকাত পৃ. ৫১২

হাদীস নম্বর তিন

عن سعد ابن وقاص^{رض} قال قال رسول الله ﷺ لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی وفى رواية المسلم انه لا نبوة بعدی.

“সাদাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি. কে বললেন, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক এমন, যেমন মুসা আ.-এর সাথে হারুন আ.-এর ছিল। কিন্তু পার্থক্য এতটুকুই যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই।”-বুখারী খ. ২, পৃ. ৬৩৩

হাদীস নম্বর চার

عن ابی هريرة^{رض} يحدث عن النبى ﷺ قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون.

“হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আশ্বিয়ায়ে কেরামই বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোন নবী ইত্তিকাল করতেন, তখনই পরবর্তী নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে নতুন কোন নবী আসবেন না; বরং খলিফাগণ প্রতিনিধিত্ব করবেন।”-বুখারী খ. ১, পৃ. ৪৯১, মুসলিম খ. ২, পৃ. ১২৬, মুসনাদে ইমাম আহমদ খ. ২, পৃ. ২৯৭

বনী ইসরাইলের কোন নবী ইত্তিকাল করলে তাঁর পরবর্তীতে অশরয়ী নবী আগমন করতেন। তিনি মূলত: হযরত মুসা আ.-এর শরীয়তের প্রচার করতেন। তবে প্রয়োজন বশত: আল্লাহর নির্দেশে তাতে সংস্কারও করতেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে সকল প্রকার শরয়ী কিংবা অশরয়ী নবীর আগমনের ধারার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। নবুওয়তের সুরম্য প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে চিরতরের জন্য।

হাদীস নম্বর পাঁচ

عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلمة يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى.

“হযরত সউবান রাযি. হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্য হতে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবী হবার দাবী করবে। অথচ আমিই হলাম সর্বশেষ নবী আমার পরে কোন নবী নেই।” -আবু দাউদ খ. ২, পৃ. ১২৭, কিতাবুল ফিতান, তিরমিযী খ. ২, পৃ. ৪৫

হাদীস নম্বর ছয়

عن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ ان الرسالة والنسوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي.

“হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রিসালত ও নবুওয়তের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমার পর নতুন কোন রসূল ও নবীর আগমন হবে না।” -তিরমিযী খ. ২, পৃ. ৫১, কিতাবু আবওয়াবির রুইয়া, মুসনাদে ইমাম আহমদ খ. ৩, পৃ. ২৬৭

হাদীস নম্বর সাত

عن ابي هريرة انه سمع رسول الله ﷺ يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامة يبدأ لهم أو تواتر الكتاب من قبلنا.

“আবু হুরায়রা রাযি. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনে যে, আমরা সর্বশেষে আগমন করেছি। কিয়ামত দিবসে সবার অগ্রে অবস্থান করব। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, তাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে।” -বুখারী খ. ১, পৃ. ১২০, মুসলিম খ. ১, পৃ. ২৮২

হাদীস নম্বর আট

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدى لكان عمر بن الخطاب.

“হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আমার পরে কেউ নবী হত, তাহলে উমর ইবনে খাত্তাব হত।” -তিরমিযী খ. ২, পৃ. ২০৯, আবওয়াবুল মানাকিব

হাদীস নম্বর নয়

عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي ﷺ يقول ان لى أسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحى الذى يمحو الله بهى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب الذى ليس بعده نبى.

“হযরত জুবাইর ইবনে মাতআম রাযি. বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার কয়েকটি নাম রয়েছে। (তাহলো) আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমিই মাহী (ধ্বংসকারী), আমার দ্বারা কুফরকে ধ্বংস করা হবে। আমিই হাশির (একত্রিতকারী), মানব সম্প্রদায়কে আমার চরণতলে একত্রিত করা হবে। আমিই আকীব, আর আকীব তাকেই বলা হয় যার পরে কোন নবী আসবে না।” -মিশকাত পৃ. ৫১৫

এ হাদীসে বর্ণিত নামগুলোর মধ্যে দু’টি নাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হবার প্রমাণ বহন করে। একটি হল ‘হাশির’। হাফিয ইবনে হাজার রহ. ফতহুলবারীতে এর ব্যাখ্যায় লিখেন,

اشارة الى انه ليس بعده نبى ولا شريعة فلما كان لامة بعد امته لأنه لا نبى بعده
نسب الحش الى له لانه يقع عقبه.

“এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর পরে কোন নবী এবং শরীয়ত নেই। যেহেতু তাঁর উম্মতের পর কোন উম্মত নেই, তাঁর পর কোন নবী নেই। তাই তাকে ‘হাশির’ বলা হয়। কেননা, তাঁর আগমনের পরই হাশর সংগঠিত হবে।” -ফতহুলবারী খ. ৬, পৃ. ৪০৬।

দ্বিতীয়টি হলো ‘আল আকিব’। যার ব্যাখ্যা বর্ণিত হাদীসেই রয়েছে যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই।

হাদীস নম্বর দশ

বহু হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত অঙ্গলী এবং মধ্যম অঙ্গলীর দিকে ইশারা করে বলতেন:

بعثت أنا والساعة كهاتين.

“আমাকে এবং কিয়ামত দিবসকে এ আঙ্গুল দু’টির ন্যায় প্রেরণ করা হয়েছে।” -মুসলিম খ. ২, পৃ: ৪০৬

আঙ্গুল দু’টি পরস্পর যেমন মিলিত, তদ্রূপ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিয়ামত দিবস। তাঁর শুভাগমন হল কিয়ামত নিকটবর্তী হবার নিদর্শন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী আসবে না। যেমন ইমাম করতবী রহ. তাযকেরা গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

اما قوله بعثت انا والساعة كهاتين فمعناه انا النبي الاخير فلا يلينى نبى اخر
وانما تلينى القيامة كما تلى السبابة الوسطى وليس بينهما اصبع اخرى
وليس بينى وبين القيامة نبى.

“তার বাণী ‘আমাকে এবং কিয়ামত দিবস এদু’টি প্রেরণ করা হয়েছে’- এর মর্ম হল আমি হলাম সর্বশেষ নবী। কোন নবী আমার অনুগামী হবে না। কিয়ামত আমার অনুগামী যেমন শাহাদাত এবং মধ্যম অঙ্গুলী। এ উভয়ের মাঝে অন্য কোন আঙ্গুল নেই। আমার এবং কিয়ামতের মাঝে কোন নবী নেই।” -আত তাযকির ফি আহওয়ালিল মউতা ওয়া উমুরিল আখিরা পৃ. ৭১১

আল্লামা সিন্দী রহ.-এর বাণী। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা সিন্দী রহ. সুনানুনাসাইর টিকাতে লিখেন:

التشبيه فى المقارنة بينهما اى ليس بينهما اصبع اخرى كما انه لا نبى بينه
صلى الله عليه وسلم وبين الساعة.

“উভয়ের মাঝে সম্মিলনের সাদৃশ্যতা অর্থাৎ উভয়ের মাঝে অন্য কোন আঙ্গুল নেই, যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিয়ামতের মধ্যবর্তীতে কোন নবী নেই। -হাশিয়ায়ে আল্লামা সিন্দী আলানাসাই খ. ১, পৃ. ২৩৪

খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের অভিমত

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গায্বালী রহ. ইকতিসাদ নামক কিতাবে উল্লেখ করেন,

این الامة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ و من قرائن احواله انه افهم
عدم نبی بعده ابدا.

কুরআন-হাদীস (লা নাবীয়া বাদী- আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হবে না) ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা সমগ্র উম্মত সর্বসম্মতভাবে এটি বুঝতে সক্ষম হয়েছে, তাঁর পরে কোন নবীর আবির্ভাব হবে না এবং আর কোন নবী আসবে না। -আল ইকতিসাদ ফীলইতিকাদ পৃ. ১২৩

আল্লামা মুল্লা আলী কারী রহ. খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে ফিকহে আকবরের শরাহে লিখেন, জনাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে কেউ নবী হবার দাবী করলে উম্মতের সর্ববাদী মতে নিঃসন্দেহে সে কাফির বলে গণ্য হবে। -শরহুল ফিকহিল আকবর পৃ. ২০২

আল্লামা ইবনে নাজীম আল মিসরী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করল না, সে মুসলমান নয়। কেননা, এটি দ্বীনের মাঝে অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। -আল আশবা ওয়ান্নাযায়ের খ. ২, পৃ. ৯১, ছাপা করাচী

তাফসীরে রুহুল মাআনী লেখক আল্লামা সাযিদ্দ মাহমুদ আলুসী রহ. 'খাতামুননাবীয়া'র ব্যাখ্যায় লিখেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়া, এটি এমন এক বাস্তবতা যে, যে সম্পর্কে কুরআন বক্তব্য দিয়েছে, হাদীসেও এ সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, উম্মত যে ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছে। যে ব্যক্তি এর বিপরিত দাবী করবে, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। যদি সে এর ওপর অবিচল থাকে তবে তাকে হত্যা করা হবে। -রুহুল মাআনী খ. ২২, পৃ. ৩৯

প্রশ্ন নম্বর চার

(ক) কাদিয়ানীরা খতমে নবুওয়তের অর্থের মাঝে কি ধরনের বিকৃতি করে?

(খ) এ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের অবস্থান সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন এবং সারগর্বপূর্ণ ভাষায় এর উত্তর দিন।

উত্তর

খাতামুলবীয়ীন এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়

‘খাতামুলবীয়ীন’-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম এবং অভিধান বিশেষজ্ঞদের অভিমত জানার পর এখন এ বিষয়ে কাদিয়ানীদের ভূমিকা কি তা লক্ষ্য করুন। তাদের বক্তব্য হল ‘খাতামুলবীয়ীন’-এর অর্থ হল নবীদের মোহর। অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ তাআলা নবুওয়ত প্রদান করতেন, এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে নবুওয়ত লাভ করা যাবে। যে ব্যক্তি রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে, তিনি তার ওপর মোহর লাগাবেন। অতঃপর সে নবী হয়ে যাবে। -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৯৭ হাশিয়া, পৃ. ২৮, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৩০, ১০০

আমাদের মতে কাদিয়ানীদের এ মতামত সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, ভুল, বাতিল, বিকৃতি, ধোঁকা-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে লিখেন যে, মির্যা এবং অনুসারীদের সংসাহস যদি থাকে, তাহলে আরবী অভিধান এবং আরবী ব্যাকরণ নীতিমালা দ্বারা একথা প্রমাণ করুক যে, ‘খাতামুলবীয়ীন’ অর্থ হল, তার মোহরে নবী হওয়া যায়। আরবী অভিধানের বিশাল সমুদ্র হতে কেবলমাত্র এর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করুক কিংবা কোন এক আরবী অভিধানবীদের বাণী এ অর্থের স্বপক্ষে পেশ করুক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গোটা কাদিয়ানী সম্প্রদায় তার নবী কিংবা নবী পুত্রসহ এর একটি দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় কিংবা অভিধান বিশেষজ্ঞদের অভিমত দেখাতে সক্ষম হবে না। মির্যা তাফসীরের মানদণ্ড হিসেবে সর্বপ্রথম কুরআন মজীদ, দ্বিতীয় হাদীসে রসূল এবং তৃতীয় পর্যায়ে সাহাবাদের অভিমতকে নির্ধারণ করেছেন। (বরকাতুদদোআ পৃ. ১৪, ১৫, রুহানী খাযায়েন খ. ৬, পৃ. ১৭-১৮) গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এ বক্তব্য কেবল হাতির দেখানো দাতের ন্যায় যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে ‘খাতামুলবীয়ীনের’ এ ব্যাখ্যা কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা দেখাক। যদি এও সম্ভব না হয়, তবে হাদীসের বিশাল ভান্ডার হতে মাত্র একটি হাদীস এর স্বপক্ষে পেশ করুক। অতঃপর আমরা একথা বলব না যে, কেবল বুখারী, মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করুক; বরং ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের দুর্বল হতে দুর্বল একটি বর্ণনা উপস্থাপন করুক যে, ‘খাতামুলবীয়ীন’-এর অর্থ তাঁর মোহরে নবুওয়ত পাওয়া যায়। যদি এও সম্ভব না হয় (ইনশাআল্লাহ

কখনো সম্ভব হবে না) তবে কমপক্ষে কোন সাহাবী কিংবা কোন তাবঈর বাণী এর পক্ষে পেশ করুক। যেখানে ‘খাতামুলনবীয়ীন’-এর এরূপ অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কাদিয়ানীর ব্যাখ্যা মিথ্যা-বাতিল হবার কারণ

(১) সূধী পাঠকবৃন্দ! ‘খাতামুলনবীয়ীন’-এর ব্যাখ্যায় কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে বলে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবী হওয়া যায়, তা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কেননা, আরবী ভাষায় এরূপ কোন পরিভাষা পওয়া যায় না। বরং তাদের এ ব্যাখ্যা আরবী ভাষা নীতিমালা বহির্ভূত ব্যাখ্যা।

(২) মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইয়ালাতুল আওহাম নামক গ্রন্থে ‘খাতামুলনবীয়ীন’-এর অর্থ করেছে যার মাধ্যমে নবুওয়ত সমাপ্ত হয়েছে। -ইয়ালাতুল আওহাম পৃ. ৬১৪, রুহানী খাযায়েন খ. ৩, পৃ. ৪৩১

(৩) গোলাম আহমদ কাদিয়ানী খাতাম শব্দটি অনেক স্থানে বহুবচনের সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করেছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হল।

ولدت في بيتنا بنت قبلی وكانت اسمها حنة وبی اکبر منی سناو كنت انا
خاتم الاولاد لوالدی لا ابن ولا بنت لهما بعدی.

“আমার পূর্বে আমাদের গৃহে আমার বোন জন্মগ্রহণ করে। তার নাম ছিল জান্নাত। সে বয়সে আমার বড় ছিল। আমি আমার পিতা-মাতার সর্বশেষ সন্তান। আমার পরে তাদের কোন পুত্র ও কন্যা নেই।” -তিরইয়াকুল কুলুব পৃ. ১৫৭, রুহানী খাযায়েন খ. ১৫, পৃ. ৪৭৯

মির্যা কাদিয়ানীর নিকট যদি ‘খাতামুল আওলাদ’ অর্থ তার পিতা-মাতার তারপরে না কোন ভাই ছিল, না কোন বোন, না ছোট না বড়, না খর্বকায়, না সুস্থ, না অসুস্থ তাহলে ‘খাতামুলনবীয়ীন’-এরও অর্থ হবে তার নিকট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী নেই, না যিল্লী, না বুরুযী, না শরয়ী, না অশরয়ী।

আর ‘খাতামুলনবীয়ীন’-এর অর্থ যদি হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবী হওয়া, তবে কাদিয়ানীদের নিকট খাতামুল

আওয়লাদের অর্থ এ হওয়া জরুরী যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মোহরে তার পিতা-মাতার সন্তান হওয়া।

(৪) মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হতে নিয়ে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পর্যন্ত কোন নবী প্রেরণ করা হয়নি।

এ সম্পর্কে মির্যা নিজে লিখে, মূল কথা হল এ উম্মতের মাঝে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে এতো অধিক পরিমাণে ওহী এবং গায়েবের বিষয়াবলী দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন ওলী, আবদাল, আকতাবকে দেয়া হয়নি। আমাকেই তার নিয়ামত দ্বারা পূর্ণ করেছেন এবং আমাকেই নবুওয়ত দানে ধন্য করেছেন, যা অন্য কাউকে করা হয়নি। -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৩৯১, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৪০৬

উল্লিখিত উদ্ধৃতি হতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, চৌদ্দশ বছরে কেবল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই নবুওয়ত লাভ করেছে। মির্যার পরে কাদিয়ানীদের মাঝেই খেলাফতের ধারা অব্যাহত আছে। নবুওয়তের দ্বার আবার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মির্যার পর আর কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহর দ্বারা নবুওয়ত লাভ করেনি। মির্যা মাহমূদ এ সম্পর্কে লিখে যে, তার আবির্ভাব আল্লাহর নিকট শেষ যমানায় নির্ধারিত ছিল, তিনি যখন মুহাম্মদী বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাকে নবুওয়ত প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি নবী হিসেবে প্রকাশ হন। -যমীমাহ নম্বর-১, হাকীকাতুননবুওয়ত পৃ. ২৬৮

(৫) “খাতামুলনবীয়ীন”-এর অর্থ যদি নবীগণের মোহর নেয়া হয় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহর দ্বারা নবী হওয়া উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে তিনি তাঁর পরবর্তী নবীদের জন্য মোহর হবেন। হযরত আদম আ. থেকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত নবীগণের জন্য তিনি “খাতামুলনবীয়ীন” নন। তাদের এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব, এ ব্যাখ্যা কখনো গ্রহণীয় হতে পারে না।

(৬) “খাতামুলনবীয়ীন”-এর কাদিয়ানীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে নবুওয়ত লাভ করেছে। এ ব্যাখ্যাও গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নিম্নোক্ত মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়।

কুরআনের এ আয়াত **وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** (অচিরেই আপনার রব আপনাকে নিয়ামত দান করবেন, তখন আপনি সন্তুষ্ট হবেন) এর উদ্দেশ্য হলো আমি। আল্লাহ তাআলা আমাকে এ তৃতীয় স্তরের মর্যাদা দিয়ে এমন নিয়ামত দান করেছেন, যা আমি আমার প্রচেষ্টায় পায়নি। বরং আমার মায়ের উদরেই আমাকে দান করা হয়েছে। -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৬৭, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৭০

সূধী পাঠক! মির্যাইদের মতে “খাতামুনবীযীন”-এর অর্থ নবীগণের মোহর। অনুসরণের মাধ্যমে এ মোহর লাভ করা যায় এটি কেবল মির্যার ওপর লেগেছে। এজন্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুনবী হয়েছেন। এখানে আবার মির্যার বক্তব্য ভিন্ন ধরনের। সে বলছে অনুসরণের মাধ্যমে নয়; বরং মায়ের উদরেই আমি এ নিয়ামত (নবুওয়ত) লাভ করেছি। তার এ ধরনের মন্তব্য থেকে বুঝা যায় “খাতামুনবীযীন”-এর মোহর দ্বারা আজ পর্যন্ত কেউ নবী হতে পারেনি। এখন আমাদের বক্তব্য খাতামুনবীযীন - এর অর্থ নবীগণের মোহর নেয়ার উপকারিতা কি?

প্রশ্ন নম্বর পাঁচ

- (ক) কাদিয়ানীদের পরিভাষায় যিল্লী ও বুরুযী বলতে কি বুঝায়?
(খ) এ সম্পর্কে ভণ্ড কাদিয়ানীর বক্তব্যের দ্ব্যর্থহীন উত্তর লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর

যিল্লী এবং বুরুযী

“যিল” আরবীতে ছায়াকে বলে। যেমন, কারো মন্তব্য হল গোলাম আহমদ কাদিয়ানী শয়তানের ছায়া ছিল। “বুরুযী”-এর অর্থ হল কোন ব্যক্তির স্থানে অন্য কেউ প্রকাশ হওয়া। যেমন, কারো উক্তি হল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী শয়তানের আকৃতি অবলম্বন করেছে এবং তার স্থলে প্রকাশ পেয়েছে। “হুলুল”-এর উদ্দেশ্য হল কারো আত্মা অন্যের মাঝে প্রবিষ্ট হওয়া। যেমন, কারো মন্তব্য হল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অভ্যন্তরে শয়তানের আত্মা প্রবিষ্ট হয়েছে। “তানাসুখ”-এর উদ্দেশ্য হল এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর সে পরবর্তী প্রজন্মে অপর মানুষের আকৃতি অবলম্বন করে প্রকাশ পাওয়া। যেমন, কেউ বলে থাকে

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ যুগের শয়তানের প্রতিবিম্ব হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যিল্লী নবী ছিল। অর্থাৎ জনাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে ছায়া হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে এর উদ্দেশ্য হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একাত্ম হয়ে যায় এবং মির্যার অস্তিত্বই হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব। যেমন, এ সম্পর্কে মির্যার বক্তব্য নিম্নরূপ **صارو جودى فحوده** ‘আমার অস্তিত্বই হচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব।’ -খোতবায়ে এলহামীয়া পৃ. ১৭৭, রুহানী খাযায়েন খ. ১৬, পৃ. ২৫৮

মির্যা আরো উক্তি হল, “মসীহ মাউদ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) নবী করীম হতে পৃথক কোন কিছু নয়। বরং তাই যা বুরূযী রঙে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করবে। এ অবস্থায় এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে যে, কাদিয়ানে আল্লাহ পুনরায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মির্যা) প্রেরণ করবেন। -কালিমাতুল ফযল পৃ. ১০৫, লেখক মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পুত্র মির্যা বশীর আহমদ

মির্যার মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ হবার কারণ হল, কাদিয়ানীদের বিশ্বাস অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন পূর্ব নির্ধারিত ছিল। প্রথমবার মক্কায় মুহাম্মদ আরবীর আকৃতিতে আগমন করেন, দ্বিতীয়বার কাদিয়ানে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বুরূযী আকৃতিতে আগমন করেন। মির্যার আকৃতিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আধ্যাত্মিকতার সাথে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

মির্যার বক্তব্য লক্ষ্য করুন !

“এবং জেনে রাখ যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন পঞ্চম হাজারে (ষষ্ঠ শতাব্দি খৃষ্টাব্দে) আবির্ভূত হয়েছেন, এরূপ মসীহ মাউদ (মির্যা কাদিয়ানী)-এর বুরূযী আকৃতি অবলম্বন করে ষষ্ঠ হাজারের (অর্থাৎ তের শতাব্দি হিজরী) শেষে আবির্ভূত হয়েছেন।” -খোতবাতে এলহামীয়া, রুহানী খাযায়েন খ. ১৬, পৃ. ২৭০

“আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব দু’বার নির্ধারিত ছিল। একে এভাবেও বলা যায় যে, একবার হল মুহাম্মদ নামে মক্কায় আগমন, দ্বিতীয়বার হল বুরূযী নবী হিসেবে যা মসীহ মাউদ এবং

মাহদী মাউদের নামে মির্যা কাদিয়ানীর আবির্ভাব।” -তোহফায়ে গ্লোরিয়া-১৬৩, হাশিয়া রুহানী খাযায়েন খ. ১৭, পৃ. ২৪৯

কাদিয়ানী সম্প্রদায় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়তের দাবীর ক্ষেত্রে যিল্লী, বুরুখীর পরিভাষা ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেয়। এশব্দের ছদ্মাবরণে তারা মূলতঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেআদবী করছে।

নিম্নে মির্যার কিছু বিভ্রান্তিকর উক্তি উল্লেখ করা হল

“আল্লাহ এক। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবী। তিনি খাতামুল আখীয়া। তিনি সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পরে কোন নবী নেই; কিন্তু তিনি হবেন বুরুখী নবী যাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদরে আবৃত করা হয়েছে। যেমন যখন তোমরা আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে থাক, তখন তুমি দু’টি সন্তা নয়। বরং তুমি একজনই। যদিও বাহ্যত দু’জন দৃশ্যমান হয়। এখনে কেবল ছায়া এবং মূলের পার্থক্য।” -কিশতীয়ে নূহ পৃ. ১৫, রুহানী খাযায়েন খ. ১৯, পৃ. ১৬

সূখী পাঠকবৃন্দ! মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কুফর, ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। তার কুফরীতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। তার দাবী “আমি যিল্লী, বুরুখী মুহাম্মদ”-এর অর্থ কি? যদি আয়নায় ছবুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা দেখতে চাও, তবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দেখ। উভয়ে অভিন্ন। তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। (নাআযুবিল্লা) আমি এখনে শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, কাদিয়ানীরা মির্যাকে বুরুখী, যিল্লী নবী বলে সাধারণ মানুষের সাথে যে প্রতারণা, ধোঁকা দিতে চাচ্ছে তা মৌলিকভাবেই ভ্রান্ত।

(১) “নুকতায় মুহাম্মদীয়া- এমনভাবে আল্লাহর ছায়া হবার কারণে আল্লাহর মর্যাদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন আয়নায় প্রতিচ্ছায়া তার মূল হতেই হয়। আল্লাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ জীবন, জ্ঞান, ইচ্ছা, কুদরত, কর্ণ, চক্ষু, বাকশক্তি সকল শাখা-প্রশাখাসহ পরিপূর্ণভাবে তার মাঝে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিচ্ছায়া হিসেবে দৃশ্যমান।” -সুরমায়ে চশমে আরিয়া পৃ. ২৭১-২৭২; হাশিয়া রুহানী খাযায়েন খ. ২, পৃ. ২২৪

(২) “হযরত উমরের অস্তিত্বই হচ্ছে যিল্লীভাবে। তার অস্তিত্বই হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব।” -আইয়্যামুস সোলেহ পৃ. ৩৯, রুহানী খাযায়েন খ. ১৪, পৃ. ২৬৫

(৩) “খলীফা মূলতঃ রসূলের ছায়া।” -শাহাদতুল কুরআন পৃ. ৫৭, রুহানী খাযায়েন খ. ৬, পৃ. ৩৫৩

কোন কাদিয়ানী কি একথা দাবী করতে পারবে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই খোদা, হযরত উমর এবং খোলাফায়ে রাশেদীন তার নবী রসূল। (নাআযুবিল্লাহ) মির্যা কাদিয়ানীর উক্তিএ একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিল্লী খোদা। এখন কি তিনি বাস্তবেই প্রকৃত এবং আসল খোদা হয়ে যাবেন? অথবা মাহমূদ কাদিয়ানীর পিতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী খোলাফায়ে রাশেদীন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হযরত উমর রাযি. আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া। এখন প্রশ্ন হল খলিফারা এবং হযরত উমর রাযি. কি যিল্লী নবী হয়ে প্রকৃত এবং বাস্তবে নবী হয়ে যাবেন? নিঃসন্দেহে এর উত্তর না বোধক হবে। মির্যা কাদিয়ানী তার ধারণা মতে যদিও যিল্লী নবী প্রমাণিত হয়, বাস্তবপক্ষে সে একজন ভণ্ড, প্রতারক ও মিথ্যা নবীদাবীদার।

(৪) হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে **السلطان (المسلم) ظل الله في الارض** (মুসলমান বাদশাহ পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া স্বরূপ)। এ হাদীস দ্বারা কি বাদশাহ “রব” হয়ে যাবে? তার অস্তিত্বকে রবের অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত হবে? মোটকথা, যিল্লী-বুরুযী যাই বলা হোক না কেন সবই হচ্ছে কাদিয়ানীদের ধোঁকা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা।

প্রশ্ন নম্বর ছয়

শরীয়তের পরিভাষায় ওহী, এলহাম এবং কাশফ বলতে কি বুঝায়? কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ পরিভাষাগুলোর কি ধরনের বিকৃতি করে থাকে? তাদের বিকৃতির উত্তর সুস্পষ্ট ভাষায় লিখুন।

উত্তর

ওহী :

শরীয়তের পরিভাষায় ওহী বলতে বুঝায় আল্লাহ তাআলার বাণী যা তাঁর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবীদের নিকট অবতীর্ণ হয়। ওহীকে নবুওয়তও বলা হয়। তা একমাত্র নবী-রসূলদের নিকটই অবতীর্ণ হয়। অনবীরা ওহীপ্রাপ্ত হয় না। আর যদি অন্তরে ভাব সৃষ্টি করা হয়, তাকে ‘ওহীয়ে এলহাম’ বলা হয়। এ অবস্থায় ফেরেশতার মাধ্যমে হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন আল্লাহ ওলীদের অন্তরে হয়ে থাকে। আর যদি স্বপ্নের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘রুইয়াতুস সালেহা’ বলা হয়। যা সাধারণ মুমিন বান্দাদের বেলায় হয়ে থাকে। ‘কাশফ’, ‘এলহাম’ এবং ‘রুইয়াতুস সালেহা’কেও অবিধানে ওহী বলা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে *واوحينا الى ام موسى* (মুসার মাতার নিকট আমি ওহী প্রেরণ করলাম) কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় নবীগণের নিকট প্রেরিত বার্তাকেই ওহী বলা হয়।

শাদিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে পবিত্র কুরআনে শয়তানের প্ররোচনাকেও ওহী শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন,

وان الشيطان ليوحون الى اوليائهم

“আর শয়তানরাতো তার বন্ধুদের প্ররোচিত করে।”-সূরা আনআম-১২১

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيطان الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا

“এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি শয়তানদেরকে মানুষ ও জিনদের থেকে তাদের একে অপরকে প্রতারণার উদ্দেশে মনভুলানো বাক্যে কুমন্ত্রণা দেয়।”-সূরা আনআম-১১২

শরীয়তের পরিভাষায় শয়তানী প্ররোচনার ক্ষেত্রে ওহী শব্দ ব্যবহার হয় না।

এলহাম :

‘এলহাম’ বলতে বুঝায় কোন কল্যাণকর বিষয়ে অবলোকন, চিন্তা-ফিকির ছাড়া এবং কোন বাহ্যিক উপকরণ ব্যতীত আল্লাহর পক্ষ থেকে

অন্তরে ভাব সৃষ্টি হওয়া। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা অর্জিত হয় তাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ জ্ঞান বলা হয়। আর যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মস্তিষ্ক ব্যতীত আল্লাহর পক্ষ হতে কোন উপকরণ ছাড়াই মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়, তাকেই এলহাম বলে। এলহাম হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান এবং ঈমানী দূরদর্শিতা। হাদীসের আলোকে এলহাম কখনো অর্জন করা যায়, আবার কখনো প্রদেয়। কাশফ যদিও তার মর্ম হিসেবে এলহাম হতে ব্যাপক তবুও কাশফের সম্পর্ক হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাথে, আর এলহামের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে।

কাশফ :

অদৃশ্য জগতের কোন বিষয় হতে পর্দা দূর করে প্রত্যক্ষ করার নামই হচ্ছে কাশফ। কাশফের পূর্বে বিষয়টি পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এখন কাশফের মাধ্যমে সে পর্দা বিদূরিত করা হল এবং তা প্রকাশ হয়ে গেল। কাজী মুহাম্মদ থানবী রহ. “কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুন” নামক গ্রন্থের ১২৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, “সালিকিনদের নিকট কাশফ হল উন্মোচিত হওয়া, খুলে যাওয়া। আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক বিষয়ালীর মাঝে যে পর্দা ছিল তা উন্মোচিত হওয়া। ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা যা সম্ভব নয়।”

অতঃপর তিনি বলেন, “অন্তরের পরিশুদ্ধতা এবং নূরানী হবার জন্য পর্দা উন্মোচিত হবার ওপর নির্ভর করে। অন্তর যে পরিমাণ পরিশুদ্ধ হবে, আলোকিত হবে, সে পরিমাণ পর্দা উন্মোচিত হবে। পর্দার উন্মোচন হওয়া অন্তরের আলোকিত হবার ওপর নির্ভর; কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।”
-কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুন খ. ২, পৃ. ১২৫৪

ওহী এবং এলহামের মাঝে পার্থক্য

নবীর প্রতি প্রেরিত ওহী নিশ্চিতভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তা সম্পূর্ণরূপে ভুল-ভ্রান্তি হতে নিরাপদ। ওহীর প্রচার নবীর ওপর ফরয। উম্মতের জন্য এর অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে এলহাম যন্নী (আকাউত নয়) হয়ে থাকে। এটি ভুল-ভ্রান্তি হতে নিরাপদ নয়। আওলিয়ায়ে কেরামও মাসুম (নিষ্পাপ) নন। তাই আওলিয়াদের এলহাম অন্যদের জন্য দলীল নয়। এলহামের দ্বারা কোন নির্দেশ শরীয়তের বিধান হিসেবে কার্যকরী করা যাবে না। এমনকি মুস্তাহাব পর্যায়েও নয়। শরীয়তের বিধানের জ্ঞান নবীর ওহীর সাথেই সম্পৃক্ত। অনবীর ওপর যে এলহাম হয়,

তা মূলতঃ সুসংবাদ এবং শরহে সদর (হৃদয় উন্মোচন) হিসেবে হয়ে থাকে। একে শরীয়তের বিধান বলা যাবে না। যেমন হযরত মরীয়ম আ.-এর ওপর যে ওহী এলহাম হয়েছিল, তা ছিল সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত, শরীয়তের বিধান হিসেবে নয়। আল্লাহ বলেন, انا اوحينا الى امك ما يوحى (যখন আমি গায়েবী নির্দেশে তোমার মাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যা জানাবার ছিল -সূরা ত্বাহা-৩৮।) ক্ষেত্র বিশেষ ওহীয়ে এলহাম শরীয়তের কোন বিধান বুঝার জন্য হয়ে থাকে। এলহামের সাথে রুইয়াতে সালেহার (স্বপ্ন) যে সম্পর্ক, তাই নবীর ওহীর সাথে এলহামের। অর্থাৎ যেভাবে রুইয়াতে সালেহা (স্বপ্ন) এলহাম হতে মর্যাদায় কম, তদ্রূপ নবীর ওহী হতে এলহাম নিম্নস্তরের। যেভাবে রুইয়াতে সালেহাতে (স্বপ্ন) এক ধরনের অস্পষ্টতা, গোপনীয়তা আছে। পক্ষান্তরে এলহাম তা থেকে অধিক স্পষ্ট। তদ্রূপ এলহামও ওহী হতে অস্পষ্ট। ওহী হচ্ছে সুস্পষ্ট। এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে হযরতুল আল্লাম ইদ্রীস কান্দোলভী রহ. রচিত আল ইলাম বিমানাল কাশফি ওয়াল ওহী ওয়াল এলহাম দেখুন।

ওহী প্রেরণ বন্ধ হয়ে যায়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর ওহীর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মনীষীবৃন্দের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১) হযরত আবু বকর রাযি. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের সময়ে বলেন, اليوم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام

“আজ আমাদের নিকট ওহী নেই এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফরমানও নেই।” -কানযুল উম্মাল খ. ৭, পৃ. ২৩৫, হাদীস নম্বর-১৮৭৬০

(২) অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর রাযি. একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন,

قد انقطع الوحي وتم الدين او ينقص وانا حي

“ওহী প্রেরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমার জীবদ্দশায় কি এর ক্ষতির সূচনা হবে?” -আররিয়ায়ুন নযরাহ খ. ১, পৃ. ৯৮, তারিখুল খোলাফা লিসসুউতী পৃ. ৯৪

(৩) হযরত আনাস রাযি. বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর একদিন হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. হযরত উমর রাযি.কে বললেন, চলুন হযরত উম্মে আয়মন রাযি.-এর

সাক্ষাত করে আসি। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমরা তিনজন তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম। হযরত উম্মে আয়ম্ন রাযি. আমাদের দেখে কাঁদতে শুরু করলেন। এ অবস্থায় হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমর রাযি. বললেন, দেখুন উম্মে আয়ম্ন! আপনি কেন কাদছেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাই উত্তম যা আল্লাহর নিকট নির্ধারিত ছিল। উত্তরে উম্মে আয়ম্ন রাযি. বলেন,

قد علمت ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ابكى على
خبر السماء انقطع عنا

“এতো আমিও জানি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাই উত্তম যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আমার ক্রন্দনের কারণ হল আকাশের সংবাদ (ওহী) আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।” -কানুযুল উম্মাহ খ. ৭, পৃ. ২২৫, হাদীস নং ১৮৭৩, মুসলিম খ. ২, পৃ. ২৯১

(৪) আল্লামা কুরতবী রহ. বলেন,

لان يموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي

“এজন্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালে ওহী বন্ধ হয়ে গিয়েছে।” -মাওয়াহেবে লুধুনিয়া পৃ. ২৫৯

(৫) আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী রহ. স্বীয় ফতুয়ার কিতাবে উল্লেখ করেন

ومن اعتقد وحيًا لعبد محمد صلى الله عليه وسلم كفرًا بجماع المسلمين

“যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর ওহী অবতরণের ধারণায় বিশ্বাসী, সে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত মতে কাফির।” -খতমে নবুওয়ত পৃ. ৩২২ লেখক মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.

কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাশফ, এলহাম এবং ওহীর অর্থের মাঝে বিকৃতি করেনি। বরং এগুলোর মর্ম উপস্থাপনায় প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। তারা কাশফ এবং এলহামের সাথে সাথে মিথ্যা গোলাম আহমদের ওপর নবীর ন্যায় ওহী অবতীর্ণের ধারণায় বিশ্বাসী। মিথ্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ওপর যে সব ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তা তারা পুস্তক আকারে ছাপিয়েছে

এবং এর নাম দিয়েছে ‘তায়কির’। অথচ ‘তায়কির’ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের নামসমূহের একটি। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ فِي صَحْفٍ مَكْرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مَطْهُرَةٍ

“না, কখনো এরূপ করবেন না, এতো উপদেশ বাণী। অতএব, যার ইচ্ছা হয়, সে তা গ্রহণ করুক, যা আছে সম্মানিত লিপিসমূহে, যা মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র।” -সূরা আবাসা-১১-১৪

উক্ত আয়াতে কুরআন মজীদকে ‘তায়কির’ বলা হয়েছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাদের কিতাবের নাম তায়কির রেখেছে। যদি এর নাম কুরআন মজীদ রাখত, তাহলে মুসলিম সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। এ শংকায় তারা তাদের গ্রন্থের নাম কুরআনেরই একটি অপ্রসিদ্ধ নামে নামকরণ করেছে। তায়কিরার প্রথম পৃষ্ঠায় শিরনাম দিয়েছে ‘তায়কির ইয়ানী ওহী মুকাদ্দস ওয়া রুইয়ায়ে সালিহা ওয়া কাশফে হযরত মসীহ মাউদ’ নামে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। তায়কিরায় মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১৮। এতে তার ওপর তাদের অবতীর্ণ তথাকথিত ওহী সংকলন করা হয়েছে। মোটকথা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দাবী হল গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ওপর ওহী অবতীর্ণের ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ওহী অবতীর্ণের ধারা বন্দ হয়ে গিয়েছে। আর যে লোক বা সম্প্রদায় ওহী অবতীর্ণের ধারণায় বিশ্বাসী হবে, সে কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। নিম্নে মির্যার হাজার মিথ্যা দাবীর মধ্য হতে কয়েকটি দাবী উল্লেখ করা হল।

(১) “যেমন আমি বারবার বর্ণনা করেছি যে, এ কালাম যা আমি শ্রবন করি, তা অকাউভাবে এবং নিশ্চিতরূপে আল্লাহর কালাম। যেমন কুরআন মজীদ এবং তাওরাত আল্লাহর কালাম। আমি আল্লাহর যিল্লী এবং বুরুখী নবী। প্রত্যেক মুসলমানের দ্বিনি বিষয়ে আমার অনুসরণ ওয়াজিব। আমাকে মসীহ মাউদ হিসেবে মানা ওয়াজিব।” -তোহফাতুননদওয়া পৃ. ৭, রুহানী খাযায়েন খ. ১৯, পৃ. ৯৫

(২) “আল্লাহ তাআলার ঐ পবিত্র ওহী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে রসূল, মুরসাল এবং নবী জাতীয় শব্দ বিদ্যমান আছে। একবার নয় হাজার বার উল্লেখ হয়েছে। এরপর সে উত্তর কিতাবে বিশুদ্ধ হবে, যাতে বলা হয়েছে যে, এ শব্দগুলোর উল্লেখ নেই? বরং বর্তমানে তো পূর্বের তুলনায় আরো সুস্পষ্টভাষায় বিবৃত হয়েছে। বারাহীনে আহমদীয়া

যা ছাপা হচ্ছে বাইশ বছর ধরে, তাতে বহুবার এশব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে। বারাহীনে আহমদীয়ায় যে সব ‘মকালামাতে এলাহীয়া’ (আল্লাহর বাণী) ছাপা হয়েছে তহার একটি হল,

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

“তোমরা বারাহীনে আহমদীয়ায় দেখ। সেখানে এই অক্ষর (মির্যা) কে সুস্পষ্টভাবে রসূল বলে সম্বোধন করা হয়েছে।” -মাজমুআয়ে ইশতিহারাৎ খ. ৩, পৃ. ৪৩১, এক গলতীকা এয়ালা পৃ. ২, রুহানী খাযায়েন খ. ১৮, পৃ. ২০৬ আনবুওয়ত ফিল ইসলাম পৃ. ৩০৭, হাকীকাতুল ওহী পৃ. ২৬১

(৩) “মোট কথা এ উম্মতের মাঝে আমি এক বিশেষ ব্যক্তি যাকে এতো অধিক পরিমাণ ওহী, এলহাম দেয়া হয়েছে এবং অদৃশের জ্ঞান দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন আওলিয়া, আবদাল এবং কুতুবকে প্রদান করা হয়নি। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমাকে নবুওয়ত দান করা হয়েছে। অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৩৯১, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৪০৬

(৪) “আমি যেভাবে কুরআন শরীফের ওপর ঈমান রাখি, তদ্রূপ নিঃসংকোচে যে ওহী আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতেও ঈমান আনি, যা আমার নিকট বিশ্বস্ততার সাথে প্রেরিত হয়েছে। বায়তুল্লাহ-এ দাঁড়িয়ে আমি কসম করে বলতে পারি যে, আমার নিকট যে পবিত্র ওহী অবতীর্ণ হয়, তা ঐ আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি হযরত মূসা আ. হযরত ঈসা আ. এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্বীয় কালাম অবতীর্ণ করেছেন।” -এক গলতীকা এয়ালা পৃ. ৮, রুহানী খাযায়েন খ. ১৮, পৃ. ২১০, যমীমায়ে নবুওয়ত ফিল ইসলাম পৃ. ৩১০, হাকীকাতুলনবুওয়ত পৃ. ২৬৪, মাজমুআ ইশতিহারাৎ খ. ৩, পৃ. ৪৩৫

(৫) “ধারাবাহিকভাবে ত্রিশ বছর যাবৎ আমার নিকট যে ওহী প্রেরিত হচ্ছে, তা আমি কিভাবে প্রত্যাখ্যান করব? আমি তার পবিত্র ওহীর ওপর এমন ঈমান পোষণ করি যেমন আল্লাহর ঐ সকল ওহীর ওপর ঈমান রাখি যা আমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল।” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৫০, রুহানী খাযায়েন, খ. ২২, পৃ. ১৫৪

সূধী পাঠক! লক্ষ্য করুন, নিম্নে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজের নিকট জিব্রাইল আ. আসারও দাবী করেছে।

جاء آئل واختاروا داراصبعه وأشاره ان اوعد الله انى فطوبى لمن وجد وراى

(৬) “আমার নিকট আয়েল আসল। আমাকে পছন্দ করল। স্বীয় আঙ্গুল ঘুরাল এবং ইঙ্গিত করল যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে গিয়েছে। সুসংবাদ তার জন্য যে তাকে পাবে এবং দেখবে। (এ স্থানে আল্লাহ জিব্রাইলের নাম আয়েল রেখেছেন।)” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১০৩, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ১০৬

(৭) “এবং আল্লাহ তাআলা আমার জন্য এতো অধিক পরিমাণ নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, যদি ঐ সব নিদর্শন হযরত নূহ আ.-এর যুগে দেখাত, তবে মানুষ ডুবে যেত না।” -তাতিম্মায়ে হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৩৭, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৫৭৫

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী আদ্বীয়ায়ে কিরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হতে মুক্ত থাকা। অর্থাৎ নিস্পাপ হওয়া। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও নিজেকে নবীদের মতো নিস্পাপ মনে করে।

(৮) ما انا الا كالقران وسيظهر على يدى ما ظهر من الفرقان

“এবং আমি তো কুরআনেরই অনুরূপ। ফুরকান হতে যা প্রকাশ পেয়েছে শীঘ্রই তা আমার নিকট প্রকাশ পাবে।” -তায়কিরা ৬৭৪

পবিত্র কুরআন মজীদ মুসলমানদের ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ। কাদিয়ানীর অনুসারীরাও কুরআনকে ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত মনে করে। তাই মির্যা নিজের পবিত্রতা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করতে চায়।

(৯) نحن نزلناه وانا له لحافظون

“আমিই একে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই একে হেফাযত করব।” -তায়কিরা ১০৭

কুরআনের এ আয়াতটি মির্যা কাদিয়ানী বিকৃতি করে নিজের ব্যাপারেই প্রয়োগ করেছে। কুরআন যেরূপ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং আল্লাহ যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি, বিকৃতি হতে একে সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেছেন, তদ্রূপ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে পবিত্র মনে করে। ভুল-ভ্রান্তির উর্ধে ভাবে।

(১০) وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى (১০) - তাযকির ৩৭৮-৩৯৪

উলামায়ে কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরাম সকলেই ঐক্যমত যে, নবুওয়ত ও রেসালত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমেই শেষ হয়েছে। তাঁর পরে কেউ নবী-রসূল হবে না। যে ব্যক্তি তাঁর পরে নবুওয়তের দাবী করবে সে নিঃসন্দেহে ইসলামের বৃত্ত হতে খারিজ এবং মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, নবুওয়ত ও রেসালতের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট আছে যা আওলিয়ায়ে কেরামদের প্রদান করা হয়। যেমন এলহাম, কাশফ, সত্যস্বপ্ন এবং কেরামত। নবুওয়তের এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য এখনো অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নবী বলা কোনভাবেই জায়েয হবে না। এমন কি তার কাশফ বা এলহামের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব নয়। ঈমান কেবল আল্লাহর কিতাব এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ওপর আনতে হবে। নবীর স্বপ্নও ওহী। কিন্তু ওলীদের স্বপ্ন, এলহাম শরীয়তের আলোকে দলীল নয়। নবীর স্বপ্ন দেখে একজন নিষ্পাপ শিশুকেও যবেহ করা জায়েয। পক্ষান্তরে ওলীদের এলহামের মাধ্যমে কাউকে হত্যা করা জায়েয তো দূরের কথা, কোন প্রকারের অনুমতিও প্রমাণিত নয়। মোট কথা যতবড়ই বুয়ুর্গ হোক না কেন তার কাশফ, এলহাম দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলী প্রমাণের দলীল হতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে একথাকে উপস্থাপন করা যায় যে, কোন ব্যক্তির মাঝে বাদশাহ কিংবা মন্ত্রী কিছু বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমানের কারণে সে বাদশাহ বা মন্ত্রী হয়ে যায় না। এর ওপর ভিত্তি করে কেউ যদি বাদশাহ কিংবা মন্ত্রী দাবী করে, তবে তাকে তৎক্ষণাত গ্রেফতারের হুকুম জারী করা হবে। তদ্রূপ কোন ব্যক্তির মাঝে নামকে ওয়াস্তে নবুওয়তের কিছু বৈশিষ্ট্যাবলী পাওয়া গেলে তাকে নবুওয়তের সিংহাসনে সমাসিন মনে করা জায়েয নেই। বরং যে ব্যক্তি নবুওয়ত ও রেসালতের দাবী করবে, তাকে মুরতাদ, ধর্মদ্রোহী গণ্য করা হবে।

عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة الا المبشرات.

“হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন,

ভাল স্বপ্ন ব্যতীত নবুওয়তের কোন অংশ অবশিষ্ট নেই।” -বুখারী কিতাবুত তাবীর খ. ২, পৃ. ১০৩৫

উক্ত হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়তের ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওহী অবতীর্ণের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ! নবুওয়তের অংশের মাঝে মাত্র একটি অংশ এখনো অবশিষ্ট আছে। আর সেটি হল মুসলমানদের সত্যস্বপ্ন। বুখারী শরীফের অপর একটি হাদীস এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, সত্যস্বপ্ন হল নবুওয়তের চিচল্লিশতম অংশ।

একটি সন্দেহ এবং এর অপনোদন

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল পবিত্র কুরআন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও কাদিয়ানী সম্প্রদায় মিথ্যা ধ্যাণ-ধারণায় বিশ্বাসী। তারা নিজেরাও গোমরাহ অন্যদেরকেও গোমরাহ করতে সদা তৎপর। কুরআন-হাদীসের বিকৃতিতে তাদের অন্তরে সামান্নতম কম্পন সৃষ্টি হয় না। এজন্য আল্লাহ তাআলার এ ঘোষণা

وكذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار

(এমনিভাবে আল্লাহ মোহর এঁটে দেন প্রত্যেক দান্তিক, ঔদ্ধতের অন্তরে) যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

হাদীস শরীফের ঘোষণা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে নবুওয়ত ও রেসালতের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার কাদিয়ানী সম্প্রদায় হাদীস দ্বারাই নবুওয়তের ধারা অব্যাহত আছে বলে প্রমাণের অপপ্রয়াস চালায়। তাদের দাবী হল, বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবুওয়তের এক ভাগ এখনো অবশিষ্ট আছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়ত প্রেরণের ধারা বর্তমানেও বিদ্যমান। যেমন এক ফোটা পানি কে পানিই বলা হয়। তেমনি নবুওয়তের একভাগ বাকী থাকার অর্থই হচ্ছে নবুওয়ত প্রেরণের ধারা অব্যাহত থাকা। বিবেকবানদের ফয়সালার ওপর ছেড়ে দিলাম যে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে একজন ভণ্ড, মিথ্যা নবীদাবীদারের বক্তব্য হল, কোন জিনেসের অংশ বিশেষের দ্বারা পূর্ণ অংশ উদ্দেশ্য নেয়া যায়। তার নিকট খন্ড আর আস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এর থেকে এটাই বুঝা

যাচ্ছে যে, নামাযের এক অংশ 'আল্লাহ্ আকবার'কে পূর্ণ নামায, ওয়ূর এক অংশ যেমন হস্ত ধোয়াকে পূর্ণ ওয়ূ বলা যাবে। এমনিভাবে 'আল্লাহ্ আকবার' শব্দকে পূর্ণ আযান, এক মিনিট রোযা পালনকে পূর্ণ দিবস রোযা রাখা বুঝাবে। আমাদের বক্তব্য হল, কাদিয়ানী নবীর বরকতে যদি কোন জিনিসের এক অংশকে পূর্ণ জিনিস বলা হয়, খন্ড দ্বারা গোটা উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তবে এক ইটকে পূর্ণ ইমারত বলা সঠিক হবে। লবনকে পোলাও, আর পোলাও কে লবন বলা কোন ভুল হবে না। এক টুকরো কাপড়কে পূর্ণ পোষাক, এক আঙ্গুলের নখকে গোটা মানুষও বলা যাবে।

কতই না চমৎকার! নবী হলেতো এমনই হওয়া দরকার যে, সাধারণ নিয়মনীতির মাঝে পরিবর্তন করে দেয়া যায়। যদি একটি ইটকে গোটা ইমারত, লবনকে পোলাও, এক টুকরো কাপড়কে পূর্ণ পোষাক বলা না হয়, তবে নবুওয়তের চিচল্লিশতম অংশকেও পূর্ণ নবুওয়ত বলা যাবে না। এক ফোটা পানিকেও পানি বলা হয়, আবার সমুদ্রের পানীকেও পানি বলা হয়। এ কথা সকলের জানা আছে যে, এক ফোটা পানিতে তার উপকরণগুলোর সবই বিদ্যমান আছে। তবে পার্থক্য হল, সমুদ্রের পানিতে উপকরণগুলোর পরিমাণ বেশী, আর এক ফোটা পানিতে এর উপস্থিতি কম। এক ফোটা পানিতেও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বিদ্যমান থাকে। এজন্যই পানির এক ফোটাকে পানির অংশ বলা হয় না। পানির অংশ হল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। তাই যে রূপ কেবল হাইড্রোজেনকে পানি বলা ভুল, তদ্রূপ কেবল অক্সিজেনকেও পানি বলা ভুল। এমনিভাবে নবুওয়তের কোন অংশকে নবুওয়ত বলাও ভুল।

প্রশ্ন নম্বর সাত

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়তের মিথ্যা দাবীর স্বপক্ষে কুরআনের যে আয়াত এবং যে হাদীসের বিকৃতি করে থাকে, তার মধ্য হতে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করত: এর সঠিক উত্তর লিখুন।

উত্তর

কাদিয়ানীদের সাথে খতমে নবুওয়ত এবং নবুওয়তের ধারা অব্যাহত থাকার বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা নীতিগতভাবে ভুল। কেননা, আমাদের এবং কাদিয়ানীদের মাঝে খতমে নবুওয়ত এবং নবুওয়তের ধারা অব্যাহত থাকা নিয়ে বিতর্ক নেই। মুসলমানরা খতমে নবুওয়তকে স্বীকার করে, তারাও করে। তবে হ্যাঁ- পার্থক্য আছে। মুসলমানদের নিকট রহমতে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কিয়ামত পর্যন্ত কেউই

নবী হবেন না। কাদিয়ানীদের নিকট মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ নবী হতে পারবে না।

মুসলমান এবং কাদিয়ানীদের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। মুসলমানদের বিশ্বাস হল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুওয়তের দ্বার চিরতরের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে কাদিয়ানীদের মতে গোলাম আহমদের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এ পার্থক্য সুস্পষ্ট হবার পর কাদিয়ানীদের নিকট আমাদের দাবী তারা গোটা কুরআনের একটি আয়াত কিংবা হাদীস ভাণ্ডার হতে একটি হাদীস পেশ করুক, যাতে উল্লেখ আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ হয়নি। তাঁর পরে চৌদ্দশ বছরে মির্খাই একমাত্র নবী হবে। মির্খার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কেউ নবী হবে না। সকল জীবিত এবং মৃত কাদিয়ানীরা একত্রিত হয়ে এ সম্পর্কে একটি আয়াত কিংবা একটি হাদীসও পেশ করতে পারবে না।

মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী

(১) “নবীর দায়িত্ব পালনের জন্য আমাকেই নির্বাচন করা হয়েছে। অন্য সকলে এর যোগ্য নয়।” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৩৯১, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৪০৬, ৪০৭

(২) “বুরুযে মুহাম্মদী যা পূর্ব হতেই প্রতিশ্রুত ছিল, সেই হলাম আমি। এজন্য আমাকে বুরুযী রঙের নবুওয়ত প্রদান করা হয়েছে। এ নবুওয়তের মোকাবেলায় গোটা দুনিয়া দুর্বল। কেননা, নবুওয়তের ওপর মোহর মারা হয়েছে যা এক বুরুযে মুহাম্মদী যাবতীয় মুহাম্মদী বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে শেষ যমানার জন্য নির্ধারিত ছিল। সুতরাং সে প্রকাশ পেল। এখন নবুওয়তের বর্ণা হতে পানি সংগ্রহের কোন পাত্র বাকী নেই।” -এক গলতী কা এযালা পৃ. ১১, রুহানী খাযায়েন খ. ১৮, পৃ. ২১

(৩) “এজন্য আমরা এ উম্মতের মাঝে কেবল একই নবীর দাবীদার। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস হল, এ সময় পর্যন্ত এ উম্মতের মাঝে অন্য কেউ নবী হয়নি।” -হাকীকাতুননবুওয়ত পৃ. ১৩৮, লেখক মির্খা মাহমুদ কাদিয়ানী

(৪) “তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যারা একজন পবিত্র নবীকে গ্রহণ করেনি। সৌভাগ্যবান তারা, যারা চিনতে পেরেছে। আমি খোদার পথসমূহের সর্বশেষ পথ। আমি তার নূরের মাঝে সর্বশেষ নবী। দুর্ভাগা

তারা, যারা আমাকে পরিত্যাগ করল। কেননা, আমি ব্যতীত সবই হচ্ছে অন্ধকার।” -কিশতিয়ে নূহ পৃ. ৫৬, রুহানী খাযায়েন খ. ১৯, পৃ. ৬১

فأراد الله ان يتم النبء ويكمل البناء باللبنۃ الاخيرة فانك اللبنۃ (৫)

“সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলেন যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করবেন এবং সর্বশেষ ইট স্থাপনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করবেন। অতএব, আমি হলুম সে ইট।” -খোতবায়ে এলহামিয়া পৃ. ১১২, রুহানী খাযায়েন খ. ১৬, পৃ. ১৭৮

(৬) “উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে একের অধিক নবী কোন অবস্থাতেই আসতে পারে না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের মাঝে কেবল একজন আল্লাহর নবী আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেন, যিনি হলেন মসীহ মাউদ। তিনি ব্যতীত কারো নাম কখনো নবীউল্লাহ অথবা রসূলুল্লাহ রাখা হয়নি। না আরো নবী আসার সংবাদ তিনি দিয়েছেন। বরং ‘লা নবীআবাদী’ (আমার পরে কোন নবী নেই) বলে আরো নবী আসার সুযোগ নাকচ করে দিয়েছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, মসীহ মাউদ ব্যতীত আমার পরে কখনো নবী অথবা রসূল আসবে না। -রেসালায়ে তাশহীযুল আযহান কাদিয়ান, মার্চ ১৯১৪। উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে সর্বশেষ নবী দাবী করে। অর্থাৎ মিষাই হল খাতামুলনবীয়ায়ীন। (নাআযুবিল্লাহ)

কাদিয়ানীদের বিকৃতি

আয়াত নম্বর এক

يبنى ادم اما ياتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتقى واصلح
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

“হে বনী আদম! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে রসূল এসে আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে শুনান, তখন যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” -সূরা আরাফ-৩৫

কাদিয়ানীর বক্তব্য

এ আয়াত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাই উক্ত আয়াতে তাঁর পরে আগত রসূলগণের কথা উল্লেখ

হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আদম সন্তানদের সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত আদম সন্তান এ পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত নবুওয়তের ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রথম উত্তর

এ আয়াতে পূর্বের রুকুতে তিনবার ‘ইয়া বনী আদম’ উল্লেখ হয়েছে। প্রথম ‘ইয়া বনী আদমের’ সম্পর্ক (তোমরা بعضكم لبعض عدو (তোমরা পরস্পর শত্রু হয়ে অবতরণ কর) এর সাথে। (ইহবিহু) দ্বারা হযরত আদম এবং হযরত হাওয়ার সাথে সাথে আদম সন্তানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত ৩৫নম্বর আয়াত উল্লেখ হয়েছে। সূরা আরাফের দশ নম্বর আয়াত হতে হযরত আদম আ.-এর আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, বাস্তবে আয়াতের সম্বোধন প্রথম যুগের আদম সন্তানদেরই করা হয়েছে।

আলোচনার ধারাবাহিকতা এবং পূর্বাপর থেকে প্রমাণিত হয় যে, অতীতকালীন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উত্তর

পবিত্র কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি হতে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, যারা ঈমান কবুল করেছে তাদেরকে يا ايها الذين امنوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর যাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, এখনো দাওয়াত কবুল করেনি, তাদেরকে يا ايها الناس বলে সম্বোধন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের কোথাও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে يا بني آدم বলে সম্বোধন করা হয়নি। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে উল্লিখিত আয়াতে অতীতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

জরুরী ব্যাখ্যা

يا بني آدم এর ব্যাপকতার কারণেও উম্মতে মুহাম্মদীয়াও পূর্বের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যদি সে হুকুম রহিত না হয়ে থাকে। যদি রহিত হয়ে যায়, কিংবা তদস্থলে এমন কোন হুকুম জারী করা হয়, যাতে উম্মতে মুহাম্মদীয়া অন্তর্ভুক্ত নয়, তখন ঐ হুকুমের ব্যাপকতার আওতাধীন উম্মতে মুহাম্মদীয়া হবে না।

তৃতীয় উত্তর

কাদিয়ানী সম্প্রদায় একটু চিন্তা করেছে কি আদম সন্তানের মাঝে তো হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইহুদী, শিখ ও বুদ্ধীষ্টরাও অন্তর্ভুক্ত? এখনো কি এ

সম্প্রদায়গুলো হতে কেউ নবী হতে পারবে? যদি না হয়, তবে কেন এদের এ আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্তি হতে খারিজ করা হয়? এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সম্ভোধণ ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কোন কোন জিনিস ব্যাপকতা হতে খারিজ হয়ে যায়। এ ছাড়াও নারী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ও আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভোধণের ব্যাপকতা হতে কি এদুই সম্প্রদায় খারিজ নয় কি? যদি বলা হয় যে, নারী সম্প্রদায় হতে তো প্রথমেও কেউ নবী হয়নি। তাই এখনো এদের হতে কেউ নবী হবে না। এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য হল, প্রথমে নবী রসূল আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করতেন। আর তোমাদের কথা মতেতো অনুসরণের দ্বারা নবী হওয়া যায়। হিজড়া এবং নারী সম্প্রদায়তো অনুসরণকারী হয়ে থাকে। তাই কাদিয়ানীদের যুক্তি অনুযায়ী নারী এবং হিজড়াদের থেকেও নবী হওয়া চাই।

চতুর্থ উত্তর

يا بنى ادم اما ياتينكم رسول (আমার পক্ষ হতে কোন শরীয়ত আসে) এর মাঝেও তো প্রতিশ্রুতির শব্দ ياتينكم আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তধারী নবীরও আগমন হতে পারে। আর কাদিয়ানীদের আকীদা-বিশ্বাস হল এর বিপরিত। তাদের মতে শরীয়তধারী কোন নবী আসার সুযোগ নেই।

পঞ্চম উত্তর

(১) ياتينكم হল শর্তের হরফ। যা বস্তুবে হওয়া জরুরী নয়। মুযারের সিগা। (মুযারে হল বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ। সিগা হল মূলধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ) প্রত্যেক মুযারের জন্য চলমান হওয়া জরুরী নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে افما ترين من البشر احدا (যদি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখেন। সূরা মরীয়ম-২৬) এখানেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বলে কি হযরত মরীয়ম আ. কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থেকে কোন মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে থাকবেন? বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ যদিও কখনো কখনো চলমান কালের জন্য ব্যবহার হয়, কিন্তু এরজন্য কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকা জরুরী নয়। এক দু'বার পাওয়ার দ্বারাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদের চলমানের অর্থ আদায় হয়ে যায়। এরই একটি দৃষ্টান্ত হল পবিত্র কুরআনের آيات من البشر যা উপরে উল্লেখ হয়েছে।

(২) انا انزلنا التورۃ فیہا ہدی ونور یحکم بہا النبیون

“আমি অবতীর্ণ করেছিলাম তাওরাত যাতে ছিল হেদায়াত ও আলো। এ তাওরাতের মাধ্যমে ইহুদীদের ফয়সালা দিত নবীগণ।”-সূরা মায়েদাহ-৪৪

উল্লেখ্য যে, তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা প্রদানকারীরা অতীত হয়ে গিয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর আর কারো এমন কি তাওরাত যার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তারও এর প্রচারের কোন সযোগ নেই।

(৩) واوحی الی هذا القران لانذرکم به ومن بلغ

“এবং আমার কাছে এ কুরআন প্রেরিত হয়েছে যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে সবাইকে সতর্ক করি।”-সূরা আনআম-১৯

কোন সন্দেহ নেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন। কিন্তু পরক্ষভাবে তাঁর ভীতি প্রদর্শন এবং সুসংবাদ প্রদান রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

(৪) وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر

“আমি পর্বতসমূহকে দাউদের আদেশানুবর্তী করে দিয়েছিলাম যেন তারা তার সাথে তাসবীহ পাঠ করে এবং পক্ষীসমূহকেও।”-সূরা আশ্বিয়া-৭৯

পর্বত এবং পাখীদের তাসবীহ হযরত দাউদ আ.-এর জীবদ্দশা পর্যন্তই ছিল। তাঁর অবর্তমানে তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ বন্দ হয়ে যায়।

উপরে উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ষষ্ঠ উত্তর

(১) اما یاتینکم منی ہدی

“যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত আসবে।”-সূরা বাকারা-৩৮

(২) واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین

“আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হবার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।” -সূরা আনআম-৬৮

(৩) فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

“সুতরাং যদি আপনি তাদেরকে যুদ্ধে কাবু করতে পারেন, তবে তাদের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দিন যারা তাদের পিছনে রয়েছে তাদেরকে, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।” -সূরা আনফাল-৫৭

(৪) واما نرينك بعض الذي نعدهم اونتوفينك فاليما مرجعهم

“আর তাদের সাথে আমি যে শাস্তির অঙ্গীকার করেছি যদি তার কিছু আপনাকে দেখাই অথবা আপনাকে ওফাত দান করি সর্বাবস্থায় তাদের আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” -সূরা ইউনুস-৪৬

(৫) اما يبلغن عندك الكبر احد بما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما

“যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তুমি তাদেরকে উহ পর্যন্ত বল না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা।” -সূরা বণী ইসরাইল-২৩

(৬) اما ترينى مايوعدون رب فلا تجعلنى فى الظالمين

“যদি আমাকে সে আযাব দেখান যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছে, হে আমার রব! আমাকে शामिल করবেন না সে যালিমদের দলে।” -সূরা মুমিনুন ৯৩

(৭) فاما ترين من البشر احدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما

“যদি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখেন তবে বলে দিন, আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশে রোযা মানত করেছি।” -সূরা মারইয়াম-২৬

(৮) واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله

“আর যদি প্ররোচিত করে তোমাকে শয়তানের প্ররোচনা তাহলে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ কর।” -সূরা আরাফ-২০০

فاما نزهين بك فانا منهن منتقمون (۵)

“অতঃপর আমি যদি আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাই, তবুই আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবই।” -সূরা যখরুফ-৪১

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদের শব্দ তাগিদের সাথে ব্যবহৃত হবার পরও কদিয়ানী সম্প্রদায় এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আয়াতগুলোতে চলমান ক্রিয়া বুঝান হয়নি। বরং এর দ্বারা অতীতকালীন ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সপ্তম উত্তর

ইমাম সূউতি রহ. 'দুররুল মনসুর' নামক কিতাবে **يَا بَنِي آدَمَ** (ইয়া বানী আদম) আয়াতিন্কে **رَسُلَ مِنْكُمْ** (রসল মিন্কে) এর আলোচনায় বলেন, আবু ইয়াসার সালমা হতে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. এবং তাঁর সন্তানদের (স্বীয় কুদরতের) মুষ্টিতে নিয়ে বলেন, **يَا بَنِي آدَمَ** (ইয়া বানী আদম) **أَمَّا يَاتَيْنَكُمْ رَسُلَ مِنْكُمْ** (আম্মা ইয়াতিন্কে রসল মিন্কে) **يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ أَيْمَاتِي** (ইয়াক্‌সুনু 'আইয়াকিম ইয়াতি) অতঃপর রসূলদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বলেন, **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ** (ইয়া ইয়াহা রুসল কলুওয়ান্না তাল্লিযাত)। মোটকথা, এসবই হচ্ছে রুহের জগতের আলোচনা।

অষ্টম উত্তর

কিছুক্ষণের জন্য যদিও উক্ত আয়াতকে নবুওয়তের ধারা অব্যাহতের স্বপক্ষের দলীল মেনে নেয়া হয়, তবুও মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য নবী হতে পারে না। কেননা, সে তার উক্তি অনুযায়ী নিজেই আদম সন্তান নয়। আর উক্ত আয়াততো আদম সন্তানদের জন্য প্রজোয্য। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজের পরিচয় দিতে যেয়ে বলে,

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ ادم زاد ہوں، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

বারাহীনে আহমদীয়া খ. ৫, রুহানী খাযায়েন খ. ২১, পৃ. ১২৭

দ্বিতীয় আয়াত

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

“আর যে ব্যক্তি আনুগত্য করবে আল্লাহ ও রসূলের, এরূপ ব্যক্তির সে ব্যক্তিদের সঙ্গী হবেন যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তারা হলেন; নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিবর্গ। আর কত উত্তম সঙ্গী এরা।” -সূরা নিসা-৬৯

এ আয়াতের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে যেয়ে কাদিয়ানীদের বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূলের অনুসরণ করবে, সেই নবী হবে, সিদ্দীক হবে, শহীদ হবে এবং সালাহ হবে। এ আয়াতে চারটি মর্যাদালাভের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যদি মানুষ সিদ্দীক, সালাহ হতে পারে, তবে নবী হতে পারবে না কেন? তিনটি স্তরকে অব্যাহত বিশ্বাস করা আর একটির ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবার ধারণা কি বিকৃত ব্যাখ্যা নয়? যদি কেবল সঙ্গলাভ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তবে কি হযরত সিদ্দীকে আকবর এবং ফারুককে আযম শহীদ এবং সিদ্দীকদের সাথে হবেন। অথচ তারা নিজেরাই কি সিদ্দীক এবং শহীদ নন?

উত্তর -১

উক্ত আয়াতে চারটি স্তর প্রাপ্তির কথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে, সে পরকালে আযীযা, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককারদের সঙ্গী হবে। যা আয়াতের শেষাংশ احسن اولئك رفيقا (আর কতই উত্তম সঙ্গী এরা) দ্বারা সুস্পষ্ট হয়।

উত্তর -২

উক্ত আয়াতে সাহচর্য উদ্দেশ্য। হুবুহু জিনিস হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। পৃথিবী জীবনে সকল মুমিনের পক্ষে সাহচর্য লাভ সম্ভব নয়, বিধায় এর উদ্দেশ্য হল পরকালীন সাহচর্য। দশম হিজরী শতাব্দির মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালউদ্দীন সিদ্দীকী সূউতী রহ. তাফসীরে জালালাইনে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেন, উল্লেখ্য জালালাউদ্দীন সূউতী রহ. কাদিয়ানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

قال بعض الصحابة للبنى صلى الله عليه وسلم كيف نرك في الجنة وانت في الدرجات العلى ونحن اسفل منك فنزل ومن يطع الله والرسول. وحسن اولئك رفيقا. رفقاء في الجنة بان يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وان كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة الى غيرهم

“কোন কোন সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জান্নাতে উচু মর্যাদার অধিকারী হবেন। আর আমরা হব নিচু স্তরের। সেখানে আমরা কি ভাবে আপনার সাক্ষাত লাভ করব? অতঃপর উক্ত আয়াত **من يطع الله والرسول** অবতীর্ণ হয়। এখানে সঙ্গী দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাতী সঙ্গী। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নবীদের সাক্ষাত লাভে ধন্য হবেন। যদিও নবীগণ অন্যদের তুলনায় উচ্চাসনে সমাসিন থাকবেন।”- জালালাইন পৃ. ৮০

এমনিভাবে তাফসীরে কবীরে উল্লেখ হয়েছে:

من يطع الله والرسول ذكروا في سبب النزول وجوها: الاول روى جمع من المفسرين ان ثوبان مولى رسول الله ﷺ كان شديد الحب لرسول الله ﷺ قليل الصبر عنه فاتاه يوما وقد تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه فسأله رسول الله ﷺ عن حاله فقال يا رسول الله ما بى وجع غير انى اذا لم اراك اشتقت اليك واستوحشت وحشة شديدة حتى القاك فذكرت الاخرة فخفت ان لا اراك هناك لأنى ان ادخلت الجنة فانت تكون فى درجات النبيين وانا فى درجة العبيد فلا اراك وان انا لم ادخل الجنة فحينئذ لا اراك ابدا فنزلت هذه الآية.

“**من يطع الله** মুফাসসিরদের নিকট আয়াতটি অবতীর্ণের কয়েকটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। এর মাঝে প্রথমটি হল, হযরত সওবান রাযি. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই আশেক ছিলেন। সামান্যতম বিচ্ছেদ তাঁর অধৈর্য্যের কারণ ছিল। একদিন চিন্তিত অবস্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসেন। তাঁর চেহারা বিমর্ষতা এবং বিষণ্ণতার ছাপ ছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে হযরত সওবান রাযি. আরয করলেন, আমার কোন কষ্ট নেই। বাস! এতটুকু যে, আপনাকে না দেখতে পেলে সাক্ষাতের বাসনায় অস্থির হয়ে পড়ি। একপর্যায়ে আমার পরকালের কথা স্মরণ হয়। আমি শংকিত যে, সেখানে তো আপনার সাক্ষাৎ পাব না। আমি যদি জান্নাতে প্রবেশেরও সুযোগ পাই, তবুও আপনিতো নবী। আপনি উচু

স্তরের জান্নাত লাভ করবেন। আমরা হলাম আপনার গোলাম পর্যায়ে। আর যদি জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ নাই পাই, তবে চিরস্থায়ীভাবে আপনার সাক্ষাত হতে বঞ্চিত থাকব। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।”
-তাফসীরে কবীর ওয়া মাফাতীহুল গাইব। খ. ১০, পৃ. ১৭৫

অনুরূপ অভিমত তাফসীরে রুহুল বয়ান ও ইবনে কাসীরে উল্লেখ হয়েছে।

হাদীস

قال رسول الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

“রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সৎ ব্যবসাই এবং আমানতদার (কিয়ামত দিবসে) নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে থাকবেন।” -মুনতাখাব কানযুল উম্মাল খ. ৪, পৃ. ৭ হাদীস নং ৯২১৭, ইবনে কাসীর খ. ১, পৃ. ৫২৩, ছাপা মিসর

যদি সঙ্গী হওয়া দ্বারা বর্ণিত মর্যাদালাভ প্রমাণিত হয়, তবে কাদিয়ানীরাই বলুক বর্তমান যমানায় কতজন আমানতদার এবং সৎ ব্যবসাই নবী হবেন? (নাউযুবিল্লাহ)

عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبى يمرض الاخير بين الدنيا والاخرة وكان فى شكواه الذى قبض اخذته بحبة شديدة فسمعتة يقول مع الذين انعمت عليهم من النبيين فعملت انه خير.

“হযরত আইশা রাযি. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন নবী যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, (মৃত্যুসম্মুখীন হয়ে) তখন দুনিয়া এবং পরকাল সম্পর্কে এখতিয়ার দেয়া হয়। অধিক কাসিতে আক্রান্ত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। তিনি অসুস্থ অবস্থায় বলতেছিলেন, مع الذين انعمت عليهم من النبيين। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁকে দুনিয়া এবং

পরকাল হতে একটির এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।” -মেশকাত পৃ. ৫৪৭, ইবনে কাসীর খ. ১, পৃ. ৫২২

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বর্ণিত আয়াতে নবী হবার কথা বলা হয়নি। কেননা, তিনিতো পূর্ব হতেই নবী ছিলেন। বরং এ হাদীসটি হল তাঁর পরকালে সঙ্গীলাভ সংক্রান্ত বিষয়ে।

মর্যাদালাভের আলোচনা

পবিত্র কুরআনের যে আয়াতগুলোতে পার্থিব জীবনে ঈমানদারদের মর্যাদালাভের আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে নবুওয়তের কথা উল্লেখ নেই। যেমন,

(১) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ رُسُلَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (১)

“আর যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলদের প্রতি, তারাই তাদের রবের কাছে সিদ্দীক ও শহীদ।” -সূরা হাদীদ-১৯

(২) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদের নেককার বান্দাদের মধ্যে দাখিল করব।” -সূরা আকাবুত-৯

(৩) أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بما مواليهم
وانفسهم في سبيل الله والئك هم الصادقون

“প্রকৃত মুমিন তো তারাই, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি, পরে কখনো সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যবাদী।” -সূরা হুজরাত-১৫

উক্ত আয়াতগুলোতে সিদ্দীক, সৎ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলীলাভের কথা বলা হয়েছে। নবুওয়তের বৈশিষ্ট্যলাভের কথা বলা হয়নি। মোটকথা, যেখানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যলাভের কথা উল্লেখ হয়েছে, সেখানে নবুওয়তের

কথা বলা হয়নি। আর যেখানে নবুওয়তের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মর্যাদালাভের কথা উল্লেখ হয়নি, বরং সঙ্গতলাভের কথা বলা হয়েছে।

উত্তর -৩

তেরশ বছরের মাঝে কেউ কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেননি? যদি অনুসরণ-অনুকরণ করেই থাকেন, তাহলে কেউ নবী হননি কেন? আর যদি কেউ অনুসরণ না করে থাকেন, তবে তাঁর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ না হয়ে সর্বনিকৃষ্ট উম্মত হত। (নাউযুবিল্লাহ) উম্মতের মধ্য হতে কেউই তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ করেননি। অথচ সূরা তওবার ৭১নং আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দেন যে, ‘তাঁর সাহাবারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে।’ যদি আল্লাহর সাক্ষ্য অনুযায়ী পরিপূর্ণ অনুসরণ করে থাকেন, তাহলে তাদের মাঝ হতে কেউই নবী হলেন না কেন? যেহেতু কাদিয়ানীদের কথা অনুযায়ী পরিপূর্ণ অনুসরণের দ্বারা নবুওয়ত লাভ করা যায়, তাই বড় বড় সাহাবারা এ মর্যাদা লাভে ধন্য হতেন। তাঁদের উদ্দেশ্যেই তো পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ‘আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।’ আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বাধিক বড় নিয়ামত। যেমন সূরা তওবার ৭২নং আয়াতে বলা হচ্ছে “আল্লাহর সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত।”

উত্তর -৪

কাদিয়ানীদের দাবী অনুযায়ী যদি পাঁচ মিনিটের জন্য ধরে নেয়া হয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণের মাধ্যমে নবুওয়ত লাভ করা যায়, তাহলে উক্ত আয়াতে শরীয়তধারী কিংবা অশরীয়তধারী বলে খাস করা হয়নি। তোমরা অশরীয়তধারী নবীর সাথে কেন খাস করে নিচ্ছ? যদি এ আয়াতে নবুওয়ত লাভের কথা উল্লেখ হয়ে থাকে, কিন্তু আয়াতে তো ‘নবীয়ীন’ শব্দ এসেছে ‘মুরসালীন’ শব্দ বলা হয়নি। রসূল বলা হয় যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে শরীয়ত প্রাপ্ত হোন। আর নবী হল যিনি স্বতন্ত্র শরীয়ত প্রাপ্ত হোন না। তাইতো নবী এবং রসূলের সংজ্ঞায় পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এ হিসেবে শরীয়তধারী রসূলের আগমনের কথা। আর এটা হচ্ছে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের বিপরিত ধারণা। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তব্য হল:

و اما بنمعت ربك فحدث আয়াতটি আমার সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলা আমাকে তৃতীয় স্তরের মর্যাদা দিয়ে ঐ নিয়ামত দান করেছেন, যা আমার প্রচেষ্টায় লাভ করিনি, বরং মায়ের উদরেই আমাকে প্রদান করা হয়েছে।” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ৬৭, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৭০

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের দ্বারা সে নবুওয়ত লাভ করেনি, বরং আল্লাহ তাকে নবুওয়ত প্রদান করেছেন। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, পূর্বের আয়াত দ্বারা তার নবুওয়তের পক্ষে দলীল প্রদান মিথ্যা প্রমাণিত হল।

উত্তর - ৫

অনুসরণ-অনুকরণের দ্বারা যদি নবুওয়ত লাভ করা যায়, তাহলে বুঝা গেল যে, নিজ প্রচেষ্টা-মেহনত দ্বারা নবুওয়ত লাভ করা যায়। অথচ আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হচ্ছে **اللّٰهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** (আল্লাহই ভাল জানেন কার ওপর তিনি তাঁর রিসালাত অর্পন করবেন।) এ থেকে প্রমাণিত হয় নবুওয়ত খোদা প্রদত্ত বিষয়। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা নবুওয়ত লাভ করা যায়, সে কাফির-অমুসলিম হিসেবে গণ্য হবে।

নবুওয়ত খোদা প্রদত্ত দান

(১) আল্লামা শারানী রহ. ‘আল ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির’ নামক কিতাবে লিখেন, “নবুওয়ত কি চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত হয় না প্রদেয়? এর উত্তর হল নবুওয়ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত নয়। নির্বোধদের ধারণা হল যে, দরবেশী এবং মেহনত-মোজাহাদার দ্বারা এর মর্যাদা লাভ করা যায়। মালেকী মাযহাব মতাবলম্বীরা মহনত-মোজাহাদা দ্বারা নবুওয়ত লাভ করা যায় বলে যারা দাবী করে, তাদের সম্পর্কে কুফরের ফতুয়া প্রদান করেছেন।” -আল ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির খ. ১, পৃ. ১৬৪-১৬৫

(২) কাজী আয়ায শিফা নামক কিতাবে লিখেন:

“যে ব্যক্তি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কিংবা তাঁর অবর্তমানে মেহনত-মোজাহাদার দ্বারা নবুওয়ত লাভের দাবী করে, কিংবা নিজে নবী হবার দাবী করে, অথবা অন্তরের পরিশুদ্ধতার ওপর ভিত্তি করে চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা নবুওয়ত লাভ জায়েয হবার দাবী করে,

অথবা নিজের ওপর ওহী অবতীর্ণের দাবী করে, যদিও নবুওয়তের দাবী না করে, তবে এ জাতীয় লোক রসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা ‘আনা খাতামুননবীয়া’ (আমি সর্বশেষ নবী) কে মিথ্যা সাব্যস্ত করল এবং এদেরকে কাফির বলা হবে।” -শিফা খ. ২, পৃ. ২৪৬, ২৪৭

উল্লিখিত দু’টি সুস্পষ্ট উদ্ধৃতিতে দিবালোকের ন্যায় দ্যাগ্গিমান যে, চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা নবুওয়ত লাভের ধারণায় বিশ্বাসীরা নিজের হৃদয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে মিথ্যাবাদী হবার বিজ লালন করে। এজাতীয় ধারণায় বিশ্বাসীরা মালেকী এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতে মৃত্যুদণ্ড লাভের যোগ্য অপরাধী এবং কাফের-অমুসলিম বলে পরিগণিত হবে।

উত্তর -৬

যদি নবুওয়ত প্রাপ্তির জন্য অনুসরণ-অনুকরণ এবং অনুগত্যতা শর্ত হয়, তবুও মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবী নয়। সে নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেনি। যেমন, (১) মির্যা কাদিয়ানী হজ্জ করেনি। (২) মির্যা হিজরত করেনি। (৩) মির্যা জিহাদ ফিসসাইফ তথা জিহাদ করেনি। বরং উল্টো জিহাদ কে হারাম বলেছে। (৪) মির্যা কখনো পেটে পাথর বাধেনি। (৫) হিন্দুস্তানে যিনা অপরাধে কাউকে পস্তরাঘাত করেনি। (৬) হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়। এ অপরাধে কারো হস্তকর্তন করেনি।

উত্তর -৭

مع (মাআ)-এর বিভিন্ন অর্থ আছে। এর একটি হল সঙ্গে বা সাথে। যেমন, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

(১) ان الله معنا “নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।” -সূরা তাওবা-৪০

(২) ان الله مع المتقين “নিশ্চয় আল্লাহ মোস্তাকিনদের সাথে আছেন।”

-সূরা তাওবা-৩৬

(৩) ان الله مع الذين اتقوا “নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা

তাকওয়া অবলম্বন করে।” -সূরা নাহল -১২৮

(৪) محمد رسول الله والذين معه “মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তার সহচর।” -সূরা ফাতহ-২৯

(৫) ان الله مع الصابرين “নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে।” -সূরা বাকারা ১৫৩

সতর্কবাণী : যদি নবীর সাহচর্য্য-সংশ্রব কিংবা সঙ্গী হবার দ্বারা নবী হওয়া যায়, তবে আল্লাহর সঙ্গী হবার দ্বারাও আল্লাহ হওয়া যাবে। (নাউযবিলাহ)

উত্তর -৮

উক্ত দলীল-প্রমাণ কুরআনের আয়াত হতেই নেয়া হয়েছে। এর কারণ হল যাতে মিথ্যা স্বীয় দলীলের সমর্থনে কোন মুফাস্সির কিংবা মুজাদ্দিদের অভিমত পেশ করতে পারে। এর ব্যত্যয় হলে তার দলীল প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মনগড়া উক্তি বলে গণ্য হবে। কারণ মিথ্যা নিজেই বলেছে,

جو شخص ان (مجددين) کا منکر رہے وہ فاسق میں سے ہے

“যে ব্যক্তি তাদের (মুজাদ্দি)কে অস্বীকার করবে, সে ফাসেক।” -শাহাদাতুল কুরআন পৃ. ৪৮, রুহানী খাযায়েন খ. ৬, পৃ. ৩৪৪

উত্তর -৯

কাদিয়ানীদের বক্তব্য অনুযায়ী যদি আনুগত্য দ্বারা নবুওয়ত ইত্যাদি লাভ করা যায়, তবে আমাদের প্রশ্ন হল, প্রকৃত মর্যাদা না রূপক, যিল্লী না বুরূখী? যদি নবুওয়তের যিল্লী-বুরূখী মর্যাদা লাভ করা যায় যেমন কাদিয়ানীদের বিশ্বাস, তবে সিদ্দীক, শহীদ এবং সালাহুও যিল্লী-বুরূখী হওয়া চাই। অথচ এদের ব্যাপারে কেউ যিল্লী-বুরূখী হবার দাবী করে না। যদি সিদ্দীক ইত্যাদিতে প্রকৃত মর্যাদা লাভ করা যায়, তবে নবুওয়তের বেলাও অনুরূপ বলতে হবে। অথচ শরীয়তধারী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নবী হওয়াতেও কাদিয়ানীরা সমর্থন করে না। তাই বলা যায় এ দলীলও কাদিয়ানীদের দাবী অনুযায়ী নয়।

আয়াত নম্বর তিন

لما يلحقوا بهم واخرين منهم

“আর তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের অন্যান্য লোকদের জন্য ও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।” -সূরা জুমা ৩

কাদিয়ানী সম্প্রদায় আকীদায়ে খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করে। তাই তারা পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটির বিকৃত ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা আয়াতটি খতমে নবুওয়তের অস্বীকারের স্বপক্ষে পেশ করে থাকে। আয়াতটি নিম্নরূপ:

هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقون

“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে রসূল করে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন, আর তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত। অতঃপর তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের অন্যান্য লোকদের জন্যও, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।” -সূরা জুমা- ২-৩

কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাদের দাবীর স্বপক্ষে এ আয়াত দ্বারা এভাবে দলীল পেশ করে থাকে যে, যেভাবে নিরক্ষরদের মাঝে একজন নবী প্রেরিত হয়েছে, তদ্রূপ পরবর্তীদের জন্যও একজন নবী কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করবে। (নাউযুবিল্লাহ)

উত্তর-১

তাফসীর শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব বায়যাবী শরীফে উল্লেখ হয়েছে, ‘আখিরীনা’ শব্দের আতফ (সংযোগ) করা হয়েছে ‘উম্মিয়ীন’ (নিরক্ষর) অথবা ‘ইউআল্লিমু হুম’ (يعلمهم)-এর সর্বনামের সাথে। উক্ত শব্দের দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ব্যাপকতাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা, তাঁর দাওয়াত সাহাবা এবং তাঁদের পরবর্তীতে আগত সকলের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপকভাবে অব্যাহত থাকবে।

উত্তর-২

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইরশাদ করেন,

انا نبى من ادرك ومن يولد بعدى.

“আমার জীবদ্দশায় যারা আমাকে দেখতে পেয়েছে এবং আমার মৃত্যুর পর যারা জন্মগ্রহণ করেছে, আমি সকলের নবী।”-কানযুল উম্মাল খ. ১, পৃ. ৪০৪ হাদীস নম্বর ১৮৮৫, আল-খাসাইসুল কুবরা খ. ২, পৃ. ৮৮

উত্তর-৩

কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা করে। এ নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতিয়মাণ হয় যে, উক্ত আয়াতটি ইব্রাহীম আ.-এর প্রার্থনার উত্তরে অবতীর্ণ হয়। সায্যিদিনা হযরত ইব্রাহীম আ. বায়তুল্লাহর নির্মাণ কজ সমাপ্ত করার পর প্রার্থনা করেছিলেন যে,

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آيتك ويعلمهم الكتب والحكمة
ويزكيهم

“হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে আবৃত্তি করবে, তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে।”-সূরা বাকেরা -১২৯

পূর্বে বর্ণিত আয়াতটি প্রার্থনা কবুল হওয়া প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে উল্লেখ হয়েছে যে, ইব্রাহীম আ.-এর প্রার্থনার ফলাফল হিসেবে সম্মানিত রসূল উম্মিদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। তাই বলে তিনি কেবল উম্মিদের রসূল ছিলেন না। তিনি তাবৎ মানবগোষ্ঠি যারা বর্তমানে বিদ্যমান কিংবা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আগত মানবজাতি সকলেরই নবী। সকলেরই পথ প্রদর্শক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন,

يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا

“বলুন, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রসূল।”-সূরা আরাফ -১৫৮

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, ارسلت الى الخلق كافة “আমি সকল মানবের নিকট প্রেরিত হয়েছি।”

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী হল, নবী প্রেরণ দু'বার হবে। একবার মক্কায়, দ্বিতীয়বার কাদিয়ানে। কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে সব দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে তার সবই মিথ্যা। ধোঁকা, প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। আয়াতের আলোকে নবী প্রেরণ একবারই হয়েছিল। তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আগত তাবৎ মানবগোষ্ঠীর জন্য নবী। কোন বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ সম্প্রদায় কিংবা বিশেষ সময়ের নবী নন।

উত্তর-৪

আয়াতের শব্দ 'রসূল'-এর সাথে 'আতফ' (সংযুক্ত) শুদ্ধ নয়। কেননা, যে নীতিমালা মাতুফ আলাইর (যার সাথে সংযুক্ত করা হয়) বেলায় প্রাধান্য দেয়া হয়, তা মাতুফের (যাকে সংযুক্ত করা হয়) বেলায় লক্ষ্য করা জরুরী। رسول হল মাতুফ আলাই। رسول-এর পূর্বে فی الاميين এসেছে, যার সম্পর্ক হল মাতুফ আলাইর সাথে। আর যদি আমরা اخرين-এর আতফ رسول-এর ওপর করি, তখন জরুরী হল فی الاميين-এর সম্পর্ক اخرين-এর সাথে হওয়া। এমতাবস্থায় অর্থ হবে অপর এক রসূল প্রেরিত হবে উম্মিদের নিকট। যা সম্পূর্ণরূপে ভুল। অথচ এখানে উম্মি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরববাসী। যেমন, তাফসীরে বায়যাবীতে উল্লেখ হয়েছে,

فی الاميين ای فی العرب لان اکثرهم لا یکتبون ولا یقرون

“উম্মিয়ীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল আরববাসী। কেননা, তাদের অধিকাংশই লেখাপড়া জানত না।” আয়াতের অপর শব্দ منهم দ্বারাও উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘আরববাসী হতে’। আর মির্য়া কাদিয়ানী আরবের নয়, সে অনারব। তাই বলতে হয় কাদিয়ানীদের মিথ্যা, প্রবঞ্চণা, ধোঁকা, প্রতারণা ছাড়া আর কি আছে? তারা যে সব দলীল-প্রমাণ পেশ করে থাকে তার সবই হচ্ছে মিথ্যা এবং প্রবঞ্চণা।

উত্তর-৫

পবিত্র কুরআনের আয়াতে بعث (বাআসা) শব্দ নেয়া হয়েছে। এটি অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়পদ। এখন যদি رسول-এর ওপর আতফ করা হয়, তবে بعث দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদের অর্থ

নিতে হবে। আর একই সময়ে অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদের অর্থ নেয়া আরবী ব্যাকরণ মতে নিষিদ্ধ। এটি অসম্ভবও বটে।

উত্তর-৬

এখন দেখুন! মুফাস্সীরগণ (যারা কাদিয়ানীর পূর্বে গত হয়ে গিয়েছেন) এ আয়াতের কি ব্যাখ্যা করেছেন।

(১) মুফাস্সীরগণ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আজমী অর্থাৎ অনারব জাতি। এটি হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত।

হযরত মাকাতিল বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাবই। সব অভিমতের নির্যাস হল, উম্মি দ্বারা উদ্দেশ্য আরবজাতি। আর اخرين দ্বারা উদ্দেশ্য হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কিয়ামত পর্যন্ত যারা ইসলামে প্রবেশ করবে। -তাফসীরে কবীর খ. ৩০, পৃ. ৪, ছাপা মিসর

(২) 'আখরীন' দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ সমস্ত লোক যারা সাহাবাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আসবে। -তাফসীর আবু সউদ খ. ৪, পৃ. ২৪৭

(৩) 'আখরীন' দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে। -কাশশাফ খ. ৪, পৃ. ৫৩০

উত্তর-৭

বুখারী শরীফ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৭২৭, মুসলিম শরীফ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১২, তিরমিযী শরীফ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩২, মেশকাত শরীফ ৫৭৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উল্লেখ হয়েছে:

عن ابى هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت سورة الجمعة واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يرأجعه حتى سال ثلثاوفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عندالثرثيالناله رجال اورجل من هولاء.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর নিকট যখন সূরা

জুমআ এবং **واخرين منهم لما يلحقوا بهم** অবতীর্ণ হয়, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! এরা কারা? তিনি নিরব রইলেন। আমি তিনবার জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হযরত সালমান ফারসীর ওপর হাত রেখে বললেন, যদি ঈমান সুরাইয়া তারকার নিকটও হত, তবুও এরা (পারস্যবাসী) তা পেত। বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয় ‘রিজাল’ না ‘রজুল’ বলেছেন।”

অর্থাৎ আজম এবং পারস্যের বহু সংখ্যক লোকের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী করা হবে। ইসলাম এবং মুসলমানকে সাহায্য করা হবে। আজম এবং পারস্যবাসীদের মধ্য হতে বড় বড় মুহাদিস, উলামা, মাশাইখ, মুফাস্সির, ফুকাহা, মুজাদ্দিদ, সুফী, আওলিয়ায়ে কেরাম তৈরী হবেন। তারা ব্যাপকভিত্তিক ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দিবেন। **واخرين منهم لما يلحقوا بهم** দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে নিয়ে হযরত আবু হানিফা রহ. পর্যন্ত সকলেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের ভিক্ষুক ছিলেন। উপস্থিত, অনুপস্থিত, উম্মি সকলের জন্য তাঁর দ্বার অবারিত ছিল। যার যা ইচ্ছা সে আহরণ করে নিতে পারত। এ হাদীসই বলে দিচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত অত্যন্ত ব্যাপক, পরিপূর্ণ এবং যথেষ্ট ছিল। বর্তমান, ভবিষ্যতে আগত, আরব, অনারব সকলের জন্য তিনি আদর্শ শিক্ষক এবং আত্মার পরিশুদ্ধকারী ছিলেন। সুধীপাঠক! উক্ত আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের ব্যাপকতার কথাই বলা হয়েছে। নতুন কোন নবীর সুসংবাদ দেয়া হয়নি। আর নতুন নবীর আসার ধারণা পোষণ করার অর্থই হচ্ছে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাওয়া।

আয়াত নম্বর চার

وبالآخرة هم يوقنون “আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।” -সূরা বাকেরা-৪

কাদিয়ানী সম্প্রদায় নবুওয়তের ধারা অব্যাহত থাকার স্বপক্ষে উক্ত আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। এ আয়াতের অর্থ তারা এরূপ করে “পূর্ববর্তী ওহীর প্রতি বিশ্বাস রাখে।”

উত্তর -১

উক্ত আয়াতে ‘আখিরাত’ বলতে কিয়ামতকে বুঝিয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলেছেন:

(১) *وان الدار الآخرة لهي الحياة* “বস্তুত পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। -সূরা আনকাবুত-৬৪

(২) *خسر الدنيا والآخرة* “দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাই হারিয়ে বসে।” -সূরা হজ্ব-১১

(৩) *ولا اجر الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون* “এবং আখিরাতের প্রতিদান তো শ্রেষ্ঠ। হায়! যদি তারা জানত। -সূরা নাহল-৪১

পবিত্র কুরআনে ‘আখিরাত’ শব্দটি পঞ্চাশেরও অধিক ব্যবহার হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই ‘আখিরাত’ শব্দ দ্বারা প্রতিদান এবং শাস্তিদিবস উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আখিরাত’ বলতে পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব এবং মিয়ান উদ্দেশ্য। -তাকসীরে ইবনে জারীর খ. ১, পৃ. ১০৬, আদুররুন্নাযিমুর খ. ১, পৃ. ২৭

মোটকথা, পবিত্র কুরআনের যেখানেই ‘আখিরাত’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে, সেখানেই এর উদ্দেশ্য হল কিয়ামত দিবস, পিছনের দিনগুলো নয়।

উত্তর -২

মির্য়া কাদিয়ানী বলে, “নাযাত প্রত্যশি ঐ ব্যক্তি যে, খাতামুলবীয়ায়ীন শেষ যমানার পয়গম্বরের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, এর প্রতি ঈমান আনে। *وبالآخرة هم يوقنون* এবং নাযাত প্রত্যশি ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, প্রতিদান এবং শাস্তিকে মানে।” -আলহুকুম খ. ৮, নম্বর ৩৪-৩৫, ১০ অক্টোবর ১৯০৪, দেখুন খাযিনাতুল ইরফান খ. ১, পৃ. ৭৮, মির্য়া কাদিয়ানী কর্তৃক রচিত।

এমনিভাবে দেখুন আলহুকুম সংখ্যা ২, খ. ১০, ২৭ জানুয়ারী ১৯০৬ইং পৃ. ৫, কলাম নম্বর ২, এতে মির্য়া কাদিয়ানী লিখে *وبالآخرة هم*

يوقنون এর অর্থ হল ‘আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে।’ এরপর লিখে ‘কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখি।’ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর খলিফা হাকীম নূরুদ্দীন এ আয়াতের তাফসীরে লিখে ‘কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে।’ -যমীমায়ে বদর খ. ৮, নম্বর ১-৫, পৃ. ৩, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯

সূরী পাঠক! وبالآخرة هم يوقنون এর অর্থ ‘শেষ ওহী’ করা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করা। এমন কি মির্যা কাদিয়ানী এবং হাকীম নূরুদ্দীনের ব্যাখ্যারও বিপরিত ব্যাখ্যা করা।

উত্তর -৩

কাদিয়ানী সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা হতে অজ্ঞ। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেও জাহেল ছিল। সেও পুলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং একবচন, বহুবচনের মাঝে কোন পার্থক্য করত না। এ আয়াতের বেলায় করেনি। আয়াতে উল্লিখিত আখিরাত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। পক্ষান্তরে ওহী শব্দটি হচ্ছে পুলিঙ্গ। পুলিঙ্গের সিফাত (বিশেষণ) কিভাবে স্ত্রীলিঙ্গ হবে? পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন ان الدار الآخرة لهي الحياة এখানে আখিরাত স্ত্রীলিঙ্গ। তাই এর সর্বনামও স্ত্রীলিঙ্গে ‘হিয়া’ নেয়া হয়েছে। ওহী শব্দটি যেহেতু পুলিঙ্গ তাই এর বিশেষণও পুলিঙ্গ হওয়া চাই। এরপরও কি কেউ বলবেন, আখিরাত দ্বারা ওহী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

আয়াত নম্বর পাঁচ

“و جعلنا في ذريته النبوة او لكتب
রাখলাম নবুওয়ত ও কিতাব।” -সূরা আনকাবুত-২৭

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত ইব্রাহীমের সন্তান বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত নবুওয়ত অব্যাহত থাকবে।

উত্তর -১

উক্ত আয়াতে নবুওয়ত এবং কিতাবের কথা বলা হয়েছে। নবুওয়ত অব্যাহত থাকলে কিতাব অবতীর্ণও অব্যাহত থাকতে হবে। কিতাবও অবতীর্ণ হতে হবে। অথচ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতেও কিতাব আর

অবতীর্ণ হবে না। আমাদের বক্তব্য হল, যে দলীল কিতাব অবতীর্ণ হবার পথে প্রতিবন্ধক, সেটিই নবুওয়তের ধারা অব্যাহতের প্রতিবন্ধক।

উত্তর -২

جلعنا (জাআলনা)-এর ফায়েল (কর্তা) হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এ থেকে প্রমাণিত হয় নবুওয়ত প্রদেয় বিষয়। অথচ কাদিয়ানীরা দাবী করে মেহনত-মোজাহাদা, পরিশ্রম, চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে নবুওয়ত লাভ করা যায়। তারা বলে অনুসরণের মাধ্যমে নবী হওয়া যায়।

মোটকথা, কাদিয়ানীরা বিভিন্ন সময়ে স্ববিরোধী দলীল পেশ করে থাকে। যা তাদের মিথ্যা হবারই প্রমাণবহন করে।

হাদীস সম্পর্কে কাদিয়ানীদের আপত্তির উত্তর

(১) ولو عاش ابراهيم

কাদিয়ানীরা বলে থাকে لو عاش (ابراهيم) لكان صديقاً نبياً (যদি (ইব্রাহীম) জীবিত থাকত, তাহলে নবী হত)। এ হাদীস দ্বারা কাদিয়ানী সম্প্রদায় প্রমাণ পেশ করে থাকে যে, যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হযরত ইব্রাহীম জীবিত থাকতেন, তাহলে নবী হতেন। মৃত্যুর কারণে তিনি নবী হতে পারেননি। মৃত্যুই তার নবী হবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যু না হলে তার নবী হবার সম্ভাবনা ছিল।

উত্তর -১

কাদিয়ানী সম্প্রদায় দলীল হিসেবে এ হাদীসটি পেশ করে। হাদীসটি ইবনে মাজায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্রের জানাযা এবং মৃত্যুর আলোচনা অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عن ابن عباس لما مات ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقاً نبياً ولو عاش لعقت اخوا له القبط وما استرق قبطي.

“হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবযাদা ইব্রাহীমের ইন্তিকাল হলে তিনি

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-১০০

জানাযার নামায পড়ান এবং বলেন, তাকে দুধ পানকারিনী জান্নাতে যাবে। যদি ইব্রাহীম জীবিত থাকত, তবে নবী হত। যদি সে জীবিত থাকত, তার কিবতী মামাকে আযাদ করে দেয়া হত। কোন কিবতী বন্দী হত না।”
-ইবনে মাজাহ -১০৮

(১) উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দেরী রহ. ‘ইনজাহুল হাজাত আলা ইবনে মাজাহ’-এ লিখেন

“এ হাদীসের বিশুদ্ধতায় কোন কোন মুহাদ্দিস আপত্তি করেছেন। যেমন সাযিযদ জামালউদ্দীন মুহাদ্দিস ‘রওয়াতুল আহবাবে’ আলোচনা করেছেন।” -ইনজাহ ১০৮

(২) আল মওয়াতুল কুবরার ৫৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে,

“ইমাম নভবী তাহযীবুল আসমা ওয়ান লোগাতে বলেছেন, উক্ত হাদীস বাতেল। গায়েবের বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত এবং অবাধিত মন্তব্য।”

(৩) মাদায়িঞ্জুনবুওয়তের ২য় খন্ডে ২৬৭ পৃষ্ঠায় শাইখ আব্দুল হক দেহলভী রহ. বলেন, উক্ত হাদীস বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছেনি। এর কোন গ্রহণযোগ্যতাই নেই। এর সনদে আবু শাইবা ইব্রাহীম ইবনে উসমান নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। আর তিনি হলেন দুর্বল।

(৪) হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হযরত ইমাম ইয়াহইয়া রহ. এবং হযরত ইমাম দাউদ রহ.-এর মতে আবু শাইবা ইব্রাহীম ইবনে উসমান বিশ্বস্ত নন।

হযরত ইমাম তিরমিযী রহ.-এর মতে মুনকিরুল হাদীস। (মুনকিরুল হাদীস বলা হয়, যে, হাদীসের সনদে এমন কোন বর্ণনাকারী থাকে যার মাঝে অশ্লীলতা অথবা অধিক অলসতার দোষ থাকে। অথবা যার মাঝে কুফরী নয়, কিন্তু কথা এবং কর্মে ফিসক প্রকাশ পায়।)

হযরত ইমাম নাসাই রহ.-এর মতে মতরুকুল হাদীস। (যে হাদীসের সনদে মিথ্যার দোষে দুইট কোন বর্ণনাকারী থাকে তাকে মতরুকুল হাদীস বলে।)

হযরত ইমাম জাওয়ানী রহ.-এর মতে তার কোন গ্রহণযোগ্যতাই নেই।

হযরত ইমাম আবু হাতিম রহ.-এর মতে যইফুল হাদীস। (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল)

ইব্রাহীম ইবনে উসমান দুর্বল বর্ণনাকারী। তার থেকে হাদীস না লেখা উচিত। কেননা, সে হাকাম ইবনে উতাইবা থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আর উক্ত হাদীস আবু শাইবা ও হাকাম ইবনে উতাইবা থেকে বর্ণনা করেছে। -তাহযীবুত্তাহযীব খ. ১, পৃ. ৯৪-৯৫

সূধী পাঠক! শাইবার ন্যায় বর্ণনাকারী সম্পর্কে উম্মতের মনীষীবৃন্দের অভিমত পাঠ করলেন। তার দুর্বল বর্ণনাকে পুঁজি করে কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিজের মিথ্যা আকীদার দলীল বানায়। অথচ তাদের একথা জানা উচিত যে, কোন আকীদার প্রমাণের জন্য ‘খবরে ওয়াহেদ’ (যদিও বিশুদ্ধ হয় না কেন) গ্রহণযোগ্য নয়। (খবরে ওয়াহেদ হল প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) আর দুর্বল বর্ণনার ক্ষেত্রেতো কোন কথাই নেই।

উত্তর -২

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের জ্ঞানের দেউলিয়াপনার প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবনে মাজার লেখক বর্ণিত বর্ণনার পূর্বে একটি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা কি সেই বিশুদ্ধ হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করেনি? ইমাম বুখারী রহ.ও সহীহ বুখারীতে উক্ত বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা কাদিয়ানীদের অবস্থানের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে প্রমাণ বহন করে। হায় আফসুস! কাদিয়ানী সম্প্রদায় যদি দুর্বল বর্ণনার পূর্বে বিশুদ্ধ বর্ণনাটি পাঠ করত। হাদীসটি নিম্নরূপ:

قال قلت لعبدالله ابن ابي اوفى رايت ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات وهو صغير ولو قضى ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبى لعاش ابنه ابراهيم ولكن لا بنى بعده.

“ইসমাইল বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইব্রাহীমকে দেখে ছিলেন? আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা রাযি. বললেন, ইব্রাহীম ছোট অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কেউ যদি নবী হত, তবে তাঁর পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকতেন। কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী নেই।” -ইবনে মাজাহ পৃ. ১০৮

এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। তাই ইবনে মাজাতে এ সংক্রান্ত অধ্যায়ে সর্ব প্রথম এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়। বুখারী শরীফে ইমাম বুখারীও উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন।

সূধী পাঠক! গভীরভাবে চিন্তা করুন। ইবনে মাজার সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের যে বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম বুখারী রহ.ও বুখারী শরীফে ঐ বিশুদ্ধ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্বীয় শাহাদাতুল কুরআন পৃষ্ঠা ৪১, রুহানী খাযায়েন খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৩৭ তে “বুখারী শরীফকে আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব” বলে স্বীকৃতিও দিয়েছে। যদি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের নিকট সামান্যতম দিয়ানতদারী থাকত, তাহলে বুখারী শরীফের বিশুদ্ধ হাদীসকে বাদ দিয়ে একটি দুর্বল এবং মুনকারুল হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করত না। আসল কথা হল দিয়ানতদারী এবং কাদিয়ানী মতবাদ দু’টি একটি অপরটির বিপরিত।

মুসনাদে আহমদের ৪নং খন্ডে ৩৫৩ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা রাযি. হতে আরো একটি বর্ণনা পেশ করা হল:

حدثنا ابن ابى خالد قال سمعت ابن ابى اوفى يقول لو كان بعد النبى صلى الله عليه وسلم نبى مامات ابنه ابراهيم.

“ইবনে আবী খালেদ বলেন, আমি ইবনে আবী আউফা রাযি.কে বলতে শুনেছি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কেউ যদি নবী হতেন, তাহলে তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু হত না।”

“হযরত আনাস রাযি.-এর নিকট সুন্দী জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুর সময় হযরত ইব্রাহীমের বয়স কত হয়েছিল? তিনি বলেন,

قد ملاء المهد ولو بقى لكان نبيا ولكن لم يكن لبقى لان نبىكم اخر الانبياء.

“সে দোলনা কে ভরে দিত। (অর্থাৎ শিশু অবস্থায় মারা যায়। কিন্তু রিষ্টপুষ্ট থাকার কারণে দোলনায় পরিপূর্ণ নয়র আসত) তিনি জীবিত থাকলে নবী হতেন। তোমাদের নবী যেহেতু সর্বশেষ নবী তাই তিনি মারা যান।” (তালখিসুত্তারিখ আল কবীর লি ইবনে আসাকির

খ.১,পৃ.৪৯৪,ফতহুল বারী খ.১০,পৃ.৪৭৭) বুখারী শরীফ, মসনদে আহমদ, ইবনে মাজার বিশুদ্ধ হাদীসকে বাদ দিয়ে একটি দুর্বল হাদীসকে যারা দলীল হিসেবে পেশ করে, তারা যে মিথ্যুক, ভণ্ড, অভিশপ্ত এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতই প্রযোজ্য *حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ* দিয়েছেন আল্লাহ তাদের অন্তরের ওপর এবং তাদের কানের ওপর, তাদের চোখের ওপর রয়েছে পর্দা।” -সূরা বাকেরা-৭

উত্তর-৩

উক্ত হাদীসে ‘لو’ (লাও) শব্দটিও লক্ষ্যণীয়। ‘লাও’ আরবী ভাষায় অসম্ভব বিষয়েও ব্যবহার হয়। যেমন *لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا* “যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য মাবুদ থাকত, তাহলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হত।” এখানেও ‘লাও’ শব্দটি অসম্ভব বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। বর্ণিত হাদীসেও ‘লাও’ অসম্ভব বিষয়ে ব্যবহার হয়েছে। আর এ জাতীয় বর্ণনাকে দলীল হিসেবে পেশ করা তাদের জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু তাও অনুমেয় হয়।

(২) “তোমরা বল না তার পরে নবী নেই।” *ولا تقولوا لا نبى بعده*

কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত আইশা রাযি.-এর একটি হাদীস-*قولوا خاتم* “তোমরা বল খাতামুল আম্মিয়া। তার পরে কোন নবী নেই একথা বল না।” -তাকমিলা মাজমাউল বুখারী খ. ৫, পৃ. ৫০২, দুররে মনসুর খ. ৫, পৃ. ২০৪ এহাদীস দ্বারা কাদিয়ানী সম্প্রদায় নবুওয়তের ধারা অব্যাহতের পক্ষে দলীল দিয়ে থাকে।

উত্তর-১

হযরত আইশা সিদ্দীকা রাযি.-এর সাথে বর্ণিত উক্তির সম্পর্ক করা স্পষ্টত: বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয়। কোন কিতাবেই এটি ‘মুত্তাসিল’ সনদ দ্বারা উল্লেখ করা হয়নি। (যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতায় ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে। কোন স্তরেই কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে) একটি ‘মুনকাতিউস্ সনদ’

উক্তির দ্বারা ‘কুরআন মজীদ’ এবং ‘মুতাওয়াতির’ হাদীসের বিপরিত দলীল পেশ করা ধোঁকা, প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। (যে হাদীসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝের কোন একস্তরে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস বলে। মুতাওয়াতির হল, যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন, যাদের ওপর মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব।)

উত্তর-২

রহমতে দু’আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, خاتم النبيين لا نبى بعدى “আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে কোন নবী নেই।” আর হযরত আইশা রাযি. বলেছেন, ‘তোমরা বল না এর পরে নবী নেই।’ এটি সুস্পষ্টত: রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। নবীর বাণী এবং সাহাবার বাণীর মাঝে যখন সংঘর্ষ দেখা দেয়, তখন নবীর বাণীকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়াও ‘লা নাবীয়া বাদী’ হাদীসটি বহু বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়ে আসছে। আর হযরত আইশা রাযি.-এর বাণী এর বিপরিত। অতএব, তার উক্তি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। দলীল-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উত্তর -৩

কানযুল উম্মালের ১৫নং খন্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠায় ৪১৪২৩ নং হাদীসে হযরত আইশা রাযি. হতে বর্ণিত, لم يبق من النبوة بعده شئ الا مبشرات “সুসংবাদ (স্বপ্ন) ব্যতীত নবুওয়তের কোন অংশ অবশিষ্ট নেই।” হযরত আইশা রাযি. হতে এরূপ সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হবার পরও কি ঐ বর্ণনার সম্পর্ক হযরত আইশা রাযি.-এর সাথে করা বৈধ হবে?

উত্তর -৪

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতারণার প্রতি লক্ষ্য করুন। ‘মাজমাউল বিহার’ নামক গ্রন্থের যে উক্তি সূত্রহীন বর্ণিত হয়েছে, তা তারা অসম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করেছে। তাতে আছে هذا ناظر الى نزول عيسى عليه السلام -তাকমিলায়ে মাজমাউল বিহার খ. ৫, পৃ. ৫০২

অনুরূপভাবে হযরত মুগিরা রাযি.-এর উক্তিসহ অন্যান্য উক্তি যেগুলো কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিজেদের দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে, মূলত তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত ঈসা আ.-এর অবতীর্ণ হবার ঘোষণা দেয়া। একথা বল না যে, তার পরে কোন নবী আসবে না। কেননা, হযরত ঈসা আ. অবতীর্ণ হবেন। বরং একথা বল যে, তিনি “খাতামুলনবীয়ীন” অর্থাৎ তাঁর পরে কাউকে নবী করা হবেনা। আর হযরত ঈসা আ. তো তাঁর পূর্বের নবী।

উত্তর - ৫

بعده - لا تقولوا لاني بعدہ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী খবর (বিধেয়) হয়েছে। তাই এ দ্বারা কয়েকটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথম অর্থ لاني بعدہ অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কেউ নবুওয়ত পাবে না। মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মেরকাতে এ অর্থ নেয়া হয়েছে এবং যা বিস্তুদ্ধও বটে।

দ্বিতীয় অর্থঃ لاني خارج بعدہ অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন নবী প্রকাশ পাবে না। আর এটি সঠিক অর্থ নয়। কেননা, হযরত ঈসা আ. অভিভূত হবেন। এর প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত মুগিরা রাযি. لا تقولوا لاني بعدہ বলতে নিষেধ করেছেন। আর এটিই হচ্ছে আমাদের আকীদা।

তৃতীয় অর্থঃ لاني حي بعدہ অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী জীবিত নেই। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই হযরত আইশা রাযি. বলেছেন, لا تقولوا لاني بعدہ। তাইতো হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের কথা তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কাদিয়ানীদের প্রশ্ন

হযরত আইশার রাযি.-এর সনদ হতে বর্ণিত হয়নি তাতে কি হয়েছে? এসনদ কি ‘তালিকাতে ইমাম বুখারীতে’ পাওয়া যায় না?

উত্তর

এটিও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের একটি ধোঁকা। ‘ফতহুল বারীর’ লেখক হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. একটি কিতাব রচনা

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়াত-১০৬

করেছেন। যার নাম হল ‘তালিকুত্তালিক’। এতে তালিকাতে ইমাম বুখারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় হাদীস

مسجدى آخر المساجد “আমার মসজিদ হল সর্বশেষ মসজিদ”।

কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার মসজিদ হল সর্বশেষ মসজিদ”। প্রকাশ থাকে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের পর দুনিয়াতে প্রতি দিন নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর পরেও নবী আগমন করতে পারে।

উত্তর

এ ধরনের প্রশ্ন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতারণা, ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, যেখানে “মাসজিদি আখিরুল মাসাজিদ” বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে আশ্বিয়া শব্দটিও বর্ণিত হয়েছে। সকল নবীদের নিয়ম হল, তারা আল্লাহর গৃহ (মসজিদ) নির্মাণ করে থাকেন। আশ্বিয়া কর্তৃক নির্মিত সর্বশেষ মসজিদ হল মসজিদে নববী। এটিও বরং খতমে নবুওয়তের প্রমাণ বহন করে। নবুওয়তের ধারা অব্যাহত থাকার পক্ষের দলীল নয়। “তারগিবুত্তারগিবের ২য় খণ্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠায় ১৭৭১নং হাদীসে সুম্পষ্টভাবে خاتم مسجد الانبياء বর্ণিত হয়েছে। কানযুল উম্মাল ১২তম খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠায় ৩৪৯৯নং হাদীসে باب فضل الحرمين এ হযরত আইশা রাযি. قال رسول الله ﷺ انا خاتم الانبياء ومسجدى خاتم مساجد الانبياء হতে বর্ণিত হয়েছে। “রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদ আশ্বিয়াদের সর্বশেষ মসজিদ।”

চতুর্থ হাদীস

انك خاتم المهاجرين “নিশ্চয় তুমি সর্বশেষ মহাজির।”

কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা হযরত আব্বাস রাযি.কে বলেছেন,

اطمئن يا عم (عباس) فانك خاتم المهاجرين في السهرة كانا خاتم النبیین فی النبوة.

“হে চাচা! আপনি নিঃশঙ্কিত হোন। আপনি হলেন হিজরতের নির্দেশের ব্যাপারে সর্বশেষ মুহাজির। আর আমি হলাম নবুওয়তের মাঝে সর্বশেষ নবী।” —কানযুল উম্মাল খ. ১২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস নং ৩৩৩৮৭। যদি হযরত আব্বাসের পরে হিজরতের ধারা অব্যাহত থাকে, তবে নবুওয়তের ধারাও অব্যাহত থাকবে।

উত্তর

এখানেও কাদিয়ানী সম্প্রদায় প্রতারণার আশ্রয় নেয়। মূল ঘটনা হল, হযরত আব্বাস রাযি. মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার উদ্দেশে রওনা হন। কয়েক মাইল অতিক্রম করেছেন। এদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা বিজয় করার উদ্দেশে মদীনা থেকে বের হয়ে আসেন। পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। আব্বাস রাযি. আফসোস করে বললেন, আমি হিজরতের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হলাম। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাযি. কে সান্ত্বনা এবং সোয়াব লাভের সুসংবাদ দিয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। বাস্তব পক্ষে হযরত আব্বাস রাযি. ছিলেন মক্কা থেকে সর্বশেষ হিজরতকারী। কেননা, হিজরত তো দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে করা হয়। মক্কা মোকাররমা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জয় করেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত দারুল ইসলাম হিসেবে থাকবে। তাই মক্কা বিজয়ের পূর্বে সর্বশেষ হিজরতকারী হলেন হযরত আব্বাস রাযি.। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে চাচা! আপনি সর্বশেষ মুহাজির। আপনার পরে যে ব্যক্তি মক্কা ত্যাগ করবে, তাকে মুহাজির বলা হবে না। তাই তো ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই। —বুখারী খ. ১, পৃ. ৪৩৩

হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বয়রুত থেকে ছাপা আসাবার ২য় খণ্ডের ২৭১নং পৃষ্ঠায় বলেন, هاجر قبل الفتح بقليل وشهد
অর্থাৎ হযরত আব্বাস রাযি. মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে হিজরত করেন এবং তিনি মক্কা জয়ে অংশগ্রহণ করেন।

পঞ্চম হাদীস

“আবু বকর সর্বোত্তম মানুষ।” ابو بكر خير الناس

কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে ابو بكر خير الناس الا ان يكون نبى “আবু বকর সকল মানুষের মাঝে উত্তম। কিন্তু নবী ব্যতীত।” এ থেকে বুঝা যায় নবুওয়ত এখনো অব্যাহত আছে।

উত্তর -১

এটি কানযুল উম্মালের ১১নং খণ্ডের ৫৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। হাদীস নম্বর হল ৩২৫৪৭। এর পূর্বে লেখা হয়েছে هذا الحديث احمد ما انكر “যে সব বর্ণনা মুনকার সাব্যস্ত করা হয়েছে, এটি তার একটি।” এজাতীয় মুনকার রেওয়াত দ্বারা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দলীল দেয়া সঠিক নয়। এটিও কাদিয়ানীদের প্রতারণা, ধোঁকা। (মুনকার হল, যে হাদীসের সনদে এমন কোন বর্ণনাকারী থাকে যার মাঝে অশ্লীলতা অথবা অধিক অলসতার দোষ থাকে। অথবা যার মাঝে কুফরী নয় কিন্তু কথা এবং কর্মে ফিসক প্রকাশ পায়।)

উত্তর -২

কানযুল উম্মালের ১১নং খণ্ডের ৫৪৬ পৃষ্ঠায় ৩২৫৬৪নং হাদীসে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত,

ما اصحب النبي والمرسلين ولاحب يسن افضل من ابو بكر.

“রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য নবী রসূলগণের সাহাবাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হযরত আবু বকর রাযি.।”

কানযুল উম্মালের ১১নং খণ্ডের ৫৬০নং পৃষ্ঠায় ৩২৬৪৫নং হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণনা করেন,

ابو بكر وعمر خير الاولين وخير الاخيرين وخير اهل السموات وخير اهل الارضين.

“আসমান এবং যমিনের অধিবাসীদের মধ্যে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের মাঝে হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রাযি. সর্বোত্তম।”

বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, আশ্বিয়ায়ে কেরামের পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর রাযি। কাদিয়ানী সম্প্রদায় ওপরের হাদীস দ্বারা যে প্রবঞ্চণার আশ্রয় নিয়েছিল, তাও ধোপে টিকল না।

প্রশ্ন নম্বর আট

(ক) লাহোরী এবং কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য কি?

(খ) লাহোরী সম্প্রদায় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী মানে না, তারপরও তারা কেন কাফের?

(গ) উভয় সম্প্রদায়ের মতবিরোধগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন।

উত্তর

মূলতঃ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীদের দু'টি গ্রুপ রয়েছে। একটি হলো লাহোরী, অপরটি কাদিয়ানী। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং নুরুদ্দীনের জীবদ্দশা পর্যন্ত তারা এক দলভুক্ত ছিল। ১৯১৪ সালের মার্চে নুরুদ্দীন মারা যায়। তার মৃত্যুর পর লাহোরী গ্রুপের প্রধান মুহাম্মদ আলী এমএ এবং তার সাথীদের ধারণা ছিল নুরুদ্দীনের স্থলে মুহাম্মদ আলী আমির হবে। কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পরিবারের লোকেরা এবং মুরীদরা মির্যা মাহমুদকে তথাকথিত খেলাফতের দায়িত্ব প্রদান করে। এতে মুহাম্মদ আলী রাগে-গোসসায় লাহোরে চলে আসে। তখন থেকেই কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মাঝে দু'টি গ্রুপের সৃষ্টি হয়। একটি লাহোরী, অপরটি কাদিয়ানী। এটা সুস্পষ্ট যে, দু'গ্রুপ সৃষ্টির মূল কারণ হল ক্ষমতার লড়াই। নেতৃত্বের লড়াই। আকীদা-বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং নুরুদ্দীনের জীবদ্দশা পর্যন্ত সকলেই অভিন্ন আকীদার ওপর সুদৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ ছিল। এমন কি লাহোরী গ্রুপ মির্যা কাদিয়ানীর সকল দাবীকে সত্য বলে বিশ্বাস করত। ইমাম, আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট, মুজাদ্দিদ, মাহদী, মসীহ, যিল্হী, বুরুযী নবী ইত্যাদি মির্যার কুফরী দাবীকে লাহোরী সম্প্রদায় নিজেদের ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ মনে করত। কাদিয়ানী সম্প্রদায় লাহোরীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় যে, তারা নেতৃত্ব না পাবার কারণে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এদিকে লাহোরী গ্রুপ নিজেদের রক্ষা করার জন্য নেতৃত্বের লড়াইকে আকীদার বিরোধের

পোষাক পরিধাণ করায়। তারা দাবী করে আমাদের সাথে কাদিয়ানীদের তিনটি বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

এক. কাদিয়ানী সম্প্রদায় মির্যাকে অস্বীকারকারীদের কাফের মনে করে। আমরা তাদেরকে কাফের মনে করি না।

দুই. কাদিয়ানী সম্প্রদায় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে পবিত্র কুরআনের আয়াত *مبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه احمد* (এক রসূলের সুসংবাদ যে আমার পরে আগমন করবে, তার নাম হবে আহমদ) উদ্দেশ্য মনে করে। আমরা তা মনে করি না।

তিন. কাদিয়ানী সম্প্রদায় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে প্রকৃত নবী মনে করে। আমরা তা মনে করি না। এক পর্যায়ে তাদের উভয় গ্রুপের মাঝে বিতর্ক হয়। “মুবাহাসায়ে রাওয়ালপিন্ডি” নামক গ্রন্থে এ বিতর্কের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। উভয় গ্রুপ মির্যা কাদিয়ানীর গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি পেশ করে। তাদের এ বিতর্ক মির্যার মিথ্যা হবার প্রমাণ বহন করে। মির্যার দাবীগুলো শয়তানী জালের ন্যায় এমন পেঁচান ছিল যে, মির্যার অনুসারীরাও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি তার দাবীগুলো কি ছিল। কিন্তু নেতৃত্ব এবং ব্যক্তি স্বার্থের লড়াই তার অনুসারীদের দু’দলে বিভক্ত করে দেয়। এক দলের প্রধান ছিল মির্যা মাহমুদ, অপর দলের প্রধান মুহাম্মদ আলী লাহোরী। মির্যা মাহমুদ যুবক ছিল। ক্ষমতা এবং অর্থ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। সে সীমালঙ্ঘন করায় কিছু অনুসারী তওবা করে। মির্যা মাহমুদের বিপদগামিতা, তার বিলাসবহুল জীবন-যাপনের কথা যখন কাদিয়ানের সীমানা পেড়িয়ে লাহোরে পৌঁছে, তখন লাহোরী গ্রুপ “তারিখে মাহমুদিয়ত, রবওয়া কা পোপ, রবওয়া কা মাযহাবী আমির, কামালাতে মাহমুদিয়া” গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে মির্যা মাহমুদের অপকৃতিগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেয়। মির্যা মাহমুদ নকতশূন্য বর্ণমালা দ্বারা কবিতা রচনার মাধ্যমে এর উত্তর দেয়। নিম্নের উদ্ধৃতি পাঠ করুন।

“ফারুক” কাদিয়ানীর খলিফার এক বিশেষ মুরিদের পত্রিকা। জনাব খলিফা সাহেব কয়েকবার তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে এর ব্যাপক প্রচারের প্রচেষ্টা চালায়। বাজারী লেখা ছাপা এবং গালি দেবার জন্য কাদিয়ানী প্রেসে এ পত্রিকার উচু মর্যাদা ছিল। লাহোরী জমায়াতের

মুরব্বীদের মন্দ বলা এ পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৩৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত পত্রিকায় আমাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়। এতে অগণিত গালি দেয়া হয়। নমুনা স্বরূপ নিম্নে কিছু প্রদত্ত হল।”
-আখবারে পয়গাম সোলেহ লাহোর তারিখ ১১মার্চ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ

(১) লাহোরী আসহাবে ফিল, (২) আহলে পয়গামের ইহুদীদের ন্যায় ডিগবাজি, (৩) অন্ধকারের সন্তান এবং বিষাক্ত স্বপ্ন, (৪) লাহোরী আসহাবুল উখদুদ, (৫) নোংরামি, ভ্রষ্টামি ও জোচ্ছুরিপনার প্রদর্শন, (৬) শত্রুতার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে লাহোরী জামায়াত দুনিয়ার দাস এবং জাহান্নামের ইন্ধন বনে যায়, (৭) নেহায়েতই নীচু, নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট স্বভাবের অধিকারী এবং নির্বোধ হতে নির্বোধ মানুষ, (৮) আসহাবে উখদুদের সংবাদবাহী, (৯) বদলাগামে পয়গাম, (১০) কুচক্রী এবং অসৎ কর্ম, (১১) অকৃতজ্ঞ, গাদ্দারী এবং নিমকহারামিপূর্ণ কর্ম, (১২) দু'মুখো সাপের মাথা পিসে দাও, (১৩) কবুতরের ন্যায় জানোয়ার, (১৪) আহমদীয়া দালানের গুড়া কুমি, (১৫) আলু, তরকারী অথবা রসুন, পিয়াজ বিক্রেতা নয় কি, (১৬) মিথ্যা বলে, ধোঁকা দিয়ে প্রতারণা করে ভিজা বিড়াল বনে, (১৭) রসুন, পিয়াজ এবং কপি তহরকারীর মূল্য জানা যায়, (১৮) পরকালের অভিসাপের কৃষ্ণদাগ মাথায় পড়ুক, (১৯) যদি লজ্জা থাকে, অঞ্জলীপূর্ণ পানিতে ডুব দাও, (২০) এটা কোন ধরনের দাজ্জালীপনা, ভ্রষ্টামি এবং জোচ্ছুরিপনা, (২১) সাদা কাঠ সংগ্রহকারী, নাদান দুশমন, (২২) নির্বোধ এবং বিবেক ও ভদ্রতা শূন্য ইত্যাদি ইত্যাদি।
-উদ্ধৃত ফারুক পত্রিকা কাদিয়ান পয়ামী নম্বর তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

লাহোরী জামায়াতও কাদিয়ানীদের গালি প্রদানে কম করেনি। লক্ষ্য করুন!

“মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবের (লাহোরী) শুক্রবার ১৯ অক্টোবর ১৯৪৫ সালের ভাষণ আমাদের সম্মুখে আছে। এ ভাষণটিও স্বভাব অনুযায়ী আহমদী জামায়াত এবং হযরত আমিরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে অপবাদ ও গালি দ্বারা পূর্ণ। জনাব মৌলভী সাহেবের গালির অভিযোগ কি আর করব? তার উত্তেজনা, গোসসা-ক্রোধ প্রসমিত হচ্ছে না। আমরা তাদের গালি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তারা গালি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়নি। প্রতিটি ভাষণই পূর্বের ভাষণ হতে অধিক নিন্দা দ্বারা পূর্ণ থাকে। অকথা, কুকথা জনাব মৌলভী সাহেবের অন্যতম স্বভাবে পরিণত হয়েছে। কোন কথাই নিন্দা, দোষ, সমালোচনা, গালাগালি ছাড়া

বলতে পারে না।” -উল্লিখিত উদ্ধৃতি আল ফযল পত্রিকা হতে নেয়া হয়েছে, কাদিয়ান খ. ২৩, সংখ্যা ২৭৩, পৃ. ৪, তা. ২২ নভেম্বর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ

গালাগালি করা উভয় দলের স্বভাবে পরিণত হয়। কখনো একদল অগ্রগামী হত, কখনো অপর দল। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর গ্রন্থগুলোর মাঝে এর ভিত্তি রাখা হয়। সুতরাং আমিরের অনুসরণতো অত্যাবশ্যিক। মির্যা মাহমুদ মুহাম্মদ আলী সম্পর্কে গালির অভিযোগ করেছে। এখন মির্যা মাহমুদ সম্পর্কে মুহাম্মদ আলীর অভিযোগ প্রত্যক্ষ করুন।

“স্বয়ং জনাব মিয়া মাহমুদ আহমদ সাহেব মসজিদে জুমার খুতবায় আমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি, পৃথিবীর নিকৃষ্টতম সম্প্রদায় এবং শৌচাগারের পতিত বাকল বলেছে। এশব্দগুলো এতোই কষ্টদায়ক যে, শুনতেই শৌচাগারের দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।”

-মৌলভী মুহাম্মদ আলী কাদিয়ানী লাহোরী জামায়াতের আমির জুমার খোতবায় উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করে। পয়গামে সোলেহ পত্রিকা লাহোর, খ.২২, সংখ্যা-৩৩, পৃ.৭, তারিখ ৩ জুন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ

মুসলমানরা লাহোরী এবং কাদিয়ানী উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিতর্ককে একই মূদ্রার দু'পিঠ হিসেবে জানে। তারা মনে করে একই দলের দু'চিলের বদস্বভাবকে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণেরই ফল। আমিরে শরীয়ত হযরত সায়্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ.কে কেউ জিজ্ঞেস করেন, লাহোরী এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মাঝে পার্থক্য কি? তিনি তৎক্ষণিক বলেন, উভয় অভিসপ্ত, শুকর শুকরই হয়। চাই তা শেতাঙ্গ হোক কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ। কুফর কুফরই। চাই তা লাহোরী কিংবা কাদিয়ানী গ্রুপ হোক। লাহোরীদের কেন্দ্র লাহোরে। কাদিয়ানীদের কেন্দ্র পাকিস্তান হবার পর চুনাব নগরে (রবওয়া) ছিল। বর্তমানে তাদের কেন্দ্র স্বর্গীয় সমাধিসহ লন্ডনে স্থানান্তর করা হয়। উলামায়ে কেরাম তাদের উভয় গ্রুপকে কাফের ফতুয়া প্রদান করেছেন। জাতীয় সংসদ, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তাদের উভয় গ্রুপকে কাফের-অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

লাহোরী গ্রুপ কেন কাফির ?

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যেই নবুওয়তের দাবী করবে, উম্মতের সর্বসম্মত মতে সেই কাফের-অমুসলিম।

যে ব্যক্তি তাকে ইমাম, মুজাদ্দিদ, আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত, মাহদী, মসীহ, যিল্দি নবী বলে স্বীকার করবে, সেও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি নবুওয়তের দাবীদারকে যে ব্যক্তি মুসলমান মনে করবে, তাকে কাফের মনে করবে না, সেও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। এ কারণেই উলামায়ে কেরামের ফতুয়া, আদালতের ফয়সালা মতে এবং এসেম্বলীর আইন মতে কাদিয়ানীদের ন্যায় লাহোরী গ্রুপও কাফের-অমুসলিম। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর যে সকল কুফরী দাবী-দাওয়াকে লাহোরী সম্প্রদায় বিশুদ্ধ বলে সমর্থন করে, তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. “সত্য খোদা তিনিই যিনি কাদিয়ানে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছেন।”
-দাফেউল বালা পৃ ১১, রুহানী খাযায়েন খ. ১৮, পৃ. ২৩১

২. “আমার দাবী আমি নবী এবং রসূল।” -বদর ৫ মার্চ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ, মালফুযাত খ. ১০, পৃ. ১২৭

৩. “আমার কঠিন দাবীগুলোর একটি হল রেসালত আল্লাহর ওহী লাভ এবং মসীহ মাউদ হবার দাবী।” -বারাহিনে আহমদীয়া খ. ৫, পৃ. ৫৫, হাশিয়া রুহানী খাযায়েন খ. ২১, পৃ. ৬৮

৪. “নবুওয়ত লাভের জন্য আমাকে খাস করা হয়েছে।” -হাকিকাতুল ওহী পৃ. ৩৯১, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৪০৬

৫. “এ উম্মতের মাঝে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কারণে হাজার আওলিয়া সৃষ্টি হয়েছে, আর এর মাঝে একজন সেও (মির্যা) যিনি একাধারে নবী আবার উম্মতও।” -হাকিকাতুল ওহী পৃ. ২৮, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৩০

৬. “আমার নবী হবার নিদর্শন হল যা তাওরাতে উল্লেখ হয়েছে। আমি কোন নতুন নবী নই। আমার পূর্বে কয়েকজন নবী অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের তোমরা সত্য মনে কর।” -আল হাকাম ১০ এপ্রিল ১৯০৮, মালফুযাত খ. ১০, পৃ. ২১৭

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়তের দাবীর কথা বিদ্যমান রয়েছে। পূর্বের নবীদের (হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত) অনুরূপ নবী হবার দাবী করে। নবী হবার জন্য মুজেষার প্রয়োজন আছে। এমন কোন

নবী অতীত হননি যাকে আল্লাহ তাআলা মুজেশা দান করেননি। মির্যা নবুওয়তের দাবী করায়, তারও মুজেশা দেখানো জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে নিজের মুজেশা সম্পর্কে লিখে:

৭. “যদি আমার নিকট কোন মুজেশা না থাকে তাহলে আমি মিথ্যাবাদী।” -তোহফাতুল নাদওয়া পৃ. ৯, রুহানী খাযায়েন খ. ১৯, পৃ. ৯৭

৮. “কিন্তু আমি তার থেকে অধিক এ কথার প্রমাণ রাখব যে, আমার হতে হাজার হাজার মুজেশা প্রকাশ পেয়েছে।” -তোহফাতুল নাদওয়া পৃ. ১২, রুহানী খাযায়েন খ. ১৯, পৃ. ১০০

৯. “এবং আল্লাহ তাআলা আমার জন্য এতো অধিক পরিমাণের নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, যদি তা হযরত নুহ আ.-এর বেলায় প্রকাশ করতেন, তবে তারা ডুবে যেত না।” -তাতিম্মাহ হাকিকাতুল ওহী পৃ. ১৩৭, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৫৭৫

সূধী পাঠক ! নবীর দাবীর জন্য ওহী হওয়া জরুরী। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ সম্পর্কে লিখে:

১০. “এবং খোদার কালাম আমার নিকট এতো অধিক পরিমাণ আসে যে, যদি তার সব লেখা হয়, তবে তা বিশ খণ্ড হতে কম হবে না।” -হাকিকাতুল ওহী পৃ. ৩৯১, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ৪০৭

প্রমাণীত হল যে, মির্যা নবুওয়তের দাবী করেছে। আর সর্বসম্মত মত হল, دعوى النبوة بعد نبينا كفر بالاجماع “আমাদের নবীর পরে নবুওয়তের দাবী করা কুফরী।” -শরহে ফিকহে আকবর মূল্লা আলী কারী পৃ. ২০৭, ছাপা মিসর

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে নবুওয়তের দাবী করবে, সে সর্বসম্মত মতে কাফের। মির্যার এ জাতীয় কুফরী দাবীগুলো লাহোরী সম্প্রদায় বিগুহ্ন মনে করে। তাই কাদিয়ানীদের ন্যায় লাহোরী গ্রুপও কাফের।

প্রশ্ন নম্বর নয়

আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণের জন্য হযরত আবু বকর রাযি.-এর যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে খেদমত আজ্জাম দেয়া হয়েছে এর সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগভূর্ণ চিত্র অংকন করুন।

উত্তর

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়তের মাঝেই মুসলিম জাতির ঐক্যবদ্ধতার মূল রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই এ বিষয়ে চৌদ্দশ বছরে কখনো মুসলিম জাতির মাঝে বিভক্তি দেখা দেয়নি। বরং যখনই কোন ব্যক্তি এবিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে, তখনই মুসলিম জাতি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণ কিংবা এর অস্বীকারকারীদের মূলত্পাটন করা দ্বীনের অপরিহার্য অংশ। দ্বীনরূপি নেয়ামতের পরিপূর্ণতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হয়েছে। এজন্য দ্বীনের এ বিভাগেও আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কাজ নিয়েছেন। সর্বপ্রথম তাঁর সময়ে মিথ্যা নবীর দাবীদারের মূলত্পাটন করে মুসলিম জাতির নিকট নমুনাস্বরূপ স্বীয় আদর্শ রেখে যান।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসওয়াদ আনাসী এবং তলিহা আসাদী কে দমনের জন্য যথাক্রমে হযরত ফিরোজ দাইলামী এবং হযরত যিরার ইবনে আযুর রাযিকে প্রেরণ করেন। এটি মুসলিম জাতির জন্য তাঁর প্রয়োগিক শিক্ষা ছিল। খতমে নবুওয়তের আকীদার সংরক্ষণ এবং এ আকীদার অস্বীকারকারীদের মূলত্পাটনে উম্মত স্বীয় প্রাণকেও ঝুঁকিপূর্ণ করতে কুষ্ঠাবোধ করেনি। কারণ এর মাঝেই নিহিত উম্মতের বরকত এবং উভয় জগতের কল্যাণ। মুসলিম জাতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আদর্শকে নিজেদের জন্য এমন আলোকবর্তিকা বানিয়েছে যা কল্যাণময় যুগ হতে নিয়ে আজ অবধি এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেনি। তলিহা আসাদী তার চাচাত ভাই কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দূত হিসেবে প্রেরণ করে। তাকে তার নবুওয়তের দাওয়াত দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খতমে নবুওয়ত আকীদার সংরক্ষণের জন্য প্রথম জিহাদে সিপাহসালারের দায়িত্ব সাহাবী হযরত যিরার ইবনে আযুর রাযিকে প্রদান করেন। এবং তলিহার প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের নিকট জিহাদের নির্দেশ দিয়ে হযরত যিরার রাযিকে প্রেরণ করেন। তিনি আলী ইবনে আসাদ, মিনান ইবনে আবু সিনান এবং কবিলায়ে কাযা ও কবিলায়ে বনুওয়রতায় পৌঁছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম শুনান। তাদেরকে তলিহার বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য

উদ্ভুদ্ধ করে তোলেন। তারাও হযরত যিরার রাযি.-এর আহবানে সারা দিয়ে সতঃস্ফুৰ্ণভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। খতমে নবুওয়তের আকীদা সংরক্ষণার্থে সংগঠিত প্রথম জিহাদে মুসলমানরা জয়লাভ করে। তারা বিজয় বেশে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু হযরত যিরার রাযি. মদীনার উদ্দেশে যাত্রা পথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিকাল হয়ে যায়। -তালখিস আইম্মায়ে তালবীস খ. ১, পৃ. ১৭

হযরত আবু বকর রাযি.-এর যুগে খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণে প্রথম যুদ্ধ

হযরত আবু বকর রাযি.-এর খেলাফত কালে খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণে সর্বপ্রথম যুদ্ধ ইয়ামামার ময়দানে মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। এযুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব সর্বপ্রথম পালন করেছিলেন হযরত ইকরামা রাযি. তারপর হযরত শারজিল রাযি., সবশেষে হযরত খালিদ ইবনে ওলিদ রাযি.। খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণার্থে সংগঠিত এযুদ্ধে বারশ সাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন। এতে সাতশ কুরআনের হাফেয এবং কারী শহীদদের তালিকায় ছিলেন। অনেক বদরী সাহাবীও শাহাদত বরণ করেন। হযরত আবু বকর রাযি. হযরত খালিদ ইবনে ওলিদ রাযি.-এর উদ্দেশে লিখেন, মুসাইলামার অনুসারী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মুরতাদ হবার অপরাধে হত্যা করবে। নারী এবং শিশুদেরকে বন্দি করে রাখবে। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, মুরতাদদেরকে জ্বালিয়ে মারার নির্দেশ হযরত সিদ্দিকে আকবর প্রদান করেছিলেন। -বেদায়া নেহায়া খ. ৬, পৃ. ১৩১০, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারী রহ. লিখিত তারিখুল ইমাম ওয়াল মুলুক খ. ২, পৃ. ৪৮২

যাহক হযরত আবু বকর রাযি.-এর ফরমান পৌঁছার পূর্বেই হযরত খালিদ ইবনে ওলিদ রাযি. তাদের সাথে সন্ধি করেন। তিনি মুসাইলামার এক সঙ্গী মুজাআকে গ্রেফতার করেছিলেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হলে হযরত খালিদ রাযি. তাকে এই বলে মুক্তি দেন যে, তোমাদের দুর্গের বন্দ দরজা খুলে দিতে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের বলবে। কিন্তু মুজাআ তা না করে নারী এবং কিশোরদের মাথায় পাগড়ী বেধে অস্ত্র সজ্জিত করে দুর্গে দাড়া করায়। এ দেখে হযরত খালিদ রাযি. মনে করলেন, যুদ্ধের জন্য তাদের এখনো প্রচুর সৈন্য বিদ্যমান রয়েছে। হযরত খালিদ রাযি. এবং মুসলমানরা হাতিয়ার খুলে ফেলেছিলেন। নতুন করে যুদ্ধে না জড়িয়ে তাদের সাথে সন্ধি করেন। দুর্গ উন্মুক্ত করার পর দেখা গেল সেখানে কেবল নারী এবং কিশোররা ব্যতীত কেউ নেই। হযরত খালিদ রাযি. মুজাআকে বললেন,

তোমরা প্রতারণা করলে। উত্তরে সে বলল, নিজ সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য এরূপ করলাম। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সন্ধি করার পরও হযরত খালিদ রাযি. তা ভঙ্গ করেননি। তিনি তা বলবৎ রাখেন। মুসাইলামাকে হযরত ওয়াহসী রাযি. হত্যা করেন।

বেদায়ার এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, তলিহার কিছু অনুসারীদের সন্ধানে বাযাখা নামক স্থানে এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি তাদের থেকে ঐ সকল মুসলমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন যারা তাদের এলাকায় বসবাস করত। তলিহার কোন কোন অনুসারীকে হযরত খালিদ রাযি. অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেন, কাউকে পাথর মেরে, কাউকে পর্বতের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। এরূপ করার কারণ হল, যারা মুরতাদ হতে চায় তারা যেন এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। -আল বেদায়া খ. ২, পৃ. ১১৬৬, উর্দু তরজমা, ছাপা নফিস একাডেমি করাচি

চৌদ্দশ বছরের ইসলামের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য বহন করে যে, মিথ্যা নবীদাবীদার ব্যতীত অন্য যত ফেৎনা আছে তাদের সাথে বিতর্ক, আলোচনা, মুবাহেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মিথ্যা নবীর দাবীদারদের সাথে কোন প্রকারের আলোচনারই অনুমতি শরীয়ত দেয়না।

“ফুসুলুল উমাদী” নামক গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, “অনুরূপভাবে যদি বলে আমি আল্লাহর রসূল। অথবা ফারসী ভাষায় বলে من پیغمبر এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পয়গাম নিয়ে এসেছে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। যখন কোন ব্যক্তি নবীর দাবী করল এবং কোন ব্যক্তি তার নিকট মুজেযা তলব করল, তখন কারো মতে উক্ত মুজেযা প্রত্যাশি কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীযুগের উলামাদের মতে মুজেযা প্রত্যাশি যদি প্রকৃত মুজেযা প্রদর্শনের নিয়তে নয়; বরং তাকে অপমানিত করা কিংবা সে যে মুজেযা প্রদর্শনে অক্ষম একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হয়, তবে সে কাফের নয়।”
-ফুসুল-১৩০০

ইমাম আব্দুর রশীদ বুখারী রহ. ‘খোলাসাতুল ফাতাওয়া’ নামক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় কিতাবু আলফাযিল কুফরির দ্বিতীয় অধ্যায় লিখেন,

“যদি কোন ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করে এবং কেউ তার নিকট মুজেযা তলব করে, তবে কোন কোন ফকীহর মতে মুজেযা প্রত্যাশিও কাফের হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, যদি তার অক্ষমতা

প্রকাশ এবং তাকে অপমানিত করার উদ্দেশে মুজিয়া তলব করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হবে না।”

ইসলামের ইতিহাস একথার সাক্ষি যে, যখনই কোন নরাধম ইসলামী সাম্রাজ্যে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করেছে, তখন উন্মত তার থেকে দলীল, মুজিয়া তলবের পরিবর্তে তার অস্থিত্ব থেকে এ পৃথিবীকে পবিত্র রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। আমাদের উপমহাদেশে ইংরেজ বেনিয়ারা মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দিয়ে মিথ্যা নবীর দাবী করায়। মুসলমানরা ছিল নির্যাতিত, অত্যাচারিত। তারা উপায়হীন হয়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্ক করতে বাধ্য হয়। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে দলীল-প্রমাণে, বিতর্কে, মামলা-মুকাদ্দমায়, আদালতে, পার্লামেন্টে তারা পরাস্ত হয়। আফ্রিকাসহ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে কোন ফোরামে বিতর্ক হয়েছে, তারা জয়ী হতে পারেনি। তাদের সাথে আলোচনা, বিতর্ক তো বাধ্য হয়ে করতে হয়, নতুবা মিথ্যা নবীদাবীদার এবং তাদের অনুসারীদের চিকিৎসা হল, যা হযরত আবু বকর রাযি. ইয়ামামার প্রান্তরে অবলম্বন করেছিলেন।

প্রশ্ন নম্বর দশ

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিথ্যা নবীর দাবীর প্রতিরোধে দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম যে অনবদ্য খেদমত আজ্ঞাম দিয়েছেন তা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করুন।

উত্তর

উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের ক্ষমতার ভিতকে পাকাপোক্ত করার জন্য ‘ডিবাইডেট এন্ড রোলের’ পলিসি গ্রহণ করে। এর জন্য তারা এদেশিয় কিছু বৈদ্বৈমান, গান্ধার, বিশ্বাসঘাতক এবং তথাকথিত ফতুয়াবাজ তৈরী করে। এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। এমন একজন নবীদাবীদারের তাদের প্রয়োজন দেখা দেয় যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে খোদাপ্রদত্ত বলে ঘোষণা দিবে। এ উদ্দেশে ভারতীয়দের মধ্য হতে নিজেদের স্বার্থরক্ষাকারী ব্যক্তি অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয়। অবশেষে তারা নরাধম মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহারের জন্য পেয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে কাদিয়ানী ফেৎনা সৃষ্টির পূর্বেই ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক পুরুষ হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী রহ.

কাশফের মাধ্যমে এবিষয়ে অবগত হন যে, ভারতে কিছু দিনের মধ্যে একটি ফেৎনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। একদিন তাঁর নিকট মাওলানা পীর মোহর আলী শাহ গোলরভী রহ. আগমন করেন। হযরত হাজী সাহেব রহ. পীর সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

“ভারত বর্ষে অল্প দিনের মাঝে একটি নতুন ফেৎনার প্রকাশ পাবে। তুমি অবশ্যই স্বদেশে ফিরে যাও। তোমরা নিরবতা অবলম্বন করলেও, ঐ ফেৎনা ব্যাপক উল্লিতি লাভ করতে পারবে না। আমার মতে (পীর সাহেব বলেন) হাজী সাহেব রহ. ফেৎনা দ্বারা কাদিয়ানীদের বুঝিয়েছেন।”
-মালফুযাতে তৈয়্যিবা পৃ. ১৩৬, তারিখে মাশায়েখে চিশত পৃ. ৭১৩, ৭১৪, বিস বড়ে মুসলমান পৃ. ৯৮, মোহরে মুনির পৃ. ১২৯

এ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কাদিয়ানী ফেৎনার সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে এর বিরোধিতায় তৎপর হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও যথেষ্ট হবে না যে, কাদিয়ানী ফেৎনার বিরুদ্ধে তৎপর হবার সর্বপ্রথম যে জামায়াতকে নির্বাচন করেন, তারা হল দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইংরেজদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে মুবাল্লিগ, মুজাদ্দিদ, মাহদী, মসীহ, যিল্লী, বুরুযী ও শরীয়তধারী নবী এমনকি এক পর্যায়ে নিজেই খোদা বলে দাবী করে। নাউযুবিল্লাহ। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রথম গ্রন্থ যখন প্রকাশ পায় এবং তার কার্যক্রম যখন প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, সে সময় সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাকে মুরতাদ, কাফের এবং ইসলাম হতে খারিজ হবার আওয়াজ তুলেন, তিনি হলেন দেওবন্দ পরিবারের এক সদস্য আরেফ বিল্লাহ হযরত মিয়া শাহ আব্দুর রহীম সাহারানপুরী রহ.। এই ঘোষণার পর কাদিয়ানীর পক্ষ হতে একটি প্রতিনিধি দল মিয়া শাহ আব্দুর রহীম সাহারানপুরী রহ.-এর সাথে মতবিনিময় করার জন্য আসে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে শুন! এ ব্যক্তি অল্প দিনের মাঝে এমন কিছু দাবী করবে যা না গ্রহণ করা যাবে, না প্রত্যাখ্যান করা যাবে। এতে কাদিয়ানীর প্রতিনিধিরা হতভম্ব হয়ে বলল, দেখ! উলামা তো দূরের কথা, একজন দরবেশও অন্যের সুখ্যাতিকে পছন্দ করছে না। মিয়া সাহেব বললেন, আমাকে জিজ্ঞেস করছ যখন, আমার যা বুঝে আসছে, তাই বলেছি। আমি তো সে সময় পর্যন্ত থাকব না। তোমরা সব দেখতে পাবে। -ইরশাদে কুতবুল ইরশাদ হযরত শাহ আব্দুল কাদির রায়পুরী রহ. পৃ. ১২৮

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে প্রথম ফতুয়া

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার মতবাদ প্রচারের লক্ষ্যে ১৩০১ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে লুধিয়ানায় আগমন করে। সে সময়ে মাওলানা মুহাম্মদ লুধিয়ানবী রহ., মাওলানা আব্দুল্লাহ লুধিয়ানবী রহ., মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল লুধিয়ানবী রহ. এমর্মে ফতুয়া প্রদান করেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুজাদ্দিদ নয়; বরং সে একজন যিন্দিক, মুলহিদ।—ফতুয়ায়ে কাদেরিয়া পৃ. ৩

আব্বাহ রব্বুল ইয্যতের অপার মহিমায় সর্বপ্রথম দেওবন্দী ঘরণার উলামায়ে কেরামই গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কুফরের ফতুয়া প্রদান করেন। মাওলানা মুহাম্মদ লুধিয়ানবী রহ. আহরার নেতা মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানবীর রহ. দাদা ছিলেন। উলামায়ে কেরামের এ ফতুয়া স্থীর পানিতে পাথর নিক্ষেপের মত কাজ করে। এতে মানুষ সচেতন হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে গণমত তৈরী হতে থাকে।

এটি ঐ সময়ের কথা যখন মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন বাটালবীসহ অন্যরা মির্যার গ্রন্থাবলীর সমর্থক ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনিও মির্যার বিরুদ্ধে ফতুয়া প্রদান করেন। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইংরেজের ইশারায় পুস্তকাদি রচনা এবং প্রচার করতে থাকে। ভারতীয় উলামায়ে কেরাম প্রয়োজনানুসারে তার বিতর্কিত রচনাবলীর জবাব প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। পাঠকবৃন্দ! একথা শুনে অবশ্যই খুশি হবেন যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে মির্যার বিরুদ্ধে ফতুয়া লিপিবদ্ধ এবং অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন স্থানের উলামায়ে কেরামের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা দেওবন্দী উলামাদেরই সৌভাগ্য হয়েছিল। দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ সহল রহ. ২২ সফর ১৩৩১ হিজরী নিম্নের ফতুয়াটি তৈরী করেন।

এক. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুরতাদ, যিন্দিক, মুলহিদ এবং কাফের।

দুই. তার অনুসারীদের সাথে লেনদেন ইসলামী শরীয়তের আলোকে বৈধ নয়। মুসলমানদের কর্তব্য হল কাদিয়ানীদের সালাম না দেয়া। তাদের সাথে আত্মীয়তা না করা, তাদের যবেহকৃত প্রাণীর মাংস আহার না করা। যেভাবে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং হিন্দুরা ভিন্ন ধর্মের অনুসারী, তদ্রূপ কাদিয়ানীরা পৃথক ধর্মের অনুসারী। যেভাবে মলমূত্র এবং সাপ-বিছুর হতে

দূরে থাকা হয় তদ্রূপ কাদিয়ানীদের থেকে দূরে থাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক।

তিন. কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের পিছনে নামায পড়া ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের পিছনে নামায পড়ার নামাস্তর।

চার. কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলমানদের মসজিদে কাদিয়ানীদের ইবাদত করার অনুমতি দেয়া হিন্দুদেরকে মসজিদে পূজাপাটের অনুমতি দেয়ার মতই।

পাঁচ. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কাদিয়ান (পূর্ব পাঞ্জাব ভারত) নামক স্থানের অধিবাসি, তাই তার অনুসারীদের কে কাদিয়ানী অথবা গোলামিয়া ফেরকা বরং শয়তানী ইবলিসী জামায়াত বলা হবে।

উক্ত ফতুয়াতে স্বাক্ষরকারী উলামায়ে কেরামের মাঝে অন্যতম হলেন শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ., হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হাসান রহ., হযরত মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., হযরত মাওলানা মুরতাজা হাসান চাদপুরী রহ., হযরত মাওলানা আব্দুসসামি রহ., হযরত মাওলানা মুফতী আযিযুর রহমান দেওবন্দী রহ., হযরত মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াবী রহ., হযরত মাওলানা ইযায আলী দেওবন্দী রহ., হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান রহ.সহ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম। এছাড়া এতে সাহারানপুর, দিল্লী, কলিকাতা, ঢাকা, পেশওয়ার, রামপুর, রাওয়ালপিন্ডি, হাযারা, মুরাদাবাদ, ওযিরাবাদ, মুলতান এবং মেওয়ার নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম স্বাক্ষর করেন।

সুধী পাঠক! এ থেকে চিন্তা করুন, উক্ত ফতুয়াটি কতই না শক্তিশালী ছিল। শত বছর পূর্বে দেয়া এ ফতুয়ার মাঝে আজ পর্যন্ত কলমের আচর লাগাতে হয়নি কাউকে। পরবর্তীতে ১৩৩২ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকেও একটি ফতুয়া প্রদান করা হয়। এতে কাদিয়ানীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কে হারাম করা হয়েছে। উক্ত ফতুয়াটি তৈরী করেন দারুল দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী আযিযুর রহমান রহ., এতে দেওবন্দ হতে হযরত মাওলানা সায্যিদ আসগর হোসাইন রহ., হযরত মাওলানা রসূল খান রহ., হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্দোলবী রহ., হযরত মাওলানা গুল মুহাম্মদ খান রহ., সাহারানপুর থেকে মুযাহিরুল উলূমের মুহতামিম হযরত মাওলানা ইনায়েত এলাহী রহ.,

হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ., হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী রহ., হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ রহ., হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরঠী রহ., থানাবন থেকে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানবী রহ., রায়পুর থেকে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. দিল্লী হতে হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েত উল্লাহ দেহলবী রহ. মোটকথা কলিকাতা, বেনারস, লক্ষ্মো, আগ্রা, মুরাদাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, পেশাওয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, হুশিয়ারপুর, শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ, ভূপাল, রামপুরসহ বিভিন্ন স্থানের হাজারো উলামায়ে কেরাম স্বাক্ষর করেন। এ ফতুয়াকে ‘ফতুয়ায়ে তাকফিরে কাদিয়ানী’ বলা হয়। দেওবন্দের কুতুব খানা ইযাযিয়া থেকে এটি মুদ্রিত হয়।

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা

দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ে সকল ফোরাম কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। যার ফলে গোটা ভারতবাসির নিকট একথা পরিস্ফুটিত হয় যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের-অমুসলিম। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন আদালতে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়। এমনকি মরিশাসের আদালতও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রায় দেয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশী যে মামলাটি আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাহল ভাওয়ালপুরের মুকাদ্দমা। ভাওয়ালপুরের উলামায়ে কেরামের আমন্ত্রণে হযরত মাওলানা সায্যিদ আনোয়ার শাহ কশ্মিরী রহ., হযরত মাওলানা আবুল ওফা শাহজানপুরী, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফি রহ., হযরত মাওলানা সায্যিদ মুরতাযা হাসান চান্দপুরীর ন্যায় মনীষী উলামায়ে কেরাম ভাওয়ালপুরের এসে মুকাদ্দমার ওকালতি করেন। উক্ত মুকাদ্দমাটি ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ হতে নিয়ে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। সে মুকাদ্দমায় জজ সাহেব কাদিয়ানীদের কুফরেরও ঘোষণা দেন। এতে কাদিয়ানীরা অস্থির হয়ে উঠে। পরবর্তীতে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের রায়ও উক্ত মামলার রায়ের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়। যা ছিল দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের অনবদ্বন্দ্ব অবদান।

সম্মিলিতভাবে কাদিয়ানী মতবাদের বিরোধিতা

ব্যক্তি মোকাবেলা ব্যক্তি, দলের মোকাবেলা দল করতে পারে। শাইখুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ.-এর

আহবানে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে লাহোরে আঞ্জুমানে খুদামুদ্দিনের বার্ষিক সম্মেলন ডাকা হয়। উক্ত সম্মেলনে গোটা ভারতবর্ষ হতে পাঁচশত উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। ইমামুল আসর হযরত মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. হযরত মাওলানা সায্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ.কে আমিরে শরীয়ত উপাধি দিয়ে কাদিয়ানী ফেৎনা বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করেন। এ সময়ে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে ব্যক্তি গঠনে এবং সাংগঠনিকভাবে দারুল উলুম দেওবন্দই ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখে। নদওয়াতুল উলামা লাক্ষৌর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মদ আলী মোঙ্গেরী রহ.ও অনবদ্ব ভূমিকা রাখেন। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তাঁর এবং মাওলানা মুরতাযা হাসান চান্দপুরী রহ.-এর অস্তিত্ব ভারতে হযরত উমর রাযি.-এর যুগের সাথে তুলনা দেয়া যায়। এর দায়িত্ব পাবার পর হতে হযরত সায্যিদ শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রহ. কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে সার্বক্ষণিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি মজলিসে আহরারে ইসলাম হিন্দের নেতৃত্বে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খুলেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এবং দারুল উলুম দেওবন্দের কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী খানবী রহ.ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

কাদিয়ানে খতমে নবুওয়ত কনফারেন্স

আল্লাহ রক্বুল ইয্যতের অপার মহিমায় মজলিসে আহরারে ইসলাম ২০,১১,২২ অক্টোবর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কাদিয়ানে খতমে নবুওয়ত কনফারেন্স আহবান করে। ফাতেহ কাদিয়ান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হায়াত রহ., হযরত মাওলানা এনায়েত আলী চিশতী রহ., মাষ্টার তাজউদ্দীন আনসারী রহ., হযরত মাওলানা রহমতউল্লাহ মোহাজেরে মক্কী রহ. কাদিয়ানে অবস্থান করে তাদের সম্মুখে কার্যক্রম চালান। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তাঁরা সকলেই দেওবন্দী ছিলেন। এ সম্মেলনে উলামায়ে কেরাম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাদিয়ানী বিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলার সংকল্প করেন।

কাদিয়ান থেকে রবওয়া পর্যন্ত

সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল স্বাধীনতাকামী উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে আমিরে শরীয়ত হযরত মাওলানা সায্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ.

এবং মজলিসে আহরারে ইসলামের জানবায় সৈনিকরা অগ্নিবরা বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে ইংরেজ এবং ইংরেজ পোষ্য কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ গড়ে তুলেন। এক পর্যায়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজের নীল নকশা মোতাবেক ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান নামে একটি মুসলিম দেশ জন্মলাভ করে। বিভক্তির ফলে কাদিয়ানী নবুওয়তের বর্ণা শুকিয়ে যেতে শুরু করে। কাদিয়ানীদের আস্তানা ভারতের অংশে থেকে যায়। কাদিয়ানী খলিফা পাকিস্তান চলে আসে। তারা পাকিস্তানের এক এলাকাকে ‘রবওয়া’ নাম দিয়ে নতুন ‘দারুল কুফর’ বানানোর অপপ্রয়াস চালায়। পাকিস্তানের আম মুসলিম জনতাকে মুরতাদ বানানোর ঘোষণা দিতে থাকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবার পর

কাদিয়ানীদের ভুল ধারণা ছিল যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ওপর তাদের প্রভাব রয়েছে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদের কজায় আছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যাকরউল্লাহ খান কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বী ছিল। তাই পাকিস্তানে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে কোন কষ্ট হবে না। তাদের প্রবল ধারণা ছিল ভারত বিভক্ত হবার কারণে আহরারে ইসলামের কার্যক্রম দুর্বল হয়ে গিয়েছে। সংগঠন এবং সাংগঠনিক তৎপরতা বিমিয়ে পড়েছে। এদিকে আহরারের প্রতি পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট ছিল। তাই কাদিয়ানীদের দাঙ্কিতা ছিল যে, নবুওয়তের সিংহাসনের চৌকিদারী করার মত কারো হিম্মত হবে না। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে, দ্বীনের হেফাযত এবং খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণের কার্যক্রম মানুষ নয় স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই পরিচালনা করেন। এর জন্য তিনিই কর্মী তৈরী করে দেন।

মজলিসে তাহফুযে খতমে নবুওয়ত

আমিরে শরীয়ত আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. এবং তার সাথীবৃন্দ কাদিয়ানীদের হীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। নতুন পরিস্থিতিতে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য মুলতানের একটি ছোট মসজিদে “মসজিদে সিরাজা”তে ১৯৪৯ সালে একটি পরামর্শ সভা ডাকা হয়। এতে আমিরে শরীয়ত রহ., ব্যতীত মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জালন্দরী রহ., খতিবে পাকিস্তান মাওলানা কাযী এহসান আহমদ সুজাবাদী রহ., মাওলানা আব্দুর রহমান মিয়ানবী রহ., মাওলানা তাজ মাহমুদ লায়েকপুরী রহ. এবং মাওলানা শরীফ জালন্দরী রহ. উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর একটি অরাজনৈতিক সংগঠন

গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংগঠনের নাম দেয়া হয় “মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়ত।” এর প্রাথমিক দৈনিক বাজেট এক টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রধান মুবাল্লিগের দায়িত্ব পালনের জন্য ফাতেহ কাদিয়ান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হায়াত রহ.কে মূলতানে ডাকা হয়। এটিই ছিল প্রচার কেন্দ্রে, থাকার স্থান এবং পরামশ্যের স্থান। মূলতানের এ ক্ষুদ্র মসজিদই ছিল আন্তর্দেশীয় সংস্থা মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের প্রাথমিক কন্ট্রোল রুম।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে এ আন্দোলনকে এতো ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এরই মাধ্যমে হিদায়েতের আলো পান।

নেতৃত্ব

মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের নেতৃত্বে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় সব সময় বিজ্ঞ এবং বুয়ুর্গ উলামায়ে কেরাম ছিলেন। হযরত রায়পুরী রহ. মৃত্যু পর্যন্ত এ আন্দোলনের নেতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ জালন্ধরী রহ., হযরত মাওলানা সাযি়দ ইউসুফ বিনুরী রহ., হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তি রহ. এবং হযরত মাওলানা খান মুহাম্মদ রহ. এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম আমির আমিরে শরীয়ত হযরত মাওলানা সাযি়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. ছিলেন। আমিরে শরীয়তের ইত্তিকাল ১৯৬১ সালে হয়। খতিবে পাকিস্তান হযরত মাওলানা কাযী এহসান আহমদ শুজাবাদী রহ. তার স্থলাবিষিক্ত হন। তাঁর ইত্তিকালের পর মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জালন্ধরী রহ. কে আমিরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁর তিরধাণের পর মুনাযেরে ইসলাম মাওলানা লাল হোসাইন আখতার রহ. কে আমির মনোনিত করা হয়। মাওলানা লাল হোসাইন আখতার রহ.-এর পর সাময়িকভাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হায়াত রহ. কে আমিরের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি অসুস্থ হবার কারণে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ সময়ে নেতৃত্ব প্রদানে কিছুটা সংকট সৃষ্টি হয়। মজলিসের কার্যক্রমে কিছুটা স্থবিরতা আসে। কিন্তু ‘আল্লাহ তাআলার দ্বীন সংরক্ষণের অঙ্গিকার’ এমন এক মহান ব্যক্তিত্বকে আমিরের দায়িত্বের জন্য নির্বাচন করা হয় যিনি তাঁর পূর্বসূরীদের জ্ঞানের

উত্তরসূরী ছিলেন, যাঁকে নিয়ে মুসলিম মিল্লাত গর্ব করে, তিনি হলেন হযরতুল আল্লামা মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ.।

খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণ এবং কাদিয়ানী মতবাদের বিরোধিতা ইমামুল আসর হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশিরী রহ.-এর আমানত তিনিই এ মিশনের সূচনা করেন। তাঁরই জ্ঞানের উত্তরসূরী হযরত বিনুরী রহ. থেকে এ মিশনের নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য আর কে হতে পারে? সুতরাং আমিরা শরীয়ত রহ.-এর এমারত, খতিবে পাকিস্তান মাওলানা কাযী এহসান আহমদ গুজাবাদী রহ.-এর ভাষণ, মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জালঙ্কারী রহ.-এর মেধা, মুনাযিরে ইসলাম মাওলানা লাল হোসাইন আখতার রহ.-এর হৃদয়তা, হযরত আল্লামা সায্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ.-এর দৃঢ় সংকল্প মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের কার্যক্রমকে কেবল বেগবানই করেনি; বরং তাঁদের নেতৃত্বে কাদিয়ানীর মিথ্যা নবুওয়তের প্রাসাদে এমন আঘাত হানে যার ফলে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়তের ওপর মিথ্যা, প্রতারণার মোহর এঁটে দেয়া হয়।

অরাজনৈতিক সংগঠন

মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের সংরক্ষণ এবং মুসলিম জাতিকে কাদিয়ানীদের হীন ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করা। এর জন্য হল রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত একটি সংগঠনের। তাইতো সংগঠনের গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি রাজনৈতিক ডামাডোলের সাথে জড়িত হতে পারবে না। রাজনৈতিক ময়দানে দ্বীনের খেদমত করার জন্য অন্য উলামায়ে কেরাম নিয়োজিত আছেন। মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের কর্মসূচী কেবল দাওয়াত ও তবলিগ, সংস্কার এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ থাকবে। দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এক. তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের প্লাটফর্ম সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম হবে। আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের আবেগ সকল মুসলমানের একতা, ঐক্য এবং পরস্পরের যোগাযোগের সর্বোত্তম প্লাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে।

দুই. মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের সাথে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে বিরোধ হবে না। মুসলিম জাতির সর্বসম্মত আকীদা তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের খেলনার সামগ্রীতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

ইমামুল আসর আল্লামা সায়্যিদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.

হযরত আল্লামা সায়্যিদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর প্রচেষ্টায় কাদিয়ানী মতবাদের বিরোধিতাকে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনে পরিণত করে। তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্য হতে এক দলকে কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে লেখনি এবং বক্তৃতার ময়দানে নিয়োজিত করেন। হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরঠি রহ., হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ., হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জালন্দরী রহ., হযরত মাওলানা গোলাম গাউস হাযারভী রহ., হযরত মাওলানা সায়্যিদ ইউসুফ বিনুরী রহ. হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্দোলবী রহ., হযরত মাওলানা গোলামুল্লাহ খান রহ.-এর ন্যায় উলামায়ে কেরাম যারা কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে অনবদ্ব ভূমিকা রাখেন, সকলেই হযরত কাশ্মিরী রহ.-এর শিষ্য ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের মসনদে বসে এ দরবেশ কাদিয়ানী বিরোধী একটি দল তৈরী করেন, যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

পাকিস্তান এবং কাদিয়ানী মতবাদ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হয়। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রধান মির্যা মাহমুদ ভারতের কাদিয়ান ছেড়ে পাকিস্তান চলে আসে। পাঞ্জাবের প্রথম ইংরেজ গভর্নর মোডির নির্দেশে চিনিউট নদীর উপকূলে এক হাজার চৌত্রিশ একড় জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। সরকার তাদের থেকে মাত্র ১০.০৩৪ পাকিস্তানি মুদ্রা রেজিষ্ট্রি খরচ বাবদ গ্রহণ করে। কাদিয়ানীর সেখানে ইস্রাইলের আদলে মির্যাইল রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করতে চেয়েছিল। স্যার যাকরুল্লাহ কাদিয়ানী পাকিস্তানের প্রথম পরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়। সে সরকারী খরচে কাদিয়ানী মতবাদকে পৃথিবীময় ব্যাপক পরিচিতি করে দেয়। ইংরেজ উপমহাদেশ ছেড়ে যায়; কিন্তু নিজেদের পোষ্য কাদিয়ানীদের জন্য একটি মঘবুত বেজ তৈরী করে যায়। কাদিয়ানী সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখতে থাকে। তাদের কর্মকাণ্ডে কোন বাঁধা ছিলনা। কাদিয়ানীদের লম্পজম্প দেখে দরদি মুসলমান মাত্রই বেচেইন হয়ে যায়।

দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় তারা তৎপর হয়ে উঠে। এদিকে পাকিস্তানে পৃথক পৃথক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে সময় কাদিয়ানীদের মুসলমান মনা করা হত। এ পরিস্থিতিতে আমিরে শরীয়ত সায়্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. শেরে ইসলাম হযরত মাওলানা গোলাম গাউস হাযারভী রহ. মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জালন্দরী রহ. কে বেরলভী মতাবলম্বীদের প্রধান মাওলানা আবুল হাসানাত কাদেরীর নিকট প্রেরণ করেন। দেওবন্দী, বেরলভী, আহলে হাদীস, শিয়া মতাবলম্বীসহ সকল মতের লোকেরা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেন। একে ইতিহাসে ‘খতমে নবুওয়ত আন্দোলন ১৯৫৩’ বলা হয়। এ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দেওবন্দের সন্তানরাই ছিলেন। এ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় কাদিয়ানীদের ভিত নরবরে হয়ে যায়। অভিসপ্ত যাকরুল্লাহ খান মন্ত্রীত্ব থেকে পদচ্যুত হয়।

আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণের এ সংগ্রামে দারুল উলূম দেওবন্দের কৃতি সন্তানদের যতই প্রশংসা করা হোক না কেন, তা তাদের কুরবানীর তুলনায় কম হবে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের ব্যানারে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করছিল। এদিকে রাজনৈতিকভাবে ধর্মীয় দিক নির্দেশনা এবং পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম কাজ করছিল। এ সবই হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দের রুহানী সন্তানদেরই অবদান। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম আইউবের শাসনামলে পশ্চিম পাকিস্তানের এসেম্বলীতে শেরে ইসলাম হযরত মাওলানা গোলাম গাউস হাযারভী রহ. এবং ন্যাশনাল এসেম্বলীতে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মুফতী মাহমুদ রহ.-এর নেতৃত্বে খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণের যে খেদমত আঞ্জাম দেয়া হয়, তা ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে। মোটকথা ধর্মীয় এবং রাজনৈতিকভাবে কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। সেনাবাহিনী এবং সরকারী বিভিন্ন অফিসে কাদিয়ানীদের যে তৎপরতা ছিল, সে সম্পর্কেও উলামায়ে কেরাম সচেতন ছিলেন। উলামায়ে কেরামের এক বিরাট জামায়াত বিশেষ করে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ., মাওলানা সায়্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ., মাওলানা গোলাম গাউস রহ., মাওলানা মুফতী মাহমুদ রহ., মাওলানা কাযী এহসান আহমদ শুজাবাদী রহ., মাওলানা গুল বাদশাহ রহ., মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ., মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ জালন্দরী রহ., মাওলানা তাজমাহমুদ রহ., মাওলানা লাল হোসাইন

আখতার রহ., মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফি রহ., মাওলানা আব্দুর রহমান মিয়ানবী রহ., মাওলানা মুহাম্মদ হায়াত রহ., মাওলানা আব্দুল কাইউম রহ., মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ রহ., মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তি রহ. এবং তাদের হাজার শিষ্য, ভক্ত, অনুরক্ত, মুরিদ সকলেই ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শের সৈনিক। এ ময়দানে এতো বিপুল পরিমাণে লোক অংশগ্রহণ করেছেন যাদের সকলের আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে করা দূরহ ব্যাপার। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা তাদেরকেই জায়ায়ে খায়ের দান করেন।

রাবেতায়ে আলম ইসলামী মক্কা

১৯৭৪ সালের এপ্রিলে রাবেতায়ে আলম ইসলামী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাযি়দ আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী রহ. এবং শাইখুল ইসলাম মাওলানা সাযি়দ মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ. সহ আরো কয়েকজন দেওবন্দি উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। তাদের প্রচেষ্টায় উক্ত সম্মেলনে কাদিয়ানীদের কাফের-অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। এটি রাবেতার একটি যুগান্তকরী সিদ্ধান্ত ছিল।

খতমে নবুওয়ত আন্দোলন ১৯৭৪ সাল

আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের অপার মহিমায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষ হতে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ রহ. শেরে ইসলাম মাওলানা গোলাম গাউস হাযারবী রহ., শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক রহ., মাওলানা আবদুল হাকিম রহ., মাওলানা সদরুশ শহীদ রহ. সহ আরো কয়েকজন ন্যাসনাল এ্যাসেম্বলিতে সদস্য নির্বাচিত হন। জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টে তখন ক্ষমতায় আসেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কাদিয়ানীরা পিপলস পার্টির পক্ষে কাজ করে। ফলে পিপলস পার্টি ক্ষমতায় আসার পর তারা পুনরায় নতুন উদ্যমে কার্যক্রম চালায়। ১৯৭৪ সালের ১৯ মে চুনাবনগর রেলওয়ে স্টেশনে নশতর মেডিকেল কলেজ মূলতানের ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায়। এর প্রতিবাদে মুসলমানরা মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এর নিতৃত্বে ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতি সন্তান মুহাদ্দিসে কবির মাওলানা সাযি়দ মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ.। অপর দিকে জাতীয় সংসদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন দারুল উলুম দেওবন্দেরই আর এক কৃতি সন্তান,

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ রহ.। তাদের আন্দোলনের ফলে কাদিয়ানীদের আইনীভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা করা হয়।

সূধী পাঠক! কাদিয়ানীরা পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন দেখত। আর উলামায়ে কেরামের আন্দোলনের কারণে তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে যায়। খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণের আন্দোলন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম পৃষ্ঠপোষক হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী রহ.-এর ইশারায় শুরু হয়েছিল। আর তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার সফলতা আসে মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ.-এর মাধ্যমে।

জাতীয় সংসদে কাদিয়ানী সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তা আলমী মজলিসে তাহাফুফুযে খতমে নবুওয়ত “তারিখী দস্তাবেজ” ঐতিহাসি দলীল নামে ছাপে। জাতীয় সংসদে দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শের সন্তান উলামায়ে কেরাম মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা মুফতী মাহমুদ রহ.-এর নেতৃত্বে কাদিয়ানীদের যেভাবে কুপকাত করেন, এ “তারিখী দস্তাবেজ” তারই প্রমাণ বহন করে। কাদিয়ানীরা সংসদে যে স্মারকলিপি পেশ করেছিল এর উত্তর মুফতী মাহমুদ রহ. এবং মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে মুফতী তাকী উসমানী ও মাওলানা সামীউল হক রচনা করেন। রেফারেন্স সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেন মাওলানা মুহাম্মদ হায়াত রহ. এবং মাওলানা আব্দুর রহীম আশআর। মুফতী মাহমুদ রহ. জাতীয় সংসদে তা পাঠ করে শুনান।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর পর জেনারেল যিয়াউল হক ক্ষমতাসীন হন। এ সময়েও কাদিয়ানীরা তাদের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাতে পরিবর্তন করার চেষ্টা চালায়। তখন মজলিসে তাহাফুফুযে খতমে নবুওয়তের জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ জালন্দরী রহ. জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মুফতী মাহমুদ রহ.-এর সাথে রাওয়ালপিণ্ডিতে সাক্ষাত করেন। মুফতী সাহেব রহ. পায়ে আঘাতজনিত কারণে সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মুফতী সাহেব রহ. জেনারেল যিয়াউল হকের নিকট টেলিফোনে বিষয়টি আলাপ করেন এবং তাকে সতর্ক করে দেন। ফলে কাদিয়ানীরা সফল হতে পারেনি।

খতমে নবুওয়ত আন্দোলন ১৯৮৪ সাল

জনাব ভূটোর সময়ের পোশকৃত সংশোধনীগুলিকে তখন আইন হিসেবে পরিণত করা হয়নি। জেনারেল যিয়াউল হকের সময় কাদিয়ানীরা সেই সংশোধনীগুলিকে বাতিল করার চক্রান্তে মেতে উঠে। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ. এবং মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ রহ., আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে ইহধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। সংকটময় এ সময় দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শের সন্তান হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ., জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রধান মাওলানা ফযলুর রহমান, মাওলানা মুফতী আহমদুর রহমান রহ., মাওলানা মুহাম্মদ আজমল খান, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আনোয়ার রহ., পীরে তরীকত মাওলানা আব্দুল করীম বীরশরীফ, মাওলানা ইউসুফ লুথিয়ানবী রহ., মাওলানা শরীফ জালন্দরী রহ., মাওলানা মিয়া সিরাজ আহমদ দিনপুরী, ড. আব্দুর রাজ্জাক ইস্কান্দার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার শহীদ রহ., মাওলানা যিয়াউল কাসেমী রহ., মাওলানা মনজুর আহমদ চিনিউটী রহ.সহ প্রমুখ উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হয়। ফলে কাদিয়ানী বিরোধী অর্ডিনেন্স পাশ করা হয়। এ অর্ডিনেন্স পাশের উপকার নিম্নরূপ:

১. কাদিয়ানীরা স্বীয় প্রধানকে আমিরুল মুমিনীন বলতে পারবে না।
২. কাদিয়ানীরা স্বীয় প্রধানকে খলিফাতুল মুসলিমীন বা খলিফাতুল মুমিনীন বলতে পারবে না।
৩. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কোন মুরিদকে সাহাবী বলা যাবে না।
৫. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর স্ত্রীর বেলায় উম্মুল মুমিনীন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।
৬. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মুরিদের ক্ষেত্রে রাযি আল্লাহ আনছ লেখা যাবে না।
৭. কাদিয়ানীরা নিজেদের উপাসনার স্থানকে মসজিদ বলতে পারবে না।
৮. কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান বলতে পারবে না।
৯. কাদিয়ানীরা নিজেদের ধর্মকে ইসলাম বলতে পারবে না।
১০. কাদিয়ানীরা নিজেদের ধর্মের প্রচার করতে পারবে না।
১১. কাদিয়ানীরা নিজেদের ধর্মের দাওয়াত দিতে পারবে না।
১২. কাদিয়ানীরা মুসলমানের ধর্মীয় আবেগকে ক্ষত করতে পারবে না।

১৩. কাদিয়ানীরা কোনভাবেই নিজেদেরকে মুসলমান গণ্য করতে পারবে না।

১৪. মোট কথা ইসলামী কোন পরিভাষা ব্যবহার করতে পারবে না।

মোকদ্দমা

এক. কাদিয়ানীরা ফেডারেল শরয়ী আদালতে এ আইনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে। আলমি মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের কেন্দ্রীয় আমির হযরত মাওলানা খাজা খান মুহাম্মদ রহ.-এর নির্দেশে উক্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য মাওলানা ইউসুফ লুথিয়ানবী রহ., মাওলানা জালন্দরী রহ., হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম আশআরের নেতৃত্বে উলামাদের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। তারা লাহোরে অবস্থান করেন। ১৯৮৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত শুনানী হয়। হযরত সাইয়্যিদ নফিস আল হোসাইনি এবং ড. আল্লামা খালেদ মাহমুদও উক্ত বোর্ডের সহায়তা করেন। এ মামলা ঐতিহাসিক ভাওয়ালপুরের মামলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ মামলাতেও আল্লাহ তাআলার দয়া-অনুকম্পা মুসলমানদের পক্ষে ছিল। ১৯৮৪ সালের ১২ আগস্ট মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। কাদিয়ানীদের রিট খারিজ করে দেয়া হয়। কুফরের পরাজয় হয়।

দুই. কাদিয়ানীরা এ রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল শরয়ী আদালতের আপিল ব্যাঞ্চ সুপ্রিট কোর্টে আপিল করে। আল্লাহর ফযলে ১৯৮৮ সালের ১২ জানুয়ারী সুপ্রিট কোর্টের ব্যাঞ্চ তাদের আপিল বাতিল করে দেয়। এমনভাবে কাদিয়ানীরা লাহোর, কোয়েটা, করাচি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। সর্বত্রই তারা হেরে যায়। অবশেষে কাদিয়ানীরা সকল মামলার আপিল সুপ্রিম কোর্ট অফ পাকিস্তানে নিয়ে যায়। উলামায়ে কেরাম সে আপিলেরও মোকাবেলা করেন। ১৯৯৩ সালের ৩ জানুয়ারী সুপ্রিম কোর্ট অফ পাকিস্তানের পাঁচজন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত ব্যাঞ্চ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে। এখানেও তারা হেরে যায়।

তিন. এ ধারাবাহিকতায় কাদিয়ানীরা আফ্রিকার জোহান্সবার্গে একটি মামলা দায়ের করে। সে মামলা মোকাবেলা করার জন্য হযরত মাওলানা তাকী উসমানী, হযরত মাওলানা যাইনুল আবেদীন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুথিয়ানবী রহ. মাওলানা আব্দুর রহীম আশআর, ড. আল্লামা খালেদ মাহমুদ, ড. মুহম্মদ আহমদ গাজী, মাওলানা মনজুর আহমদ চিনিউটি রহ.

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-১৩৩

মাওলানা মনজুর আহমদ আলী হোসাইনী সাউথ আফ্রিকা সফর করেন। সে মামলায়ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা হবার পর তাদের প্রধান মির্খা তাহের পাকিস্তান হতে লন্ডন চলে যায়। সেখানেও দারুল উলূমের আদর্শের সৈনিকরা তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছেন। ১৯৮৫ সাল হতে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত কন্ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উক্ত সম্মেলনে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, আরব, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হতে উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করে থাকেন। কাদিয়ানীদের প্রতিরোধে বৃটেনে খতমে নবুওয়তের অফিস খোলা হয়। আমরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাদিয়ানীদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে দারুল উলূম দেওবন্দের রুহানী সন্তানরাই কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রতিক্রিয়া

দারুল উলূম দেওবন্দের সূর্যসন্তানদের আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণের খেদমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবৃন্দের নিকট তুলে ধরা হল। উম্মতের ঐক্যবদ্ধ সহায়তায় যে সফলতা আসে তা এক নম্বরে নিম্নে প্রদত্ত হল।

এক. পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা দেয়া হয়। এ ছাড়াও প্রায় ত্রিশটি দেশে কাদিয়ানীদের কাফের, মুরতাদ, ইসলামের সীমা হতে খারিজ ঘোষণা করা হয়।

দুই. পাকিস্তানে খতমে নবুওয়ত আন্দোলন সফল হওয়ায় পৃথিবীর সর্বত্র তাদের কুফরী, মুনাফেকী প্রকাশ পেয়ে যায়। পৃথিবীর প্রতি অঞ্চলের মুসলমানরা কাদিয়ানীদের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়।

তিন. ভাওয়ালপুর থেকে মোরেশিশ, জোহান্সবার্গের আদালতও কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়।

চার. মজলিসে তাহাফুযে খতমে নবুওয়তের আন্দোলন কেবলমাত্র পাকিস্তানে নয়, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রকে কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্র হতে নিরাপদ থাকার জন্য সচেতন করে দেয়। বিশ্বের মুসলমানরা কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্রকারী এবং মুরতাদ ভাবতে শুরু করে। মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়।

পাঁচ. অসংখ্য লোক যারা কাদিয়ানীদের প্রতারণার শিকার হয়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদের নিকট কাদিয়ানীদের কুফর প্রকাশ পাবার পর তারা পুনরায় ইসলামে দিক্ষীত হয়।

ছয়. একটা সময় ছিল যে, মুসলিম যুবকরা চাকরীর প্রত্যাশায় কাদিয়ানীদের প্রতি দুর্বল হত। কারণ পাকিস্তানের উচ্চপদগুলো কাদিয়ানীদের দখলে ছিল। যার ফলে একদিকে তারা তাদের অধিগন্ত কর্মচারীদের নিকট কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার করত, অপর দিকে ভাল ভাল পদের জন্য কাদিয়ানী মতবাদে বিশ্বাসীদেরই নিয়োগ দিত। এভাবে মুসলিম যুবকরা তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হত। বহু যুবক ভাল চাকরীর প্রত্যাশায় কাদিয়ানী মতবাদের সমর্থক হয়ে যেত। এখনো বিভিন্ন পদে বহু কাদিয়ানী কর্মরত আছে। সে সবস্থানে মুসলমানদের তুলনায় তাদের সংখ্যা বেশী। এক সময় মুসলিম যুবকরা যে হিনমন্ত্যায় আক্রান্ত হতো, তা দূর হয়ে গিয়েছে।

সাত. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে নিয়ে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত রবওয়া মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা ছিল। সেখানে মুসলমানদের প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। এমনকি রেলওয়ে, পোষ্টাফিসের কর্মচারী হবার জন্য কাদিয়ানী হওয়া শর্ত ছিল। এখন আর সে অবস্থায় নেই। সেখানকার অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী মুসলমান। ১৯৭৫ সাল হতে মুসলমানদের নামায জামাতের সাথে আদায় হয়ে আসছে। মজলিসে তাহাফুফে খতমে নবুওয়ত মাদ্রাসা, মসজিদ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছে।

আট. কাদিয়ানীরা তাদের মৃতদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফনের জন্য চেষ্টা চালাত। বর্তমানে মুসলমানদের কবরস্থানে তাদের দাফন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

নয়. পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র, এবং সৈনিক নিয়োগের আবেদন পত্রে তাদের ধর্মীয় পরিচয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

দশ. পাকিস্তানে খতমে নবুওয়তের বিরুদ্ধে লেখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য।

এগার. সৌদী আরব, লিবিয়া এবং আরো কয়েকটি মুসলিম দেশে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাদেরকে কুফরীশক্তির চর মনে করা হয়।

বার. এক সময় পাকিস্তানে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়তের বিরুদ্ধে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিতে পারে না।

তের. কাদিয়ানীরা বিভিন্ন দেশে প্রপাগাণ্ডা চালাত যে, কাদিয়ানীরা পাকিস্তান শাসন করে এবং রবওয়া হচ্ছে রাজধানী। এ মিথ্যা প্রচারের কারণে তারা কেবল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে লাক্ষিতই হয়নি; বরং তাদের জন্য আল্লাহর যমিন সংকীর্ণ হয়ে আসে। এমনকি কাদিয়ানী প্রধান লন্ডনেও শান্তিতে নেই। রবওয়ার নাম পরিবর্তন করে চুনাবনগর রাখা হয়েছে। আজকে কাদিয়ানীদের শহরের নাম মুছে গিয়েছে। ইনশাআল্লাহ একদিন তারাও অস্থত্বহীন হয়ে যাবে।

হায়াতে ঈসা আ.

প্রশ্ন নম্বর এক

সায়্যিদিনা হযরত ঈসা আ.-এর পবিত্র জীবন সম্পর্কে ইসলাম, ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং কাদিয়ানী ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করুন।

উত্তর

হযরত ঈসা আ.-এর পবিত্র জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের ন্যায় ঈসা আ.-এর পবিত্র জীবন, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া এবং তাঁর অবতরণের বিষয়টিও ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার অন্তর্ভুক্ত। যা কুরআনের অকাট্য বর্ণনা, বিশুদ্ধ হাদীস এবং উম্মতের ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে ইসলামী আকীদা হল, তিনি মরীয়ম আ. গর্বে জিব্রাইল আ.-এর ফুয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর বনী ইস্রাইলের সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরিত হন। ইহুদীরা তাঁর সাথে হিংসা, শত্রুতামূলক আচরণ করে। পরবর্তীতে যখন তারা তাকে হত্যার হীন প্রচেষ্টা চালায়, আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁকে জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে যখন দাজ্জাল এসে গোটা দুনিয়ায় বিশৃংখলা, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে, তখন হযরত ঈসা আ. কিয়ামতের একটি বড় নিদর্শন হিসেবে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং দাজ্জাল কে হত্যা করবেন। পৃথিবীতে তাঁর অবস্থান একজন ন্যায়পরায়ন ইমাম হিসেবে হবে। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হবেন।

কুরআন-হাদীসের (ইসলামী শরীয়ত) ওপর নিজেও আমল করবেন এবং জনসাধারণকেও সে মোতাবেক জীবন-যাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। তাঁর সময়ে (যা এ উম্মতের শেষ যুগ হবে) ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম থাকবে না। পৃথিবীতে কোন কাফের-অমুসলিম থাকবে না। খেরাজ, কর কিছুই আদায় করা হবে না। মানুষ এতো পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হবে যে, অনুদান গ্রহণের কাউকে পাওয়া যাবে না।

হযরত ঈসা আ. পৃথিবীতে আগমন করার পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তাঁর থেকে সন্তানও জন্মগ্রহণ করবে। এক সময় তিনি ইন্তিকাল করবেন। মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায পড়ার পর তাঁকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার পাশে দাফন করবে। এ সব কিছুই পরম্পরায় বর্ণিত বিগুহ্ন হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। এজাতীয় হাদীসের সংখ্যা শতেরও অধিক হবে।

ইসলামী আকিদার গুরুত্বপূর্ণ দফা

১, হযরত ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রসূল। মানুষের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। পূর্বের ঐশি কিতাবগুলোতে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি সত্য নবী হিসেবে একবার পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন।

২, তিনি ইহুদীদের সকল প্রকার নাপাক ষড়যন্ত্র হতে নিরাপদ।

৩, তাঁকে স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

৪, তিনি আকাশে জীবিত আছেন।

৫, কিয়ামতের বৃহৎ নিদর্শন হিসেবে তিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন। তিনি হেদায়েতের মসীহ হিসেবে আগমন করে গোমরাহীর মসীহ (দাজ্জাল) কে হত্যা করবেন। তার পরিবর্তে মসীহ নাম ধারণ করে কেউ পৃথিবীতে আগমন করবে না।

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে ইহুদীদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইহুদীদের আকীদা হল হেদায়েতের মসীহ এখনো আগমন করেননি। ঈসা ইবনে মরীয়ম নামে যে ব্যক্তি নিজেকে মসীহ এবং আল্লাহর রসূল দাবী করেছেন, সে জাদুগর এবং মিথ্যা নবীর দাবীদার ছিল। নাউযুবিল্লাহ। তাইতো ইহুদীরা তাঁর সাথে বিদ্বেষ এবং শত্রুতামূলক আচরণ করে। তাঁকে হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইহুদীদের দাবী তারা এ কাজে সফল হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله

“আর তাদের উক্তিতে আমরা আল্লাহর রসূল মসীহ ঈসা ইবনে মরীয়ম কে হত্যা করেছি।” -সূরা নিসা-১৫৭

ঈসা ইবনে মরীয়মের হত্যায় বিষয়ে সকল ইহুদী ঐক্যমত। কিন্তু তাদেরই একদলের দাবী হল হত্যা করার পর লাঞ্চিত এবং তা প্রচার করার জন্য তাকে সুলিতে বিদ্ধ করা হয়। অপর একটি দলের দাবী হল সুলিতে চারটি পেরাণ দ্বারা বিদ্ধ করার পর তাকে হত্যা করা হয়। (মোহাযারা ইলমিয়া নম্বর ৪, পৃঃ ৪, লেখক হযরত কারী মুহাম্মদ উসমান)

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গী

খ্রীষ্টানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস হল হেদায়েতের মসীহ আগমন করেছেন এবং তিনিই হলেন হযরত ঈসা ইবনে মরীয়ম। অতঃপর তারা দু’দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

এক, বড় অংশের দাবী হল ইহুদীরা তাকে হত্যা করেছে। সুলিবিদ্ধ করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে জীবিত করে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। সুলিবিদ্ধ করার দ্বারা খ্রীষ্টানদের গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে গিয়েছে। এ কারণে খ্রীষ্টান ক্রোশের পূজা করে থাকে।

দুই, দ্বিতীয় দলের বক্তব্য হল হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ ব্যতীতই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

উভয় গ্রুপ এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, হেদায়েতের মসীহ কিয়ামত দিবসে জড়পদার্থ এবং ভগবৎ প্রকৃতির অবয়বে আল্লাহ হিসেবে আগমন করবেন। তিনি সৃষ্টি জীবের হিসাবও নিবেন।

মোটকথা ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের অধিকাংশের মতে হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যু সুলিবিদ্ধ অবস্থায় হয়েছে। ইহুদী এ খ্রীষ্টানরা একজন হেদায়েতের মসীহর অপেক্ষায় ছিল। ইহুদীদের মতে এখন পর্যন্ত সে সুসংবাদ পূর্ণ হয়নি। আর খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস হল হযরত ঈসা আ. কিয়ামত দিবসে সৃষ্টির বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য খোদার আকারে আসবেন। -মোহাযারা ইলমিয়া নম্বর-৪, পৃ. ৪

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

মির্য়া গোলাম আহমদ কায়িনী “এযালায়ে আওহাম”, “তোহফায়ে গ্লোরিয়া” “নুযুলে মসীহ আওর হাকিকাতুল ওহী” গ্রন্থে এ বিষয়ে যা

লিখেছে, তার সারাংশ মির্যা বশীর এম এ স্বীয় রচিত গ্রন্থ “হাকিকী ইসলামে” উল্লেখ করেছে। সে লিখে :

এ আলোচনায় আমি (মির্যা কাদিয়ানী) নিজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখি।

১, মসীহ নাসেরী অন্যান্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ। যিনি দুশমনের ষড়যন্ত্রের ফলে অবশ্যই সুলিবিদ্ধ হন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে অভিসপ্ত এ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এরপর গোপনে তিনি নিজ দেশ হতে হিজরত করেন।

২, নিজ দেশ হতে বের হয়ে হযরত মসীহ ধীরে ধীরে সফর করে কাশ্মিরে পৌঁছেন। এখানে তার মৃত্যু হয়। (৮৭ বছরের পর) এখানেই তার সমাধি রয়েছে। (শ্রীমগরের খান ইয়ার মহল্লায়)

৩, কোন মানব সদস্য মানব দেহ নিয়ে আকাশে যেতে পারে না। তাই মসীহর জীবিত আকাশে যাবার ধারণা মিথ্যা।

৪, নিঃসন্দেহে মসীহর দ্বিতীয়বার আগমনের ওয়াদা ছিল। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মসীহর অনুরূপ অপর মসীহ। স্বয়ং মসীহ নয়।

৫, এক অনুরূপ মসীহর আগমনের ওয়াদা নিজের (মির্যা কাদিয়ানী) অস্তিত্বের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যার হাতে দুনিয়ায় সত্যের বিজয় নির্ধারিত। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী শপথ করে লিখে:

“আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ। যার সুসংবাদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে প্রদান করেছেন। যেমন, সহীহ বুখারী, মুসলিম, এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ হয়েছে। وكفى بالله شهيدا” -হাকিকী ইসলাম পৃ. ২৯, ৩০

প্রশ্ন নম্বর দুই

মুসলমানদের বিশ্বাস হল আল্লাহ পাক হযরত ঈসা আ. কে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিয়টি প্রমাণ করুন।

উত্তর

হযরত ঈসা আ.কে স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। নিম্নে এর দলীলগুলো পেশ করা হল।

اذ قال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فاحكم بينكم
فيما كنتم فيه تختلفون ○

“স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! অবশ্যই আমি তোমার
কালপূর্ণ করব, তোমাকে আমার দিকে তুলে নিব এবং যারা কুফরী করেছে
তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র ও মুক্ত করব। আর যারা প্রকৃতভাবে
তোমার অনুসরণ করবে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের আমি কাফেরদের ওপর
স্থান দেব। অতঃপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন
যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার মীমাংসা
করে দেব।” -সূরা আলে ইমরান-৫৫

উক্ত আয়াতের সাথে সংযুক্ত পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,
তারা ষড়যন্ত্র করল, আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করলেন। আর আল্লাহ
হলেন সর্বোত্তম কৌশলী। এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কথা
বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা মুফাস্সিরগণ উত্তমরূপে করেছেন। ইহুদীরা যখন
হযরত ঈসা আ. কে হত্যা করার জন্য তাঁর আবাসস্থল অবরুদ্ধ করে
ফেলে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেন এবং তার শত্রু
ক্ষতিগ্রস্ত হবার সুসংবাদ তাঁকে দিয়ে প্রশান্তি দান করেন। হযরত ঈসা
আ.-এর সাথে এ বিষয়ে চারটি অঙ্গীকার করা হয়।

- ১, আমি তোমাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ে নিব।
- ২, তোমাকে নিজের দিকে (আকাশে) উঠিয়ে নিব।
- ৩, তোমাকে কাফেরের (ইহুদী) ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করব।
- ৪, তোমার অনুসারীদেরকে তোমার দূশমনের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত
বিজয়ী করব।

এ চারটি বিষয়ের অঙ্গীকার এজন্য করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা নিম্নরূপ
ষড়যন্ত্র করেছিল।

- ১, হযরত ঈসা আ. কে গ্রেফতার করবে।
- ২, তাঁকে কঠিন শাস্তি দিয়ে হত্যা করবে।
- ৩, তাঁকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করবে।
- ৪, এর মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে ধ্বংস করে দিবে এবং তাঁর কোন অনুসারী
অবশিষ্ট থাকবে না।

তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,

১, গ্রেফতারের মোকাবেলায় বলেন, متوفيك “আমি তোমাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ে নিব।” তুমি আমার হেফাযতে থাকবে।

২, কষ্ট দেয়া এবং হত্যা করার মোকাবেলায় বলেন, رافعك الى “তোমাকে আকাশে উঠিয়ে নিব।”

৩, অপমান এবং লাঞ্ছনার মোকাবেলায় বলেন, مطهرك من الذين “আমি তোমাকে ইহুদীদের লাঞ্ছনা হতে পবিত্র রাখব”, তারা অপমান, লাঞ্ছনার সুযোগই পাবে না।

৪, তার দ্বীন কে ধ্বংস করার মোকাবেলায় বলেন, جاعل الذين اتبعوك “তোমাকে উঠিয়ে নেবার পর তোমার অনুসারীদেরকে অবিশ্বাসীদের ওপর বিজয় দান করব।”

توفى এর অর্থ

প্রথম অঙ্গীকার হল توفى। এর মূল অক্ষর হল ف-و-যার অর্থ পূর্ণ করা। আরবের লোকেরা এরূপ বলে থাকে وفى بعده অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করল। (লিসানুল আরব) باب تفعل থেকে এর অর্থ হবে اخذ অর্থাৎ কোন জিনিষকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা। (বায়যাবী) توفى হল جنس পর্যায়ে। যার দ্বারা মৃত্যু, নিদ্রা, স্বশরীরে উঠিয়ে নেয়া সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং ইমাম রাযী রহ. বলেন, “আল্লাহ তাআলার ঘোষণা انى متوفيك কেবল توفى-এর অর্জনের ওপর প্রমাণ বহন করে। এটি একটি جنس। এর অধিনে কয়েক প্রকার অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুও হতে পারে। আবার আকাশে উঠিয়ে নেয়ার অর্থও হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এরপরে رافعك الى বলেছেন, তাই এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট। আর তা হচ্ছে আকাশে উঠিয়ে নেয়া।” -তাকসীরে কবীর খ. ৮, পৃ. ৭২

এটি স্বীকৃত নীতিমালা যে, কোন শব্দের جنس বলে তার বিশেষ প্রকার উদ্দেশ্য নেয়ার জন্য কোন ইঙ্গিত পাওয়া জরুরী। তাই এখানে

توفى-র অর্থ স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার একটি ইঙ্গিত হল - এর সাথে সাথেই رافع বলা হয়েছে। رفع-র অর্থ উপরে উঠিয়ে নেয়া। কেননা رفع শব্দটি وضع এবং خفض এর বিপরিত। যার অর্থ হচ্ছে नीচে রাখা, नीচু করা। দ্বিতীয় ইঙ্গিত হচ্ছে ومطهرک من الذین کفروا (অর্থ তোমাকে কাফেরদের থেকে পবিত্র রাখব)। কেননা, পবিত্র রাখার উদ্দেশ্য হল কাফেরের (ইহুদী) নাপাক হস্ত হতে তোমাকে রক্ষা করব। ইবনে জুরাইজ রহ. হতে মুহাদ্দিস ইবনে জারীর রহ. বর্ণনা করেন, “আল্লাহ তাআলার ঘোষণা متوفیک এর ব্যাখ্যা হল, হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহ তাআলা নিজর নিকট উঠিয়ে নেয়াই হচ্ছে توفى এবং এরই মাধ্যমে কাফেরদের হাত থেকে পবিত্র রাখা।”-তাকসীরে ইবনে জারীর খ. ৩, পৃ. ২৯০

তৃতীয় ইঙ্গিত হল হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর বর্ণনা। যা ইমাম বায়হাকী রহ. উল্লেখ করেছেন। তাতে আকাশ হতে অবতরণের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم.

-কিতাবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত লিলবাইহাকী পৃ. ২০৩

অবতরণের পূর্বে উত্তোলন পাওয়া যেতে হবে। তদ্রূপভাবে توفى শব্দটি দ্বারা মৃত্যু অর্থ বুঝানোর জন্যও পূর্বাপর ইঙ্গিত পাওয়া জরুরী। যেমন,

قل يتوفكم ملك الموت الذى وكل بكم

“আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ সংহার করবে।” -সূরা সাজদা ১১

উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত হল ‘মালাকুলমউত’ তথা মৃত্যুদায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও ইঙ্গিতের সাথে توفى-এর অর্থ মৃত্যু এসেছে। কেননা, মৃত্যুর মাধ্যমেও পুরোপুরি পাকরাও হয়। এমনিভাবে توفى নিদ্রার অর্থেও ব্যবহার হয়। তবে এর জন্য ইঙ্গিত

পাওয়াও জরুরী। যেমন بالليل يتوفىكم “আর তিনি রাত্রিকালে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটান।” -সূরা আনআম ৬০

এখানে توفي দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিদ্রা। এটিও توفي -এর একটি প্রকার। ভাষা অলংকার শাস্ত্রবীদদের নীতিমালার আলোকেই এতোক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা توفي -এর অর্থ “মৃত্যু” রূহ কবযা করা নিয়ে থাকে। সুতরাং কুল্লিয়াতে আবুল বাকায় উল্লেখ হয়েছে,

التوفى الامامة وقبض الروح وعليه استعمال العامة او الاستيفاء واخذ الحق وعليه استعمال البلغاء.

সাধারণ লোকেরা توفي কে মৃত্যু এবং রূহ সংহারের অর্থে ব্যবহার করে থাকে। অলংকার শাস্ত্রবীদরা পরিপূর্ণ অর্জন করা এবং অধিকার গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহার করে। -কুল্লিয়াতে আবুল বাকা ১২৯

আলোচ্য আয়াতে পূর্বাপর ইস্তিতের দ্বারা توفي -এর অর্থ কাযা এবং পরিপূর্ণ অর্থাৎ রূহের সাথে দেহকেও উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মৃত্যুর অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তবে হ্যাঁ! নিদ্রা অবস্থায় রূহের নিয়ন্ত্রণের অর্থও নেয়া যেতে পারে। রূহের কবযা দু'ভাবে হতে পারে।

এক. قبض مع الامساك অর্থাৎ স্থায়ীভাবে রূহকে রেখে দেয়া।

দুই. قبض مع الارسال অর্থাৎ সাময়িক নিয়ন্ত্রণ, পুনরায় ফেরৎ দেয়া।

উক্ত আয়াতে رافعك الى -এর ইস্তিতের কারণে توفي -এর অর্থ নিদ্রাও হতে পারে। আর এটি আমাদের দাবীরও খেলাফ হবে না। কেননা, নিদ্রা এবং স্বশরীরে উঠিয়ে নেয়া এক সাথে পাওয়া সম্ভব। তাই একদল মুফাস্সির توفي -এর অর্থ নিদ্রাও নিয়েছেন।

উত্তর - ২

وما قتلوا يقيننا بل رفعه الله اليه

“আর তারা তাকে হত্যা করেনি একথা নিশ্চিত। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন।” -সূরা নিসা ১৫৭-১৫৮

ইহুদী কর্তৃক অবরুদ্ধ হবার পর হযরত ঈসা আ. কে স্বশরীরে জীবিত উঠিয়ে নেয়ার যে অঙ্গীকার আল্লাহর পক্ষ হতে করা হয়েছে, তা পূর্ণ করার ঘোষণা এ আয়াতের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

رفع শব্দের বিশ্লেষণ

رفع-এর শাব্দিক অর্থ উপরে উঠিয়ে নেয়া। আল মেসবাহুল মুনীরে উল্লেখ হয়েছে رفع দেহের সাথে সংযুক্ত হলে এর অর্থ হবে নড়াচড়া এবং স্থানান্তর। আর ভাবার্থ হবে স্থানানুযায়ী। -আল মেসবাহুল ইলাহীয়া পৃ. ১৩৯

এ থেকে জানা গেল যে, رفع প্রকৃত অর্থ হল যখন তা দেহের সাথে সম্পৃক্ত হবে, তখন এর অর্থ হবে নীচ হতে নড়াচড়া করে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। পরিভাষায় এরূপ অর্থের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত যয়নব রাযি.-এর সাহেববাদার ইত্তিকাল প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:

رفع الى الرسول ﷺ الصبي

“ঐ ছেলেকে (দৌহিত্র) নিজের দিকে উঠিয়ে নিলেন।” -মেশকাত পৃ. ১৫

আরবীভাষীরা বলে رفعت الزرع الى البيدر অর্থ আমি ফসল কেটে গোলায় উঠিয়ে রাখব। -আল কামুস, আসাসুল বালাগাত

رفع الله بهل তে আত্মার সাথে দেহের উত্তোলন উদ্দেশ্য। এটাই এর প্রকৃত অর্থ। কেননা, ৪ (হু) সর্বনাম দ্বারা হযরত ঈসাই আ. উদ্দেশ্য। আর ঈসা বলতে দেহ এবং আত্মা উভয়কে বুঝায়। কেবল রুহ তথা আত্মাকে নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ورفع ابيه على العرش “ইউসুফ তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে উঠালেন।” -সূরা ইউসুফ-১০০

আবার কখনো কখনো ইঙ্গিত পাওয়া যাবার কারণে رفع শব্দটির রূপক অর্থও উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে। যেমন رفع অর্থ মর্যাদা। রূপক অর্থ

উদ্দেশ্য নেয়ার সময় প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না। কেননা, নিয়ম হল প্রকৃত এবং রূপক অর্থ এক সাথে উদ্দেশ্য নেয়া বৈধ নয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات

“তাদের একজন কে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।” -সূরা যুখরুফ-৩২

رفع الله তে رفع শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেয়ার মাঝে না কোন প্রতিবন্ধকতা আছে না কোন নিয়মের খেলাফ হবে। এখানে কেবল رفع منزلت অর্থাৎ মর্যাদা বৃদ্ধি অর্থ নেয়া যাবে না। হযরত ঈসা আ. কে স্বশরীরে উঠিয়ে নেয়ার পক্ষে কেবল মাত্র একটি আয়াতই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কুরআন মজীদে দু’স্থানে তাঁর স্বশরীরে উঠিয়ে নেয়াকে رفع শব্দের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু অনভিজ্ঞ, মূর্খ কাদিয়ানীরা বলে থাকে কুরআনের কোন আয়াত এমন নেই, যার দ্বারা হযরত ঈসা আ. জীবিত স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পক্ষে প্রমাণ বহন করে। অথচ উল্লিখিত আয়াত দু’টি ব্যতীত অনেক আয়াত দ্বারা স্বশরীরে হযরত ঈসা আ.-কে উঠিয়ে নেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন,

১. “আর আহলে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে ঈসার প্রতি ঈমান আনবে। আর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।” -সূরা নিসা-১৫৯

২. “আর ঈসা তো কেয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং তোমরা তাতে সন্দেহ কর না এবং আমার অনুকরণ কর। এটাই সরল সঠিক পথ।” -সূরা যুখরুফ-৬১

৩. “সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং প্রাপ্ত বয়সেও এবং সে হবে নেককারদের অন্যতম।” -সূরা আলে ইমরান-৪৬

হাদীস দ্বারা হযরত ঈসা আ.-এর অবতীর্ণের প্রমাণ

হাদীস -১

عن النّوأس بن السمعان قال قال رسول الله ﷺ اذ ابعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين الى آخره فيطلبه حتى يدركه بباب لدفيقتله.

“হযরত নাওয়াস রাযি. বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আ.-কে দামিশকের জামে মসজিদের পূর্বদিকের সাদা মিনারে প্রেরণ করবেন। তাঁর পরিধানে থাকবে দু’টি হলুদ বর্ণের চাদর। হস্তদ্বয় দু’ফেরেশতার কাঁধে থাকবে। অতঃপর দাজ্জালের অনুসন্ধানে বের হবেন। তিনি দাজ্জালকে লুদ দরবার নিকট পাবেন এবং হত্যা করবেন।” -মুসলিম খ. ২, পৃ. ৪০১

উক্ত হাদীসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মুখের বাতাস দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত পৌছবে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় কাফের মারা যাবে।

হাদীস - ২

عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم من السماء امامكم منكم.

“হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি রূপই না আনন্দিত হবে, যখন ঈসা ইবনে মরীয়ম তোমাদের মাঝে আকাশ হতে প্রেরিত হবেন। আর তোমাদের ঈমাম তোমাদের মধ্যে হতে হবে।” (ইমাম মাহদী তোমাদের ইমাম হবেন। হযরত ঈসা আ. নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ইমামতিতে নামায পড়বেন। কিতাবুল আসমা ওয়াসসিফাত নিল বায়হাকী পৃ. ৩০১)

সতর্কবাণী - ১: উক্ত হাদীসে আকাশ হতে কথাটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সতর্কবাণী - ২: উক্ত হাদীস হতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মাহদী এবং হযরত ঈসা আ. দু’জন পৃথক পৃথক হবেন।

قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا همام انبأنا قتادة عن عبد الرحمن عن ابى هريرة ان النبى ﷺ قال الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شئ ودينهم واحد وانى اولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبى بينى وبينه وأنه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران ان كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل قيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزبة ويدعو الناس الى الاسلام ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترفع اسود مع الابل والتمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون.

“হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. স্বীয় মসনদে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল নবী হলেন বৈমাত্রিক ভাই। মা ভিন্ন ভিন্ন অর্থাতঃ শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন, আর ধীন হচ্ছে অভিন্ন। আমি ঈসা আ.-এর সর্বাধিক নিকটতম। কেননা, আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। তিনি অবতরণ করবেন। দেখা মাত্রই তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে। মধ্যমাকৃতির হবেন। শুভ্র এবং লালিমা মিশ্রিত বর্ণের অধিকারী হবেন। তাঁর দেহে দু’রঙের বস্ত্র হবে। মাথা থেকে পানির ফোটা ঝড়তে থাকবে। কিন্তু কোন প্রকারের আদ্রতা অনুভূত হবে না। ক্রোশ ধ্বংস করবেন। শুকর হত্যা করবেন। কর প্রথা উঠিয়ে দিবেন। সকলকে ইসলামের পথে আহবান করবেন। তাঁর সময়ে আল্লাহ তাআলা ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্মকে ধ্বংস করে দিবেন। দাজ্জালকে আল্লাহ তাআলা তাঁর সময়ে হত্যা করবেন। অতঃপর পৃথিবীতে এমন প্রশান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে, বাঘ এবং উট, চিতা এবং গরু, নেকড়ে এবং বকরী একসাথে মাঠে বিচরণ করবে। স্বর্প এবং শিশুরা একত্রে খেলবে। সাপ তাদের কোন ক্ষতি করবে না। ঈসা আ. দুনিয়াতে চল্লিশ বছর অবস্থান করে মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায পড়বে।” -ফতহুলবারী খঃ ৬, পৃঃ ৩৫৭

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীতে বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যু হয়নি। আকাশ হতে অবতরণের পর কিয়ামতের পূর্বে নিদর্শনাবলী যখন প্রকাশ পাবে, তখন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

হাদীস - ৪

عن الحسن (مرسلا) قال قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسى لم يموت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة.

“ইমাম হাসান বসরী হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের উদ্দেশে বলেছেন, হযরত ঈসা আ. এখনো মৃত্যুবরণ করেননি, জীবিত আছেন। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তোমাদের নিকট প্রকাশ পাবেন।” -আখরাজাহ ইবনে কাসীর ফি তাফসীরে আলে ইমরান খঃ ১, পৃঃ ৩৬৬

হাদীস - ৫

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسى بن مريم الى الارض. فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين ابى بكر وعمر.

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈসা আ. পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তিনি বিবাহ করবেন। তাঁর সন্তান হবে। তিনি পৃথিবীতে ৪৫ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন। আমার কবরেই দাফন করা হবে। কিয়ামত দিবসে আমি ঈসা ইবনে মরীয়মের সাথে আবু বকর ও উমরের মধ্যবর্তী কবর হতে উঠব।” -বুখারী পৃ. ১৭৭, মিশকাত পৃ. ৪৮০

হাদীস - ৬

রবী হতে আলে হুইয়্যুম - آلم الله لا اله الا الله هو الحى القيوم -এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, নাজরানের খ্রীষ্টানরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করে।

খ্রীষ্টানরা বলল, (ঈসা আ. যদি আল্লাহর পুত্র না হোন) তাহলে তাঁর পিতা কে? অথচ তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই। স্ত্রী এবং সন্তান হতে পবিত্র। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাল করেই জানা আছে যে, পুত্র পিতার সদৃশ্য হয়ে থাকে। তারা বলল, অবশ্যই এমনই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যখন একথা স্বীকার করে নিল যে, পুত্র পিতার সদৃশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এর ভিত্তিতে হযরত মসীহও আল্লাহর সদৃশ্য হওয়া চাই। অথচ সকলের জানা যে, তার কোন সমতুল্য নেই। তাঁর অনুরূপ কেউ নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান না আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব, সদা বিরাজমান, তাঁর কোন মৃত্যু নেই। অথচ ঈসা আ.-এর মৃত্যু অবধারিত। খ্রীষ্টানরা বলল, হ্যাঁ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি অবগত নও যে, আমাদের প্রতিপালক প্রতিটি সৃষ্টি বস্তুকে স্থিরভাবে স্বস্থানে রেখে সঠিকভাবে পরিচালনা করছেন, রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। নিয়মিতভাবে আহার প্রদান করাচ্ছেন। তারা উত্তরে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, ঈসা আ. কি এ সব করতে সক্ষম? উত্তরে তারা বলল, না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, আসমান-যমিনের কোন বস্তুই আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বইরে নয়। খ্রীষ্টানরা বলল, নিশ্চয়। তিনি বললেন, ঈসা আঃ কে যা জানানো হয়েছে এর অতিরিক্ত বিষয়ে কি তিনি জ্ঞান রাখেন। খ্রীষ্টানরা বলল, না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি অবগত নও যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী হযরত ঈসা আ. কে মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেছেন? খ্রীষ্টানরা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি অবগত নও যে, আমাদের প্রতিপালক না আহার করেন, না পান করেন। তিনি পেশাব-পায়খানাও করেন না। খ্রীষ্টানরা বলল, হ্যাঁ! অবশ্যই।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি অবগত নও যে, ঈসা আ.কে নারীজাতি গর্ভধারণ করেছে, যেমন অন্যান্য নারীরা গর্ভধারণ করে থাকে এবং তাকে প্রসব করেছেন, যেমন অন্যান্য নারীরা তাদের সন্তান প্রসব করে থাকে। তিনি অন্যান্য শিশুদের ন্যায় আহার্য গ্রহণ করেছেন। পানাহারও করেছেন। প্রস্রাব-পায়খানাও করেছেন। খ্রীষ্টানরা বলল, হ্যাঁ।

অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঈসা আ. কিভাবে খোদা বা খোদার পুত্র কিংবা তিনজনের একজন খোদা হতে পারেন? খ্রীস্টানরা সত্যের পরিচয় পেল; কিন্তু পার্থিব মোহে তারা সত্যকে অস্বীকার করল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেন **الم الله لا اله الا هو الحي القيوم** -তাকসীরে ইবনে জারীর খ. ৩, পৃ.১ ৬৩

একটি জরুরী সতর্কবাণী

উল্লিখিত হাদীস এবং বর্ণনাগুলো থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যে, হাদীসে যে মসীহর অবতরণের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তিনি হলেন, কুরআনে বর্ণিত সেই মসীহ, যিনি হযরত মরীয়ম আ.-এর গর্ভে পিতৃশূণ্য জিবরাইলের ফুঁকের মাধ্যমে জনগ্রহণ করেছেন। যাঁর ওপর আল্লাহ তাআলা ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেন। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে মসীহর সদৃশ্য অবতরণ দ্বারা অন্য কেউ উদ্দেশ্য নয়। যদি মসীহর সদৃশ্যের অবতরণ উদ্দেশ্য নেয়া হত, তবে আয়াতের দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু হুরায়রা রাযি.-এর প্রমাণ পেশ করার কি উদ্দেশ্য? (মাআযাল্লাহ) হাদীসে অবতরণ দ্বারা মসীহর সদৃশ্য কিংবা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী উদ্দেশ্য হত, তবে কুরআনের যেখানেই মসীহর উল্লেখ এসেছে, সর্বত্রই সদৃশ্য মসীহ এবং মিথ্যা কাদিয়ানী উদ্দেশ্য হওয়া বাধ্যতামূলক হতো। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসীহর অবতরণের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে উক্ত আয়াতকে পাঠ করা এ কথারই সুস্পষ্ট দলীল যে, তাঁর উদ্দেশ্য মসীহ ইবনে মরীয়মেরই অবতরণের সংবাদ প্রদান করা। এ আয়াত দ্বারা অন্য কোন মসীহ উদ্দেশ্য নয়। ইমাম বুখারী রহ.সহ অন্যান্য হাদীসের ইমামগণের মসীহর অবতরণের হাদীসের সাথে সূরা আলে ইমরান ও সূরা নিসার আয়াত উল্লেখ করা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, হাদীসে ঐ মসীহ ইবনে মরীয়মের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে **توفى** (উঠিয়ে নেয়া হবে) এবং **رفع الى السماء** (আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে) বলা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে অপর কোন মসীহর কথা বলা হয়নি। অভিনু মসীহর কথা বলা হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। আর তিনি হলেন

হযরত মসীহ ঈসা ইবনে মরীয়ম আ.। যিনি কিয়ামতের পূর্বক্ষণে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মসীহ হবার দাবী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, প্রতারণা, ধোকা বৈ কিছু নয়।

প্রয়োজনীয় নোট

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হযরত ঈসা আ.-এর অবতীর্ণ হবার সম্পর্কে শয়ের অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার সবই ইমামুল আসর আল্লামা সাইয়িদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. التصريح بما تواتر في نزول المسيح নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীসসম্ভার হতে মাত্র ছয়টি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হল। এগুলো কাদিয়ানীদের দাবীকে খণ্ডন করে থাকে।

১. প্রথম হাদীসে ঈসা আ. দামিশকের পূর্ব মিনারে অবতরণ, ফেরেশতাদের ওপর হাত রেখে অবতরণ এবং বাবে লুদে (ফিলিস্তিনের একটি গ্রাম) দাজ্জালকে হত্যা করার কথা উল্লেখ হয়েছে।

২. দ্বিতীয় হাদীসে সুম্পষ্ট ভাষায় হযরত ঈসা আ.-এর আকাশ হতে অবতরণের কথা বলা হয়েছে।

৩. তৃতীয় হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈসা ইবনে মরীয়ম আ. এবং আমার মাঝে কোন নবী আসবেন না। একমাত্র তিনিই আগমন করবে।

৪. চতুর্থ হাদীসে لم يموت এবং رجوع সুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

৫. পঞ্চম হাদীসে জমিনে অবতরণ করার কথাও বলা হয়েছে।

৬. ষষ্ঠ হাদীসে ياتي عليه الفناء এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

একটি চ্যালেঞ্জ

হাদীসের কিতাবগুলোতে তো ঈসা আ.-এর অবতরণের কথা বলা হয়েছে। কাদিয়ানীরা একটি হাদীসই দেখাক তো, যাতে ঈসার মৃত্যুর সংবাদ রয়েছে।

প্রশ্ন নম্বর তিন

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়তের দাবী করার পর কেন ঈসা মসীহর জীবন নিয়ে বিতর্ক করল। এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলুন।

উত্তর

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী শুরু যমানায় নিজেই হায়াতে ঈসা.-এর দাবীদার ছিল। কুরআন মজীদে আয়াত দ্বারা মসীহ আ.-এর হায়াতের দলীল প্রদান করত। “هو الذي ارسل رسوله) (এ আয়াত শারীরিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির আলোকে হযরত মসীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। দ্বীন ইসলামের যে পরিপূর্ণ বিজয় অঙ্গীকার করা হয়েছে, সে বিজয় মসীহর মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যখন হযরত মসীহ আ. দ্বিতীয়বার এ পৃথিবীতে তাশরিফ আনবেন, তখন তার হাতে দ্বীন ইসলাম দিগবেদিগ বিস্তার লাভ করবে।” -রুহানী খাযায়েন খ. ১ পৃ. ৫৯৩

মির্য়া কাদিয়ানী প্রথম দিকে ঈসা মসীহর জীবিত থাকার দাবীদার ছিল। কিন্তু নবুওয়তের দাবী করতে গিয়ে সে বিভিন্ন সময়ে নানাহ দাবী করে বসে। প্রথমে ইসলামের সেবক, পরে মুবাল্লিগে ইসলাম, মামুর মিনাল্লাহ, মুজাদ্দিদ হবার দাবী করে। তার মূল টার্গেট ছিল নবুওয়ত প্রাপ্তির দাবী করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে মসীর সদৃশ্য হবার দাবী করে। মসীহ দাবী করার পথে প্রতিবন্ধক ছিল মসীহ জীবিত থাকার আকীদা। এ প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার জন্য মসীহর মৃত্যু হবার ধারণার জন্ম দেয়। অতঃপর বলে যে, হাদীস দ্বারা মসীহ আগমনের কথা প্রমাণিত, তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। তাই তার স্থলে আমি মসীহর সদৃশ্য হয়েই এসেছি। আমি তার থেকে উত্তম। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি হল:

این مریم کے ذکر کو چھوڑو ☆ اس سے بہتر غلام احمد ہے

“ইবনে মরীয়মের আলোচনা পরিত্যাগ কর, তার হতে উত্তম গোলাম আহমদ।” -দাফেউল বালা পৃ. ২৪, রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২৪০

মির্য়া যখন তার ভ্রান্ত ধারণানুযায়ী মসীহ হয়ে যায়, তখন সে বলল, মসীহ আ.নবী ছিলেন। এখন দ্বিতীয় মসীহ (মির্য়া কাদিয়ানী) যেহেতু তার

থেকে উত্তম, তাই সে কেন নবী হবে না? সুতরাং আমি হলাম নবী। এভাবেই সে প্রতারণার আশ্রয়ে নবীর দাবী করার জন্যই কেবল মসীহর মৃত্যুর ধারণা জন্ম দিয়েছে। মূল কথা হল, সে ধীরে ধীরে নবী হবার দাবীর পথে অগ্রসর হচ্ছিল। তাই সে পর্যায়ক্রমে প্রতারণা, প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হল, আমার পরে যে নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল।

دجل (দাজল) হচ্ছে প্রতারণা, ধোঁকা, সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ করা। যা মিথ্যা কাদিয়ানীর মাঝে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। প্রতারক, মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা খতমে নবুওয়ত এবং মসীহ আ.-এর জীবিত থাকার ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য ধর্মদ্রোহী কুটকৌশল অবলম্বন করে। (নাউযুবিল্লাহ)

প্রশ্ন নম্বর চার

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

واذ قال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا

“স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ইসা! অবশ্যই আমি তোমার কালপূর্ণ করব, তোমাকে আমার দিকে তুলে নিব এবং যারা কুফরী করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র ও মুক্ত রাখব।” -সূরা আলে ইমরান ৫৫

(ক) এ আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করুন। অতঃপর এ আয়াত দ্বারা ইসা আ.-এর জীবিত থাকার প্রমাণ করুন।

(খ) কাদিয়ানীরা توفى দ্বারা মৃত্যু বুঝায়। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে متوفيك -এর ব্যাখ্যা مميتك বর্ণিত আছে। এর সমর্থনে কাদিয়ানীরা توفنا مع الابرار، توفنا مع المسلمين (নেককারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন, মুসলমানদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন) আয়াত পেশ করে থাকে। এসব বিষয়ের সঠিক উত্তর প্রদান করুন।

উত্তর

واذ قال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى

এ আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা আ.-এর স্বশরীরে উঠিয়ে নেয়ার দাবীই প্রমাণিত হয়। এটি হযরত ঈসা আ.-এর জীবিত থাকার পক্ষের দলীল। মৃত্যু নয়। توفى সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এখানে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করা হল।

توفى-এর প্রকৃত অর্থ

(ক) توفى-এর প্রকৃত অর্থ মৃত্যু নয়। যদি توفى শব্দের প্রকৃত অর্থ মৃত্যু হত, তাহলে কুরআন হাদীসের কোথাও না কোথাও توفى-এর বিপরিত حیات শব্দটি ব্যবহার করা হত। অথচ এরূপ কোথাও করা হয়নি। বরং توفى-এর বিপরিত ما دمت فيهم ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল توفى-এর প্রকৃত অর্থ মৃত্যু নয়। সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ‘মউত’ ও ‘হায়াতকে’ একটি অপরটির বিপরিত ব্যবহার করা হয়েছে। توفى-এর বিপরিত হায়াতকে ব্যবহার করা হয়নি। যেমন,

الذى يحيى ويميت. يحييكم ثم يميتكم. هو امات واحيى. لا يموت فيها ولا يحيى. ويحيى الموتى. اموات غير احياء. يحيى الموتى يحيى الارض بعد موتها نخرج الحيى من المين وتخرج الميت من الحيى

“কোন জিনিসের পরিচয় তার বিপরিত জিনিস দ্বারা জানা যায়”-এর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, ‘হায়াতের’ বিপরিত ‘মউত’ ব্যবহার করা হয়েছে, توفى (তুআফিয়া) নয়। বরং توفى কে পবিত্র কুরআনে ما دمت فيهم-এর বিপরিত ব্যবহার করা হয়। যেমন, او كنت عليهم شهيدا ما عمت عليهم توفى-এর প্রকৃত অর্থ জানা যায়। আল্লামা যমখশারী রহ.-এর উদ্ধৃতিই এখানে যথেষ্ট।

اوفاه استوفاه، توفاه استكمال ومن المجاز توفى وتوفاه الله ادركته الوفاة.

اوفاه এর অর্থ হল استكمال অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে নেয়া।

এর অর্থ-توفاه الله - توفى যেমন মৃত্যু অর্থে ব্যবহার হয়।

হল তার মৃত্যু হল। এ উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল **توفى**-এর প্রকৃত অর্থ মৃত্যু নয়। তবে রূপকভাবে ক্ষেত্রবিশেষ মৃত্যু অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

(খ) আল্লাহ রাব্বুল ইয়্যত **اماتت** (মৃত্যু)-এর সম্পর্ক নিজের সাথে করেছেন, গায়রুল্লাহর সাথে কখনো করেননি। **توفى**-এর সম্পর্ক অধিকাংশ সময় ফেরেশতার সাথে পাওয়া যায়। এটিও এ কথার দলীল যে, **توفى**-এর প্রকৃত অর্থ মৃত্যু নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে- **حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا** ‘এমনকি যখন তোমাদের কারো মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ কবচা করে।’ -সূরা আনআম ৬১। এখানেও **توفى**-এর সম্পর্কে ফেরেশতার সাথে করা হয়েছে।

(গ) **توفى**-এর প্রকৃত অর্থ মৃত্যু নয়। যেমন কুরআন মজীদে উল্লেখ হয়েছে **حتى يتوفهن الموت**। এখানে **توفى** কে **موت** এর বিপরিত নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে “তার মৃত্যুর সময় পরিপূর্ণভাবে নেয়া,” যদিও **توفى** এর অর্থ মৃত্যু হত তাহলে আয়াতটি এরূপ হত **يميتهن الموت**।

(ঘ) **توفى** এর প্রকৃত অর্থ মৃত্যু নয়। যেমন কুরআনে উল্লেখ হয়েছে:

اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاٰخَرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

“আল্লাহ মানুষের জান কবজ করেন তার মৃত্যুর সময় এবং যার মৃত্যু আসেনি তারও নিদ্রাকালে। অতঃপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যদেরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন।” -সূরা যুমার ৪২

১. এখানে প্রথম বাক্যে **يَتَوَفَّى الْاَنفُسَ** কে **حِيْنَ مَوْتِهَا** এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এ থেকে প্রতিভাত হয় **توفى** মূল অর্থ মৃত্যু নয়।

২. অতঃপর **توفى** কে মৃত্যু এবং নিদ্রা দু’ভাবে ভাগ করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন দ্বারা প্রতিভাত হয় **توفى** মৃত্যুর বিপরিত।

৩. توفي নিন্দা ও মৃত্যু উভয়কে বুঝায়। নিন্দাবস্থায় মানুষ জীবিত থাকে। এ কারণে توفي এর সম্পর্ক নিন্দার সাথে করা হয়েছে। এমনভাবে একই দেহের মাঝে توفي এবং حیات পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝা গেল توفي এর মূল অর্থ মৃত্যু নয়।

সারাংশ

توفي এর প্রকৃত অর্থ হল পরিপূর্ণভাবে নিয়ে যাওয়া। তবে হ্যাঁ ক্ষেত্রবিশেষ রূপকভাবে মৃত্যুর অর্থও হতে পারে। যেমন، توفنا مع الابرار - (নেকারদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও। মুসলমানদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান কর।)

জরুরী সতর্কবাণী

যদি কখনো কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ না নিয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাই বলে সবসময়ের জন্য প্রকৃত অর্থকে পরিত্যাগ করা হবে- এমনটি ভাবা সমীচীন নয়। যদি কেউ এরূপ বুঝেই থাকে তাহলে সে মিথ্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত নির্বোধই হবে। শব্দ বিন্যাসনীতিমালা হল, যেখানে প্রকৃত অর্থ নেয়া অসম্ভব, সেখানে রূপক অর্থ নেয়া হবে। عيسى انى متوفيك এখানে প্রকৃত অর্থ ‘পরিপূর্ণরূপে নেয়া’ উদ্দেশ্য হবে। আর توفنا مع الابرار এখানে রূপকভাবে ‘মৃত্যুর’ অর্থ নেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হায়াতে ঈসা আ.

(ক) হযরত ইবনে আব্বাসও রাযি. হযরত ঈসা আ. জীবিত আছেন বলে বিশ্বাস করেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হযরত ঈসা আ.কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া, জীবিত থাকা এবং পরবর্তীতে অবতরণ সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। التصريح بما تواتر فى نزول -এর ১৮১, ২২৩, ২২৪, ২৪৫, ২৭৩, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৯, ২৯১, ২৯২ নং পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কিত হাদীস হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. উল্লেখ করেছেন।

(খ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর যে বর্ণনায় متوفيك এর অর্থ مميتك করা হয়েছে, তা বর্ণনাকারী হলেন আলী ইবনে আবী তলহা। -তাফসীরে ইবনে জারীর খ. ৩ পৃ. ২৯০

হাদীস শাস্ত্রবীদগণ আলী ইবনে তলহাকে দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন। তাদের মতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সাথে তার সাক্ষাতই হয়নি। সনদের মাঝে মুজাহিদেব মাধ্যম রয়েছে। -মিযানুল ইতিদাল খ.৫ পৃ. ১৬৩; তাহযীবুত্তাহযীব খ. ৪ পৃ. ২১৩

এ ধরনের একটি দুর্বল রেওয়ায়েত বুখারী শরীফে কিভাবে সম্ভবেশিত হল, সে প্রশ্ন দেখা দেয়। এর উত্তরে বলা হয়, ইমাম বুখারী রহ. এ বাধ্যবাদকতা কেবল বিশুদ্ধ ধারাবাহিক সনদ দ্বারা বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন। এ সম্পর্কে ফতহুল মুগীসের ২০নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে যে, ইমাম বুখারী রহ.-এর ঘোষণা 'আমি কেবল আমার কিতাবে তাই বর্ণনা করব, যা বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত'- এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস। তালিকাত, আসার, মওকুফ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে ঐসব হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা বুখারীর তরজমাতুল বাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(তালিক : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালিক বলে। কখনো কখনো তালিকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তালিক বলে। ইমাম বুখারী রহ.-এর গ্রন্থে এরূপ বহু তালিক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালিকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে।

আসার : আসার শব্দটি কখনো কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে বুঝায়। কিন্তু অনেকেই হাদীস এবং আসারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীয়ত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃতি হয়েছে তাকে আসার বলে।

মওকুফ : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে, সনদসূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মওকুফ হাদীস বলে)

(গ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত অপর বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে যদিও এর অর্থ মৃত্যু বলা হয়েছে, কিন্তু রেওয়ায়েতের পূর্বাপর উল্লেখের দ্বারাও কাদিয়ানীদের দাবী এমনিতেই খণ্ডন হয়ে যায়।

اخرج ابن عساكر واسحاق بن بشر عن ابن عباس قال قوله تعالى انى متوفيك ورافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك فى اخر الزمان.

“ইবনে আসাকির এবং ইসহাক ইবনে বিশর ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল আমি আপনাকে শেষ যমানায় (অবতরণের পর) আপনাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নেব অর্থাৎ মৃত্যু দান করব।”

(ঘ) তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত, হযরত ঈসা আ.কে নিহত হওয়া ব্যতীত জীবিতই আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

ورفع عيسى من روضة في البيت الى السماء هذا اسناد صحيح لى ابن عباس

“ঈসা আ.কে গৃহের ভেন্টিলেটর দিয়ে (জীবিত) আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ সনদ ইবনে আব্বাস রাযি. পর্যন্ত বিশুদ্ধ।” -তাফসীরে ইবনে কাসীর খ. ১ পৃ. ৫৭৪

প্রশ্ন নম্বর পাঁচ

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা বলেন ورافعك এবং সূরা নিসায় বলেন بل رفعه الله اليه উভয়স্থানে কাদিয়ানী সম্প্রদায় رفع দ্বারা “রুহ উঠিয়ে নেয়া” কিংবা “মর্যাদা বৃদ্ধি” উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যাকে এমনভাবে খণ্ডন করুন যাতে কাদিয়ানীদের গোমর প্রকাশ পেয়ে যায়। এবং স্বশরীরে হযরত ঈসা আ.কে উঠিয়ে নিয়েও প্রমাণিত হয়।

উত্তর

এটিও কাদিয়ানীদের এক প্রকার ধোঁকা-প্রতারণা। তারা رافعك এবং بل رفعه الله اليه এর দ্বারা রুহ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। এর ওপর প্রশ্ন করা হয় যে, তোমাদের বিশ্বাস মতে ঈসা আ. সুলি থেকে অবতরণ করে ক্ষত ভাল হবার পর কাশিয়ারে চলে আসেন। সাতাশি বছর জীবিত থাকার পর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর রুহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। অথচ এ ধরনের ব্যাখ্যা কুরআনের বর্ণনারীতি বিরুদ্ধ। কেননা, তিনটি ওয়াদাই হযরত ঈসা আ.-এর দেহের সাথে সম্পৃক্ত। একই সময়ে একত্রে তা পূর্ণ হয়। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। তারা বলে رفع দ্বারা উদ্দেশ্য হল মর্যাদা বৃদ্ধি। কাদিয়ানীদের ঈমান যেভাবে স্থীর থাকে না তদ্রূপ তাদের অবস্থানের মাঝে নেই কোন স্থীরতা। তারা নিজেদের

দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা পরিবর্তন করতে থাকে। কখনো رفع দ্বারা রুহ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, কখনো মর্যাদা বৃদ্ধি। বস্তব কথা হচ্ছে তাদের উভয় দৃষ্টিভঙ্গীই হচ্ছে ভ্রান্ত।

১. এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, بل رفعه الله এর সর্বনাম দ্বারা তাই উদ্দেশ্য যা صلبوه - قتلوه এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য। প্রকাশ থাকে যে, صلبوه - قتلوه এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত ঈসা আ.- এর দেহ মুবারক। দেহ ব্যতীত কেবল রুহ উদ্দেশ্য নয়। তাইতো হত্যা করা কিংবা সুলিবিদ্ধ করা দেহকেই সম্ভব। রুহকে হত্যা কিংবা সুলিবিদ্ধ করা কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং بل رفعه الله এর সর্বনাম দ্বারা ঐ দেহ উদ্দেশ্য যা قتلوه এবং صلبوه এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

২. ইহুদীরা রুহ-আত্মা হত্যার দাবীদার নয়; বরং তারা দেহ হত্যার দাবীদার। بل رفعه الله اليه দ্বারা এর খণ্ডন করা হয়। সুতরাং بل رفعه দ্বারা উদ্দেশ্য হল দেহ। কেননা, আরবী ভাষায় بل এর পূর্ব এবং পরের অংশ একটি অপরটির বিপরিত হওয়া জরুরী। যেমন,

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

“তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান; বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।” -সূরা আশ্বিয়া ২৬।

দাসত্ব এবং পিতৃত্ব একটি অপরটি বিপরিত। একত্রে হতে পারে না।

ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق

“অথবা তারা কি বলে যে, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে; বরং এ রসূল তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে।” -সূরা মুমিনুন ৭০

মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং সত্য নিয়ে আগমন উভয়টি একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক। একত্রে হতে পারেনা। এটা কখনো সম্ভব নয় যে, সত্য শরীয়ত বহনকারী মস্তিষ্ক বিকৃতির অধিকারী হবেন। অনুরূপভাবে ঐ আয়াতে হত্যাকাণ্ড, সুলিবিদ্ধ হওয়া যা بل এর পূর্বের অংশ আল্লাহর নিকট উঠিয়ে নেয়ার বিপরিত যা بل এর পরে উল্লেখ হয়েছে। উভয়টি একত্রে হওয়া

অসম্ভব। প্রকাশ থাকে যে, নিহত হওয়া এবং রুহ উঠিয়ে নেয়া অর্থাৎ মৃত্যুর মাঝে বৈপরিত্ব নেই। আকাশে কেবল রুহ উঠিয়ে নেয়া দৈহিকভাবে নিহত হবার সাথে হতে পারে। যেমন শহীদরা তো অন্যের হাতে নিহত হন, কিন্তু তাদের রুহ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। তাই **بل رفعه الله** তে শারীরিক উঠিয়ে নেয়াই উদ্দেশ্য, যা হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ হবার বিপরিত। রুহ উঠিয়ে নেয়া এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ হবার বিপরিত নয়; বরং যে পরিমাণ অন্যায়ভাবে হত্যা কিংবা সুলিবিদ্ধ করা হবে, সে পরিমাণ মর্যাদা, সম্মান বৃদ্ধি পাবে। মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মৃত্যু এবং হত্যা শর্ত নয়। মর্যাদা বৃদ্ধি তো জীবিতদেরও হতে পারে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **ورفعنا لك ذكرك** “এবং আমি আপনার আলোচনাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছি।” -সূরা ইনশিরা ৪

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় আরো উন্নত করবেন।” -সূরা মুজাদালা ১১

(৩) ইহুদীরা হযরত ঈসা আ.-এর দৈহিক হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ হবার দাবীদার। তাদের এ দাবীকে মিথ্যা ঘোষণা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা **بل رفعه الله** বলেছেন, অর্থাৎ তোমরা ভুল বলছ। তোমরা দেহকে হত্যা করনি, সুলিবিদ্ধ করনি। বরং আল্লাহ তাআলা সুস্থ এবং নিরাপদে তাঁকে স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। যদি **رفع** দ্বারা রুহ অর্থাৎ মৃত্যু উদ্দেশ্য হত, তবে হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ হওয়াকে খণ্ডন করার ফায়দা কি? হত্যা এবং সুলির দ্বারা তো মৃত্যু হয়ে যায়। এখানে **رفع** টি অতীতকালীন ক্রিয়াপদের শব্দ। এ দ্বারা এ কথাই বুঝান হচ্ছে যে, তোমাদের হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ করার পূর্বেই আমি আকাশে উঠিয়ে নিয়েছি। যেমন **بل جاءهم** এর মাঝেও অতীতকালীন ক্রিয়াপদ আনা হয়েছে। এ থেকেও এ কথা বুঝা যায় যে, তোমাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির অধিকারী বলার পূর্বেই তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন। এমনিভাবে **بل رفعه الله** এর মাঝে অতীতকালীন

ক্রীয়াপদ শব্দ ব্যবহার করে এ কথার ইঙ্গিত বুঝায় যে, ‘রফা ইলাস্‌সামা’ (আকাশে উঠিয়ে নেয়া) তাদের কল্পনাশ্রুত হত্যা, সুলিবিদ্ধ করার পূর্বেই সংগঠিত হয়েছে।

(৪) যে স্থানে رفع এর مفعول (কর্মপদ) অথবা এর সম্পৃক্ততা শারীরিক কোন জিনিসের সাথে হবে, সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দেহ আকাশে উঠিয়ে নেয়া উদ্দেশ্য হবে। আর যদি رفع এর مفعول (কর্মপদ) অথবা সম্পর্ক, স্থান, মর্তবা, মর্যাদা অথবা উহ্য বিষয়ের সাথে হয়, তবে সেক্ষেত্রে মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধির অর্থ উদ্দেশ্য হবে। যেমন رفع এর অর্থ উঠানোর স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا اخْتَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

“স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুরকে তোমাদের ওপর তুলে ধরেছিলাম।” -সূরা বাকারা ৯৩

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

“আল্লাহ তিনিই যিনি উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আকাশসমূহকে কোন স্তম্ভ ছাড়া।” -সূরা রাদ ২

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

“স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কাবা ঘরের ভিত নির্মাণ করেছিল।” -সূরা বাকারা ১২৭

وَرَفَعَ أَبُوبِهِ عَلَى الْعَرْشِ

“ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর বসালেন।” -সূরা ইউসুফ ১০০

ওপরে উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সন্দেহাতিতভাবে শারীরিকভাবে উঠানই উদ্দেশ্য।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

“এবং তাদের মধ্যে একজনকে অপর জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।”
-সূরা যখরফ ৩২

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات

“এবং তাদের মধ্যে একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।”
সূরা যখরফ ৩২

এ দু'স্থানে رفع দ্বারা মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। এখানে মর্যাদা ও সম্মানের অর্থ উদ্দেশ্য নেয়ার কারণও বিদ্যমান আছে। যথাক্রমে তা হল ذکر এবং درجات।

কাদিয়ানীদের প্রশ্ন

إذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة

“বান্দা যখন বিনয় প্রকাশ করে তখন আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশে তাকে উঠিয়ে নেন।” -কানযুল উম্মাল খ. ৩ পৃ. ১১০; হাদীস নং- ৫৭২২০

এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে কাদিয়ানীরা প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। এখানে رفع এর মفعول তথা কর্মপদ হল দেহ এবং الى السماء বলে একে আরো সুস্পষ্ট করা হয়। তারপরও এখানে শারীরিকভাবে উঠিয়ে নেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল রূপক অর্থ। রুহ কিংবা মর্যাদা। তদ্রূপ হযরত ঈসা আ.-এর বেলায় রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হবে। অর্থাৎ হযরত ঈসা আ.-এর রুহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে কিংবা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উত্তর

এ হাদীসে رفع এর রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়ার পক্ষে অকাট্য যুক্তিপূর্ণ ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে। তা হচ্ছে জীবিত থাকা। যে ব্যক্তি লোক সমাজে বিদ্যমান থেকে বিনয় প্রকাশ করে, তার মর্যাদা, সম্মান আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশ সমান উঁচু করে দেবেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে শারীরিক উত্তোলন উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল মর্যাদা বৃদ্ধি। মোটকথা অকাট্য ইঙ্গিত থাকায় رفع এর রূপক অর্থ মর্যাদা নেয়া হয়েছে।

যদি কোন কম আকলসম্পন্ন ব্যক্তি যুক্তিপূর্ণ ইঙ্গিত বুঝতে অপারগ হয়, তার জন্য অকাট ইঙ্গিতও রয়েছে। কানযুল উম্মালেই বর্ণিত হাদীসের সাথে অপর একটি হাদীস নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে—

من تواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله في عليين.

অর্থাৎ মানুষ যে পরিমাণ বিনয়ী হবে, আল্লাহ তাআলা সে পরিমাণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। এমন কি সে বিনয়ের শেষ প্রান্তে পৌছলে আল্লাহ তাআলা তাকে ‘ইল্লিয়ীনে’ স্থান দিবেন। যা হচ্ছে উচ্চমর্যাদার সর্বশেষ স্থান। উক্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা হল الحديث يفسر بعض بعضا অর্থাৎ এক হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা করে।

মোটকথা رفع শব্দের অর্থ হল উঠিয়ে নেয়া, ওপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু رفع কখনো দৈহিক হতে পারে, কখনো রূপক হতে পারে, কখনো কথা ও কর্ম, কখনো মর্যাদা, স্থানের অর্থও হতে পারে। যেখানে দৈহিক رفع হবে, সেখানে দৈহিকভাবে উঠিয়ে নেয়া উদ্দেশ্য হবে। যেখানে رفع দ্বারা আমল, মর্যাদা নেয়া হবে, সেখানে এর রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হবে। رفع এর অর্থ উঠিয়ে নেয়া, উঁচু করা।

(৫) এ আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সময় ইহুদীরা হযরত ঈসা আ.কে হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করে, সে সময় তারা তাকে হত্যা এবং সুলিবিদ্ধ করতে পারেনি। বরং তখন হযরত ঈসা আ.কে আল্লাহর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়। এ থেকে জানা গেল যে, بل رفعه الله এর মাঝে যে উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা হযরত ঈসা আ.-এর পূর্ব থেকে অর্জন করেননি। বরং এ উঠিয়ে নেয়া তখনই প্রকাশ পেয়েছে যখন ইহুদীরা হযরত ঈসা আ.কে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। হযরত ঈসা আ.কে সুস্থ-সবল স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। তাঁর মর্যাদা, সম্মান পূর্ব হতেই বৃদ্ধি ছিল। এর প্রমাণ পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين

“সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং সে আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম।” -সূরা আলে ইমরান ৪৫

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যে সম্মান-মর্যাদা ছিল, তা ইহুদীদের হত্যা করার সংকল্পের পূর্ব হতেই লাভ করেছিলেন। এখানে সে বিষয়ের অবতারণা করা অনুচিত।

(৬) ইহুদীদের অপমানিত, লাঞ্চিত, অপদস্ত ও ব্যর্থ হওয়া পক্ষান্তরে হযরত ঈসা আ.-এর পূর্ণ মর্যাদা, সম্মান, স্বশরীরে সুস্থ এবং নিরাপদে আকাশে উঠিয়ে নেয়ায়ই প্রকাশ পায়। এ কথাও সকলের জানা উচিত যে, উঁচু মর্যাদা এবং সম্মান বৃদ্ধি কেবল হযরত ঈসা আ.-এরই বৈশিষ্ট্য নয়। শরীয়তের জ্ঞান লাভকারী এবং ঈমান গ্রহণকারীও এ সম্মানের অধিকারী হতে পারেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদার আরো উন্নত করবেন।” -সূরা মুজাদালা ১১

(৭) উক্ত আয়াতে رفع روحانی অর্থাৎ মৃত্যু যদি উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে, তবে এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, ইহুদীদের হত্যাকাণ্ড এবং সুলিবিদ্ধ করার পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলছেন -

ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق

“অথবা তারা কি বলে যে, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে? বরং এ রসূল তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে।” -সূরা মুমিনুন ৭০

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

ويقولون ائنا لتركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين

“এবং বলত এক পাগল কবির কথায় আমরা কি আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? বরং তিনি সত্যসহ এসেছেন এবং অন্যান্য সকল রসূলদের সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন।” -সূরা সাফ্যাত ৩৬-৩৭

উক্ত আয়াত দু'টিতে তাদের পাগল কিংবা কবি বলার পূর্বেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন। তেমনিভাবে رفع روحانى অর্থাৎ মৃত্যুও তাদের হত্যা কিংবা সুলিবিদ্ধ করার পূর্বে সংগঠিত হয়েছে বলে মানতে হবে। অথচ কাদিয়ানী সে কথা বলে না। সে বলে, হযরত ঈসা, আ. ইহুদীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিলিস্তিন থেকে কাশ্মিরে চলে আসেন। এখানে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এর মাঝে তিনি তার ক্ষতেরও চিকিৎসা করেন। অতঃপর সাতাশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় তাকে দাফন করা হয়। সেখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। মির্যা কাদিয়ানীর দাবী অনুযায়ী ইবারত এরূপ দরকার ছিল:

وما قتلوه بالصلب بل تخلص منهم وذهب الى كشمير واقام فيهم مدة طويلة ثم اماته الله ورفع اليه.

“তারা সুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেনি। তাদের থেকে মুক্ত হন। কাশ্মিরে চলে যান। সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দেন এবং তার নিকট উঠিয়ে নেন।”

وكان الله عزيزا حكيما এর সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। কেননা, আযীয এবং হাকীমের ব্যবহার বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, অলৌকিক কিংবা সাধারণ ও প্রকৃতির নিয়মের বাইরের ঘটনার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এখানে বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, অলৌকিক ঘটনা স্বশরীরে উঠিয়ে নেয়া অসম্ভব এরূপ ধারণা করা যাবে না। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়ের পক্ষে তা কোন দূরহ ব্যাপার নয়। আবার এরূপও ধারণা করা যাবে না যে, স্বশরীরে উঠিয়ে নেয়া হেকমতের খেলাফ। তিনি হাকীম অর্থাৎ প্রজ্ঞাময়, তাঁর কোন কর্মই হেকমত শূণ্য নয়। শত্রু যখন হযরত ঈসা আ.কে হত্যার জন্য ঘেরাও করল, তখন তিনি স্বীয় কুদরতের কারিশমা দেখালেন। হযরত ঈসা আ.কে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। যারা তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল, তাদের একজনকে তাঁর আকৃতিতে রূপান্তরিত করেন। এ কৌশল অবলম্বন করে তাদেরকে ধাঁধায় ফেলে দেন। রূপান্তরিত ব্যক্তিকে তাদের হাতে হত্যা করান।

رفع শব্দের ‘অর্থ সম্মানজনক মৃত্যু’ না কোন অভিধান দ্বারা প্রমাণিত, না কোন সামাজিক পরিভাষা দ্বারা। এমনকি কোন শাস্ত্রের পরিভাষা দ্বারা প্রমাণিত নয়। এটা কেবল মিথ্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিথ্যা উদ্ভাবন। তবে হ্যাঁ رفع শব্দ সম্মানের অর্থ ব্যবহার হয়। সে হিসেবে সম্মান এবং স্বশরীরে উঠিয়ে নেয়া একত্রে পাওয়া যেতে পারে। যদি رفع দ্বারা সম্মানজনক মৃত্যু উদ্দেশ্য হয় তবে ‘নুযুল’ দ্বারা লাঞ্ছনাকর জন্ম উদ্দেশ্য হওয়া চাই। হাদীসে তো رفع এর বিপরিত نزول (নুযুল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর নুযুল কেবল মিথ্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বেলায় প্রযোজ্য।

(৯) আয়াতে তো হযরত ঈসা আ.কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার কথা সুস্পষ্ট-ভাবে বলা হয়নি। এ প্রশ্নের উত্তর হল رفعه الله اليه (আল্লাহ ঈসাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন) এর দ্বারাই বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে আকাশে উঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এরূপ আরো আয়াত রয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল।

تخرج الملكة والروح اليه “ফেরেশতাগণ এবং রুহ আল্লাহ সমীপে আরোহণ করে।” অর্থাৎ আকাশে আরোহণ করে।

اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه থাকে উত্তম বাক্যসমূহ, আর নেক কাজ তাকে তাঁর দরবারে তুলে দেয়।” -সূরা ফাতির। অর্থাৎ আকাশে আরোহণ করে। তদ্রূপ رفعه الله اليه এর দ্বারা উদ্দেশ্য আকাশে উঠানো। আল্লাহ তাআলা যাকে সামান্যতম জ্ঞান দিয়েছেন, তিনিও বুঝতে পারবেন যে, بل رفعه الله اليه এর অর্থ সম্মানজনক মৃত্যু নেয়া অবিধান শাস্ত্রের খেলাফ এবং আয়াতের পূর্বাপরের বিষয়বস্তু বিরুদ্ধ। এমনভাবে উক্ত আয়াতের তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বিশুদ্ধ সনদে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন, لما اراد الله ان يرفع عيسى الس السماء “যখন আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আ.কে আকাশে

উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলেন।” -তাকসীরে ইবনে কাসীর খ. ১ পৃ. ৫৭৪।
এছাড়াও এ বিষয়ে আরো বহু হাদীস রয়েছে। যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

(১০) মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখে “সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হল যে, رفع দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য মৃত্যু। কিন্তু এমন মৃত্যু যা সম্মানের সাথে লাভ করা যায়। যেমন নৈকট্যভাজনদের হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর তাদের রুহ ইল্লিয়ীনে পৌছে।” فى مقعد صدق عند مليك -এযালায়ে আওহাম পৃ. ৫৯৯; রুহানী খাযায়েন খ. ৩ পৃ. ৪২৪

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী হল رفع দ্বারা উদ্দেশ্য হল সম্মানজনক মৃত্যু। যেমন প্রমাণিত হয় যে, بل رفعه الله اليه দ্বারা উদ্দেশ্য হল আকাশে যাওয়া। কেননা, ‘ইল্লিয়ীনে’ এবং ‘মাকআদে সিদক’ তো আকাশেই। যাহোক কাদিয়ানীও আকাশে যাবার কথা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বিরোধ হল আকাশে হযরত ঈসা আ.-এর রুহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, না রুহ ও দেহ এক সাথে। আমরা প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, রুহ ও দেহ উভয়টিকেই আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন নম্বর ছয়

(ক) হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করুন।

(খ) ‘আমি মসীর সদৃশ্য’ মির্যার অসত্য এ উক্তিকে খণ্ডন করুন।

(গ) এ কথাও প্রমাণ করুন যে, ঈসা আ.-এর অবতরণের আকীদা খতমে নবুওয়তের আকীদার বিরুদ্ধ নয়।

উত্তর

হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণের পক্ষে দু’টি আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

“وان من اهل الكتب الا يؤمن به قبل موته” আর আহলে কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে ঈসার প্রতি ঈমান আনবে।” -সূরা নিসা ১৫৯

“وانه لعلم للساعة” আর ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন।” -সূরা যুখরুফ ১৬

মুল্লা আলী কারী রহ. লিখেন, আকাশ হতে হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণ এবং তিনি যে কিয়ামতের নিদর্শন- আল্লাহ তাআলার বাণী দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহর এ ঘোষণা দ্বারাও প্রমাণিত যে, আহলে কিতাবীরা তাঁর আকাশ হতে অবতরণের পর এবং মৃত্যুর পূর্বে কিয়ামতের সন্নিহিতে তার প্রতি ঈমান আনবে। সকল জাতি এক মিল্লাতভুক্ত হয়ে যাবে। আর তা হল মিল্লাতে ইসলামিয়া। -শরহে ফিকহুল আকবর প্র. ১৩৬

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত قبل موته এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত ঈসা আ.। যেরূপ به ليوم من به এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আ.।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘এরশাদুস সারীতে’ উল্লেখ হয়েছে- “আহলে কিতাবীর প্রত্যেকেই হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আহলে কিতাবীরা হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণের সময় বিদ্যমান থাকবে। সকলেই এক মিল্লাতভুক্ত হবে। সাআদ ইবনে জুবায়ের হতে ইবনে জারীর বিশুদ্ধ সনদে যা বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তা জোড়ালোভাবে বর্ণনা করেছেন।” -এরশাদুস সারী খ. ৫ পৃ. ৫১৮-৫১৯

হযরত ঈসা আ.-এর জীবিত থাকার সম্পর্কে ঐক্যমত

পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং বিশুদ্ধ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা হল, হযরত ঈসা আ. জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের পূর্বক্ষণে অবতরণ করবেন। ইমামগণের কারো হতে এ বিষয়ে দ্বিমত পাওয়া যায়নি। এমনকি মুতাবিলা সম্প্রদায় এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে। যদিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে বেশ কিছু বিষয়ে তাদের মতভেদ রয়েছে। আল্লামা যমখশরী রহ. ‘কাশ্শাফের’ মাঝে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ইবনে আতীয়া রহ. বলেন,

“উম্মতে মুসলিমা এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, হযরত ঈসা আ. আকাশে জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের পূর্বক্ষণে স্বশরীরে আগমন করবেন। এটি পরম্পরায় বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।”

হযরত ঈসা আ.-এর জীবিত থাকা এবং আকাশ হতে অবতরণ সম্পর্কিত শতের অধিক হাদীস ত্রিশজন সাহাবী দ্বারা বর্ণিত হয়ে আসছে। তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. (২) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. (৩) হযরত নওয়াস ইবনে সামআন রাযি. (৪) হযরত ইবনে ওমর রাযি. (৫) হযরত হুযায়ফা ইবনে উসাইদ রাযি. (৬) হযরত সওবান রাযি. (৭) হযরত মাজমাআ রাযি. (৮) হযরত আবু উমামা রাযি. (৯) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. (১০) হযরত আবু নযারা রাযি. (১১) হযরত সামুরা রাযি. (১২) হযরত আবদুর রহমান ইবনে খুবাইর রাযি. (১৩) হযরত আবু তোফাইল রাযি. (১৪) হযরত আনাস রাযি. (১৫) হযরত ওয়াসিলা রাযি. (১৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. (১৭) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. (১৮) হযরত আউস রাযি. (১৯) হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাযি. (২০) হযরত আইশা রাযি. (২১) হযরত সফীনাহ রাযি. (২২) হযরত হুযাইফা রাযি. (২৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল রাযি. (২৪) হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাযি. (২৫) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. (২৬) হযরত আম্মার রাযি. (২৭) হযরত রবী রাযি. (২৮) হযরত উরওয়াহ ইবনে রুআইম রাযি. (২৯) হযরত হাসান রাযি. (৩০) হযরত কাআব রাযি.।

মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী

হযরত ঈসা ইবনে মরীয়ম আ.-এর অবতরণ পরম্পরা বর্ণনাসূত্রে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটি এমন এক বাস্তবতা যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও স্বীকার করেছে। সে লিখে, “এ কথা গোপন নয় যে, হযরত মসীহ আ.-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম স্তরের একটি ভবিষ্যদ্বাণী। যা সকলেই সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে নেয়। সিহাহ সিত্তায় লিখিত অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এর সমপর্যায়ের প্রমাণিত হয়নি। এবং এটি প্রথম স্তরের পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত হাদীস।” -এযালায়ে আওহাম পৃ. ২৩১

এর কয়েক লাইন পূর্বে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখে,

“যাদের অন্তরে قال الله، قال الرسول এর সম্মান অবশিষ্ট নেই, সেসব নির্বোধরা ভিত্তিহীন ধারণা পেশ করে বলে, সিহাহ সিত্তায় যে হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের হাদীস বিদ্যমান আছে, সবই ভুল। কিন্তু তারা পরম্পরায় বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হাদীস অস্বীকার করে নিজেদের ঈমানকে হুমকির মুখে ঠেলে দিল।” -এযালায়ে আওহাম পৃ. ২৩০

এরপরও সে নিজেকে মসীহের সদৃশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছে।

মসীহর সদৃশ্য হবার মিথ্যা দাবী

জন্ম থেকে নিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত, অবতরণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোথাও মিথ্যার সদৃশ্যতা নেই। হযরত ঈসা আ. পিতাহীন জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর হায়াতে কোন বাড়ী নির্মাণ করেননি। বিবাহ করেননি। অবতরণের পর ন্যায় বিচারক হবেন। দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তাঁর সময়ে সকল মিথ্যা ধর্মের বিলুপ্তি হবে। ক্রশের পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাপকভাবে আল্লাহর ইবাদত হতে থাকবে। দামেশকে যাবেন। বায়তুল মোকাদ্দাসে আগমন করবেন। হজ্জ ও ওমরা করবেন। মদীনায় উপস্থিত হবেন। অবতরণের পর তিতাল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন। অতঃপর মৃত্যু বরণ করবেন। এগুলো হচ্ছে হযরত ঈসা আ.-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিদর্শন। এগুলোর কোন একটি মিথ্যা কাদিয়ানীর মাঝে পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও সদৃশ হবার দাবী করে। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কি হতে পারে?

হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণ খতমে নবুওয়ত আকীদার পরিপন্থী নয়

কাদিয়ানী মতবাদের ভিত্তিই হচ্ছে মিথ্যার ওপর। মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একটি প্রশ্নের অবতরণা করে থাকে। তা হল, হযরত ঈসা আ. পুনরায় আগমনের পর নবুওয়তের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকবেন কিনা? যদি নবী হিসেবে আগমন করেন, তবে তা খতমে নবুওয়তের আকীদার পরিপন্থী। আর যদি নবী না হন, তাহলে তাকে নবুওয়তের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া হল, যা নাকি ইসলামী আকীদার পরিপন্থী। এ প্রশ্নের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হল।

উত্তর

আল্লামা মাহমূদ আলুসী রহ. তাফসীরে রুহুল মাআনীতে লিখেন:

وكونه خاتم الانبياء اى لانباء احد بعده واما عيسى ممن نبى قبله.

(১) তিনি খাতামুল আন্বীয়া। এর অর্থ হল তাঁর পরে কাউকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসা আ.কে তাঁর পূর্বে নবী মনোনীত করা হয়েছিল। তাই হযরত ঈসা আ.-এর আগমন তাঁর খতমে নবুওয়তের পরিপন্থী নয়।

তিনিই এ পৃথিবীতে নবী হিসেবে সর্বশেষে আগমন করেছেন। তাঁর পর কোন ব্যক্তি নবুওয়তের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন না।

(২) পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে মির্যা গোলাম আহমদ নিজেকে খাতামুল আওলাদ তথা সর্বশেষ সন্তান দাবী করত। অথচ তখনও তার বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের জীবিত ছিল। মির্যা গোলাম কাদের জীবিত থাকাবস্থায় যদি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী খাতামুল আওলাদ হতে সমস্যা না হয়, তবে কেন ঈসা আ.-এর জীবিত থাকা অবস্থায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হতে সমস্যা হবে?

(৩) ইবনে আসাকিরে একটি হাদীস উল্লেখ হয়েছে যে, হযরত আদম আ. জিব্রাইল আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, কে হবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? উত্তরে বললেন, আশীয়াদের মধ্য হতে আপনার সর্বশেষ সন্তান। -কানযুল উম্মাল খ. ১১ পৃ. ৪৫৫ হাদীস নং ১৩৯

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, “খাতামুলনবীয়াতীন” দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি আশীয়াদের সর্বশেষ। এটি অন্য কোন নবীর বিদ্যমান থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সুতরাং তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণের কোনরূপ পরিপন্থী নয়।

(৪) মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তিরয়াকুল কুলূব নামক গ্রন্থের ১৫৬নং পৃষ্ঠায় এবং খায়ায়েনের ১৫নং খণ্ডের ৪৭৯নং পৃষ্ঠায় লিখে, মানবসত্তা যার মাধ্যমে সমাপ্ত হবে, সেই হবে “খাতামুল আওলাদ” সর্বশেষ সন্তান। অর্থাৎ তার পরে কোন নারীর গর্ব হতে কোন পরিপূর্ণ মানব জন্মগ্রহণ করবে না।

যখন মির্যার নিকট ‘খাতামুল আওলাদ’ অর্থ নারীর গর্ব হতে কোন কামেল মানব জন্মগ্রহণ করবে না। তখন ‘খাতামুলনবীয়াতীন’ের এ অর্থ কেন উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না যে, তাঁর পরে কোন নবী নারীর গর্ব হতে জন্মগ্রহণ করবে না। এতে তিনটি দিক রয়েছে।

১. খতমে নবুওয়ত এবং ঈসা আ.-এর অবতরণের মাঝে কোন বিরোধ নেই। খাতামুলনবীয়াতীনের দাবী নারীর গর্ব হতে তার পরে কোন নবী জন্মগ্রহণ করবে না। ঈসা আ. তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন।

২. এ থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যদি মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মায়ের গর্বে হতে জনগ্রহণ করে, তবে তার নবুওয়ত খাতামুলবীযীনের পরিপন্থী।

৩. এ কথাও সুস্পষ্ট হল যে, যেই প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের কথা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, তিনি মায়ের গর্বে জন্মলাভ করবেন না। এবং না তিনি খাতামুলবীযীনের দাবীর সাথে সাংঘর্ষিক হবেন। এ হিসেবে তো মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহও নয়। ‘তাঁর পরে কোন নবী আসবে না’ এ কথার অর্থ হল নবুওয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কোন নবীর আগমন হবে না। আর হযরত ঈসা আ. তো তাঁর আগমনের পূর্ব হতে নবী।

কাদিয়ানীদের এ প্রশ্নের একটি যৌক্তিক উত্তর হল, কোন এক ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে অন্য দেশে সফর করে থাকেন। অন্য দেশে তার শাসন অকার্যকর। তাই বলে তার রাজত্ব, তার শাসন ক্ষমতা বাতিল হয়ে যায়নি। যেখানে সফরে গিয়েছেন, সেখানে সেখানকার শাসনকর্তারই শাসন চলবে। তদ্রূপ হযরত ঈসা আ. যখন আগমন করবেন তখন তাঁর নবুওয়ত বাতিল হয়ে যাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে *ورسولا الى بنى اسرائيل* অর্থাৎ তাঁর রেসালত-নবুওয়ত বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত ছিল। এখন যেহেতু তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার নিকট আগমন করেছেন, তাই তাদের ওপর তাঁর নবুওয়ত অকার্যকর। উম্মতের ওপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত কার্যকর হবে। তবে এ কথা সত্য যে, হযরত ঈসা আ.-এর আগমানে ইহুদীরা সংশোধিত হবে, খ্রীস্টানরা তাদের ভ্রান্ত ধারণার অসারতা অনুধাবন করবে। সকলেই ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। *ليظهره على الدين كله* “সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হবে” এর বাস্তবায়ন হবে।

প্রশ্ন নম্বর সাত

হযরত মাহদী ও মসীহ আ.-এর আগমন এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করুন। এর সাথে সাথে এ বিষয়ে কাদিয়ানীদের অপব্যাক্যাকে খণ্ডন করুন।

উত্তর

ইমাম মাহদী আ.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী আ.-এর প্রকাশের কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা হল।

(১) হযরত ফাতিমা রাযি.-এর বংশ থেকে হবেন। (২) মদীনায়ে জনুখ্‌হুণ করবেন। (৩) পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। (৪) তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ। উপাধি হবে মাহদী। (৫) চল্লিশ বছর বয়সে কাবা শরীফে সিরিয়ার চল্লিশজন আবদাল তাঁকে সনাক্ত করবেন। (৬) কয়কোটি যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব দিবেন। (৭) দামেশকের জামে মসজিদে পৌছবেন। সেখানে হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণ হবে। (৮) হযরত ঈসা আ. অবতরণের পর সর্বপ্রথম নামায হযরত মাহদী আ.-এর পিছনে পড়বেন। (৯) হযরত মাহদী আ. মোট বয়স হবে ৪৯ বছর। চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার পর খলীফা হবেন। সাত বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। (১০) অতঃপর তাঁর মৃত্যু হবে। মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায আদায় করবে। কোথায় দাফন করা হবে, সে সম্পর্কে হাদীস শরীফে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নেই। তবে কারো কারো মতে বায়তুল মোকাদ্দসে দাফন হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. রচিত “আল খলীফাতুল মাহদী ফি আহাদিসিস্ সহীহা” এবং মুহাদ্দিসে কবীর হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরঠী রহ. রচিত “আল ইমাম আল মাহদী” পড়ুন।

হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণ

(১) হযরত ঈসা আ. একজন প্রখ্যাত নবী-রসূল ছিলেন। সাদাসিদা জীবন-যাপন করতেন। (২) ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের হাত থেকে হযরত ঈসা আ.কে রক্ষা করে আকাশে জীবিত উঠিয়ে নেন। (৩) কিয়ামতের পূর্বক্ষেণে দু'ফেরেশতার ওপরে ভর করে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। (৪) দু'টি হলুদ বর্ণের কাপড় পড়া থাকবেন। (৫) দামেশকের মসজিদের পূর্ব দিকের গুপ্ত মিনারে অবতরণ করবেন। (৬) প্রথম নামায ব্যতীত বাকী সব নামাযে ইমামতী

করবেন। (৭) ন্যায়বিচারক শাসক হবেন। পৃথিবীতে ইসলামের প্রসার ঘটাবেন। (৮) দাজ্জালকে লুদ নামক স্থানে হত্যা করবেন। (এ স্থানে বর্তমানে ইসরাইলের বিমান বন্দর) (৯) অবতরণের পর ৪৫ বছর জীবিত থাকবেন। (১০) মদীনায় দাফন করা হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাযি., হযরত ওমর ফারুক সাথে রওযায়ে পাকে দাফন করা হবে। সেখানে এখনো একটি কবরের স্থান খালি রয়েছে।

দাজ্জালের আবির্ভাব

(১) ইসলামের শিক্ষা এবং হাদীসের আলোকে দাজ্জাল একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম। দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে আশ্বিয়ায়ে কেলাম নিজ নিজ উম্মতকে ভিত্তি প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ দাজ্জাল এমন ভয়ংকর ফেতনাকারী হবে, যা সম্পর্কে সকল নবী ঐক্যমত। (২) সে ইরাক এবং সিরায়ার মধ্যবর্তী স্থান থেকে প্রকাশ পাবে। (৩) গোটা পৃথিবীময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। (৪) আল্লাহ হবার দাবী করবে। (৫) একচক্ষু অন্ধ থাকবে। (৬) মক্কা-মদীনা যাবার ইচ্ছা করবে। কিন্তু হারামাইনের সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা তার চেহারা ঘুরিয়ে দেবে। সে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। (৭) তার অনুসারীর অধিকাংশই ইহুদী হবে। (৮) সত্তর হাজার ইহুদী তার সৈন্যবাহিনীতে शामिल থাকবে। (৯) লুদ নামক স্থানে হযরত ঈসা আ. তাকে হত্যা করবেন। (১০) সে হযরত ঈসা আ.-এর অস্ত্রের আঘাতেই মারা যাবে।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে হযরত ঈসা আ. এবং হযরত মাহদী আ. সম্পর্কে প্রায় একশত নিদর্শন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তাঁদের উভয়ের আগমন পরম্পরায় বর্ণনাসূত্র দ্বারা বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা শাওকানী লিখেন,

فتقرر ان الاحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة والاحاديث الواردة في

نزول عيسى بن مريم متواترة

“এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মাহদী আ. সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসও পরম্পরা বর্ণনাসূত্র দ্বারা বর্ণিত।” -আল ইয়াআ পৃ. ৭৭

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন,

قال ابو الحسن الخشعي الابدی في مناقب الشافعي تواترت الاخبار بان
المهدي من هذه الامة وان عيسى يصلي خلفه ذكر ذلك ردًا للحديث الذي
اخرجه ابن ماجه عن انس وفيه ولا مهدي الا عيسى.

“আবুল হাসান খাসায়ী আবদী রহ.-মানাকিবে শাফীতে লিখেন,
পরম্পরায় বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মাহদী এই উম্মাত থেকেই
হবেন। হযরত ঈসা আ. মাহদীর পিছনে নামায পড়বেন। আবুল হাসান
খাসায়ী রহ. এ কথা এ জন্য উল্লেখ করেছেন, যাতে ঐ হাদীস খণ্ডন করা
হয়, যা ইবনে মাজাহ হযরত আনাস রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,
হযরত ঈসা আ.-ই হলেন মাহদী।” -ফতহুল বারী খ. ৬, পৃ. ৩৫৮

হাফেয আসকালানী রহ. যে হাদীসগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তার
একটি হল-

عن جابر بن عبد الله قال قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تزال طائفة من
امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم
فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمه الله
هذه الامة.

“হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের
একদল সর্বদা সত্যের জন্য লড়াই করবে। দুশমনের ওপর বিজয়ী হবে।
অতঃপর তিনি বলেন, শেষ যমানায় ঈসা ইবনে মরীয়ম অবতরণ করবেন।
(নামাযের সময় হবে) মুসলমানদের আমির তাঁকে বলবেন, আসুন!
আমাদের নামায পড়ান। তিনি বলবেন, না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে
এ উম্মাতকে এ সম্মান-মর্যাদা দেয়া হয়েছে যে, এঁরা একে অপরের ইমাম
এবং আমির হবে।” -মুসলিম খ. ১, পৃ. ৮৭; আহমদ খ. ৩, পৃ. ৩৪৫

উক্ত হাদীস থেকে একদিকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী এবং হযরত ঈসা আ. পৃথক পৃথক ব্যক্তি হবেন। অপরদিকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কেরামত এবং মহান মর্যাদাও প্রমাণিত হয়। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে এ উম্মতের মধ্যে হতে এমন বুয়ুর্গ ব্যক্তিত্ব আগমন করবেন যে, বনী ইসরাঈলের একজন সম্মানিত নবীও তাঁকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন, তাঁর পিছনে নামায পড়বেন। এটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সয্যায় শায়িত অবস্থার একটি ঘটনার সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। তিনি এক ওয়াজের নামায সিদ্দীকে আকবর রাযি.-এর পিছনে আদায় করে এ কথার প্রতিই মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করছেন যে, ইমামতি, শাসনকার্য পরিচালনার পূর্ণ যোগ্যতা হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি.-এর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ঈসা আ. হযরত মাহদী আ. এবং দাজ্জাল তিনজনকে পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও স্বীকার করে নিয়েছে। “এ কথা মানা জরুরী যে, মসীহ মাউদ, মাহদী এবং দাজ্জাল তিনজনই পূর্বধ্বংস প্রকাশ পাবেন।” -তোহফায়ে গ্লোরিয়া পৃ. ৪৭; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭, পৃ. ১৬৭

তিনজনই পূর্বধ্বংসের হবেন। কাদিয়ানীর কথা দ্বারাই প্রমাণিত হল যে, তাঁরা সকলেই পৃথক পৃথক ব্যক্তি।

কাদিয়ানীদের অবস্থান

কাদিয়ানী সম্প্রদায় মসীহ এবং মাহদী আ.কে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করে। আর মির্যা কাদিয়ানীই হল সেই ব্যক্তি। অথচ ঈসা আ. এবং মাহদী হলেন ভিন্ন ভিন্ন দু'সত্তা। তাঁদের নাম, জন্মস্থান, অবতরণস্থল, প্রকাশের সময়, অবস্থানের সময়, বয়স উভয়েরই পৃথক পৃথক। এর বিস্তারিত বিবরণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। কাদিয়ানী সম্প্রদায় বিশুদ্ধ হাদীসকে বাদ দিয়ে একটি দুর্বল বর্ণনাকে নিজেদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলে,

ایہا الناس انی انا المسیح المحمدی وانی انا احمد المہدی.

“হে মানবজাতি! আমি হলাম মসীহ মুহাম্মদী এবং আমি হলাম আহমদ মাহদী।” -খুতবায়ে এলহামীয়া, খাযায়েন খ. ১৬, পৃ. ৬১

কাযী মুহাম্মদ নযীর কাদিয়ানী লিখে-

“ইমাম মাহদী এবং মসীহ মাউদ একই ব্যক্তি।” -ইমাম মাহদী কা যহর পৃ. ১৬

কাদিয়ানীদের আশি

কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইবনে মাজাহর একটি বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে যে, **لا المهدي الا عيسى بن مريم** অর্থাৎ “ঈসা ইবনে মরীয়মই হলেন মাহদী”। -ইবনে মাজাহ পৃ. ২৯২

কাযী মুহাম্মদ নযীর লিখে, ‘উক্ত হাদীস এ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, ঈসা ইবনে মরীয়মই হচ্ছেন মাহদী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাহদী নেই।’

এর উত্তর হল প্রথমত উক্ত হাদীস দুর্বল। দ্বিতীয়ত কাদিয়ানীরা এ হাদীসের যে উদ্দেশ্য মনে করেছে, তা সঠিক নয়। মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

حديث لا مهدي الا عيسى بن مريم ضعيف باتفاق المحدثين كما صرح به
الجزري على انه من باب لا فتى الاعلى.

“লা মাহদী ইল্লা ঈসা ইবনে মরীয়ম হাদীসটি মুহাদ্দিসিনের নিকট সর্বসম্মতভাবে দুর্বল। ইবনে জাযারীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ হাদীসটি **لا فتى الاعلى** এর ন্যায়।” -মিরকাত খ. ১০, পৃ. ১৮৩

যদিও উক্ত হাদীসকে সহীহ ধরে নেয়া হয়, তবুও এর ঐ উদ্দেশ্য হবে যা **لا فتى الاعلى** এর উদ্দেশ্য। মাহদী শব্দটি গুণবাচক শব্দ। এর দ্বারা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। এ কথাও বলা উদ্দেশ্য যে, উঁচু পর্যায়ের হেদায়েতপ্রাপ্ত হলেন ঈসা ইবনে মরীয়ম। যেমন **لا فتى الاعلى** দ্বারা উদ্দেশ্য হল উঁচু পর্যায়ের বাহাদুর এবং যুবক হলেন হযরত আলী।

তাই ঈসা ইবনে মরীয়ম এবং মাহদী অভিন্ন সত্তা মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভুল। মির্যা কাদিয়ানী একটি নীতিমালা নিম্নরূপ লিখে-

“অধিকাংশ হাদীসই পবিত্র কুরআনের সমর্থক। অতঃপর কোন হাদীস কদাচিত যদি কুরআনের আয়াতের বিপরিত হয়, তবে হয়ত তা অকাট্য প্রমাণ হতে খারিজ হয়ে যাবে। নতুবা এর কোন তাবিল করতে হবে। এটা কখনো সম্ভবপর নয় যে, একটি দুর্বল বর্ণনা দ্বারা সুদৃঢ় অট্টালিকাকে ভুপাতিত করা হবে।” -এযালায়ে আওহাম পৃ. ২৬৫-২৬৬

কাদিয়ানীর পেশকৃত নীতিমালার আলোকে ইবনে মাজাহর বর্ণনাটির কি আর গুরুত্ব থাকতে পারে? কেননা, ঈসা আ.-এর অবতরণ পরম্পরায় বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ঈসা আ. আকাশ হতে অবতরণ করবেন। পৃথিবীর কোন বংশে-গোত্রে জন্মগ্রহণ করবেন না। আর হযরত মাহদী সম্পর্কে হাদীসে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে:

سمعت رسول الله ﷺ يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة. (১)

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, মাহদী আমার সন্তানদের মধ্য হতে হবে। অর্থাৎ ফাতেমার সন্তানদের মধ্য হতে হবে।” -আবুদ দাউদ খ. ২, পৃ. ১৩১

(২) يواطى اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابي

“আমার নামই তাঁর নাম হবে। আমার পিতার নাম তার পিতার নাম হবে।” -আবু দাউদ খ. ২, প্র. ১৩১

(৩) كيف تهلك امة انا اولها والمهدى وسطها والمسيح اخرها

“ঐ উম্মত কিভাবে ধ্বংস হবে? যার প্রারম্ভে আমি আছি, মাঝে মাহদী এবং শেষে মসীহ।” -মিশকাত পৃ. ৫৮৩

এ হাদীস সুস্পষ্টভাবে এ কথাই ঘোষণা করছে যে, মির্যা কাদিয়ানীর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই প্রতারণামূলক। এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বর্ণনাও তাদের দৃষ্টিতে পড়েনি। তারা ঈসা এবং মাহদীকে অভিন্ন সত্ত্বা বলে দাবী করে। অথচ উভয়ের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

দাজ্জাল

(১) দাজ্জাল সম্পর্কে কাদিয়ানী কাকলাশের ন্যায় রঙ পরিবর্তন করে। প্রথমে তারা বলে দাজ্জাল দ্বারা উদ্দেশ্য হল পাদ্রী। তাদের এ মন্তব্যে প্রশ্ন হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হযরত আইশা রাযি.

বর্ণনা করেন, “একদা হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন। আমি কাঁদতেছিলাম। তিনি কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, দাজ্জাল সম্পর্কে আপনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, এতে আমি সংকিত। তার কথা স্মরণ হতেই আমার কান্না আসে। তিনি বললেন, আমি বিদ্যমান থাকাবস্থায় দাজ্জাল আগমন করলে তোমার জন্য আমি যথেষ্ট। আমার জীবদ্দশায় না আসলে যে সূরা কাহাফের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, সে দাজ্জাল হতে মুক্তি পাবে।” দাজ্জাল দ্বারা যদি পাদ্রী উদ্দেশ্য হয়, তবে পাদ্রী তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও বিদ্যমান ছিল। তিনি এমন কিছু বলেননি কিংবা তাঁর এরূপ বলারই বা কি অর্থ হতে পারে?

(২) মির্যা বলে দাজ্জাল দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইংরেজ সম্প্রদায়। তাকে বলা হল, যদি ইংরেজ উদ্দেশ্য হয়, তবে দাজ্জালকে তো হযরত ঈসা আ. হত্যা করবেন। আর তুমি হচ্ছে ইংরেজ পোষ্য।

(৩) মির্যা কাদিয়ানী বলে দাজ্জাল দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাশিয়া। তাকে বলা হল, দাজ্জাল তো একজন ব্যক্তি হবে। কোন সম্প্রদায় নয়। উত্তরে সে বলল, হাদীসে ‘রিজাল’ শব্দ এসেছে। যা বহুবচন। এ থেকে কাদিয়ানীর অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তার দাবীকে খণ্ডন করার জন্য এ কথাই যথেষ্ট যে, ইবনে সায্যাদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হযরত উমর রাযি. অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে, আমি তাকে হত্যা করব? তিনি বললেন, যদি সেই দাজ্জাল হয়, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। কেননা, দাজ্জালকে হযরত ঈসা আ. হত্যা করবেন।

ইবনে সায্যাদের সম্পর্কে হাদীসের কিতাবগুলোতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে এ কথাও জানা গেল যে, দাজ্জাল তরবারীর আঘাতে নিহত হবে। কলম দ্বারা নয়। যেমন কাদিয়ানীদের দৃষ্টিভঙ্গি।

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিভঙ্গি চৌদ্দশত বছর ধরে চলে আসা ইসলামের শিক্ষা বিরোধী। তা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রশ্ন নম্বর আট

কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে সকল আয়াত এবং হাদীস ঈসা আ.-এর উত্তোলন এবং মৃত্যুকে অস্বীকারের জন্য পেশ করে থাকে, তাঁর মধ্য হতে তিনটি উল্লেখ করে এর উত্তর প্রদান করুন।

উত্তর

কাদিয়ানীদের দলীল এক

و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم

“আর আমি তাদের ব্যাপারে স্বাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তারপর যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।” -সূরা মায়েদা-১১৭

উক্ত আয়াত দ্বারা কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যুর স্বপক্ষে দলীল পেশ করে এর সমর্থনে বুখারী শরীফের নিম্নের হাদীসটি গ্রহণ করে।

انه يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي
فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح. و كنت
عليهم شهيدا ما دمت فيهم

“আমার উম্মতের মাঝে একদলকে উপস্থিত করা হবে। তাদেরকে বাম অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রব! এরা তো আমার সাহাবী। বলা হবে, এদের সম্পর্কে আপনার জানা নেই। আপনার পরে এরা কি করেছে। অতঃপর আমি বলব, যেরূপ ঈসা আ. বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলাম, আমি তাদের ব্যাপারে স্বাক্ষী। আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।” -বুখারী খ. ২, পৃ. ৬৬৫

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত ঈসা আ. উভয়ে توفى শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের توفى শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত্যু, তাই হযরত ঈসা আ.-এর এ শব্দ দ্বারাও অভিন্ন উদ্দেশ্য হবে। এ ছাড়াও তিনি অতীতকালীন ক্রিয়াপদ (فعل) ব্যবহার করেছেন। এ থেকেও মৃত্যু বুঝায়।

উত্তর

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অপব্যাক্যার উত্তর পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, توفى এর অর্থ পরিপূর্ণভাবে নেয়া। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উক্তিহে মৃত্যুর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কেননা, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, তাঁর ইত্তিকাল হয়েছে। আর হযরত ঈসা আ.-এর উক্তি توفى এর অর্থ হল اصعد الى السماء (আকাশে উঠান)নেয়া। কেননা, এর পরবর্তী শব্দ হল رافعك الى।

উত্তর

যদি উভয়ের توفى এর একই অর্থ হত, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলতেন যে, فاقول ما قال العبد الصالح (আমি বলব, যা বলেছেন ঈসা আ.) উক্তি এ কথাই বলতে চায় যে, “মুশাবাহ” (যাকে উপমা দেয়া হয়) এবং “মুশাবাহ বিহ” (যার সাথে উপমা দেয়া হয়) একটি অপরটির বিপরিত হয়ে থাকে। আর এ দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য হল উভয়ের নিজ উম্মতের সম্মুখে অনুপস্থিতির অপারগতা পেশ করছেন। সুতরাং হযরত ঈসা আ. তাঁর অনুপস্থিতিকে توفى অর্থাৎ আকাশে উঠিয়ে নেয়া দ্বারা প্রকাশ করছেন। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুপস্থিতিকে توفى অর্থাৎ মৃত্যু শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে করেছেন।

উত্তর

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে اقول (বর্তমান এবং ভবিষ্যত কাল ক্রিয়াপদ শব্দ) এবং হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে قال (অতীত কাল ক্রিয়াপদ শব্দ) বলেছেন। এর একটি কারণ হল, যে সময় তিনি উক্ত হাদীস ইরশাদ করেছেন, এর পূর্বে সূরা মায়েদার বর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। আয়াতে কিয়ামত দিবসে হযরত ঈসা আ.-এর উত্তর বিবৃত হয়েছে। তাকে প্রশ্ন করা হবে, “তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ কর?” এর উত্তরে তিনি যা বলবেন, তা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হল, কিয়ামত দিবসে হযরত ঈসা আ. পূর্বে এ কথা বলবেন, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরে বলবেন।

কাদিয়ানীদের দলীল দুই

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

“মুহাম্মদ তো একজন রসূল ব্যতিরেকে আর কিছু নয়। তার পূর্বেও অনেক রসূল চলে গিয়েছে। অতএব, যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পায়ের গোড়ালিতে ভর করে পেছনে ফিরে যাবে?”
-সূরা আলে ইমরান ১৪৪

উক্ত আয়াতে কাদিয়ানী সম্প্রদায় خلت শব্দের অর্থ মৃত্যু করে থাকে।
استغراق (যা একটা জাতিকে বুঝায়) বলে দাবী করে। তাদের দলীলের নির্যাস হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের সকল নবী যেহেতু মৃত্যু বরণ করেছেন, তাই এ থেকে প্রমাণিত হয় হযরত ঈসা আ.ও মৃত্যুবরণ করেছেন।

উক্তর ১

خلت শব্দটি خلو শব্দ হতে উৎসারিত। এর শাব্দিক অর্থ স্থানের সাথে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে স্থান খালি করা হবে। আর যুগের সাথে সম্পৃক্ততার বেলায় অর্থ হবে অতিক্রম করা। যে জিনিসের ওপর দিয়ে যুগ অতিক্রম করে তাকে خلو বলে। উদাহরণ-

১. واذا خلوا الى شياطينهم “যখন নির্জনে প্রধানদের সাথে মিলিত হয়”। -সূরা বাকার ১৪

২. بما اسلفتم فى الايام الخيالية “তোমরা বিগত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে”। -সূরা হাক্বা ২৪

৩. تلك امة خلت “একদল যা অতিক্রম করে গিয়েছে”। -সূরা বাকার ১৪১

যাহক خلو শব্দের অর্থ স্থান খালি করা চাই তা জীবিত থেকে হোক, কিংবা মৃত্যু দ্বারা এবং এক স্থান হতে অপর স্থানে যাওয়া। অকাউ দলীল

দ্বারা প্রমাণিত হয়রত ঈসা আ. জীবিত আছেন। তাই এর অর্থ মৃত্যু নেয়া হল পবিত্র কুরআনকে বিকৃত করা।

উত্তর ২

ظرف এর حلت বরং ‘আর রসূলে’র সিফাত (বিশেষণ) নয়। من قبله ‘আর রসূলের পূর্বে হয়েছে। সিফাত এজন্য নয় যে, যদি সিফাত ধরা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের সকল নবী মৃত্যু বরণ করেছেন। এটি এর সঠিক অর্থ নয়। বরং এর অর্থ হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে নবীগণ অতিবাহিত হয়েছে।

الرسول এর লাম ‘জিনস’ বুঝানোর জন্য এসেছে। استغراق এর অর্থ বুঝানোর জন্য নয়। যদি استغراق এর জন্য নেয়া হয়, তাহলে বাক্যের মাঝে বৈপরিত্ব দেখা দিবে। وما محمد الا رسول দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালতকে প্রমাণ করা হয়েছে। الرسول এর লামকে যদি استغراق এর জন্য নেয়া হয়, তবে অর্থ হবে যারাই নবী ছিলেন, তাঁরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন। ফলে তাঁর সত্য নবী হওয়া প্রমাণিত হয় না। তাই ‘লামকে জিনসী’ মেনে নেয়া জরুরী।

উত্তর-৩

যদি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের তিনটি দলীলকে মেনেও নেয়া হয়, তবুও বেশীর চেয়ে বেশী ‘রসূল’ শব্দটি ব্যাপক হওয়ায় হয়রত ঈসা আ.-এর মৃত্যু প্রমাণিত হবে। না এখানে বিশেষভাবে হয়রত ঈসা আ.-এর মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। এ সুরতে উক্ত আয়াত কাদিয়ানীদের দলীল হতে পারে না। কেননা, উসূল শাস্ত্রের কিতাবে একটি স্বীকৃত নীয়ম হল- কোন বিশেষ ঘটনা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলে তার বিপরিত ব্যাপকতার দলীল দ্বারা রোধ করা জায়েয নেই। এখানে বিশেষ দলীল দ্বারা হয়রত ঈসা আ. জীবিত থাকা প্রমাণিত হয়ে আসছে।

কাদিয়নাদের দলীল তিন

ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين

কাদিয়ানীরা এ আয়াতের নিম্নরূপ অনুবাদ করে- “তোমরা মাটির দেহের সাথে যমীনে অবস্থান করবে। এমনকি উপকৃত হবার দিন পূর্ণ করেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে।” -সূরা বাকারা ৩৬

এর সাথে কাদিয়ানীরা এ আয়াতও পাঠ করে فيها تحيون وفيها تخرجون “যেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।” -সূরা আরাফ ২৫

এ আয়াত দু’টি দ্বারা তারা এমর্মে দলীল দিয়ে থাকে যে, মানবজাতি এ ভূপৃষ্ঠে জীবন-যাপন করবে। তাই হযরত ঈসা আ. ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করে অন্যত্র কিভাবে জীবন-যাপন করবেন? -এযালায়ে আওহাম পৃ. ২৫০

মির্য়া কাদিয়ানী দাবী করে যে, উক্ত আয়াত মানবদেহকে আকাশে নিয়ে যাবার বিপক্ষে দলীল। কেননা, لكم এ স্থানে সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়। তা এ কথার ওপর সুস্পষ্ট প্রমাণবহন করে যে, মানবদেহ আকাশে যেতে পারে না। বরং ভূপৃষ্ঠ হতে বের হয়েই ভূপৃষ্ঠেই অবস্থান করবে এবং ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে।

উত্তর-১

কোন স্থান কারো জন্য স্থায়ীভাবে অবস্থানস্থল হবার দ্বারা এ কথা জরুরী নয় যে, সে সাময়িকভাবে কোথাও যেতে পারবে না। মানুষ প্লেনে সফর করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহাশূণ্যে অবস্থান করে। তাই বলে কি কোন নির্বোধ এ কথা বলতে পারবে যে, এতো কুরআনের আয়াতের খেলাফ হচ্ছে। কয়েক যুগ ধরে মানুষের মহাশূণ্যে সফরের ধারা শুরু হয়েছে। ১৯৬৯ সালে সর্বপ্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ পা রাখে। আল্লাহর কুদরতের বহু জিনিস যা এক সময় মানুষের বোধশক্তির বাইরে ছিল, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে তা মানুষ বাস্তবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছে। কাদিয়ানীর দাবী মানবদেহ আকাশে যেতে পারে না। যদি সত্য হয়, তবে নিল আর্মসটান, এ্যালদ্রন এরা কি ফেরেশতা ছিল যে, মহাশূণ্য অতিক্রম

করে চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছল? এ দ্বারা কুরআনের আয়াতের মোটেও খেলাফ হচ্ছে না। এ থেকে এ কথাও বুঝা যায় না যে, হযরত ঈসা আ. মৃত্যুবরণ করেছেন। বাস্তবতা হল, তাকে সাময়িক আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। পুনরায় নির্দিষ্ট সময়ে তিনি এ ভূপৃষ্ঠে আসবেন। এখানেই তার মৃত্যু হবে। এখানেই তাকে দাফন করা হবে।

উত্তর-২

উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এ কথায় ঐক্যমত যে, জনুর ক্ষেত্রে হযরত ঈসা আ. ফেরেশতাদের সাথে সদৃশ্য রাখে। তাই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যুর সপক্ষে একটি সহীহ হাদীসও পেশ করতে পারবে না।

প্রশ্ন নম্বর নয়

স্বশরীরে হযরত ঈসা আ.-এর উত্তোলন এবং অবতরণের পক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করুন। এর সাথে সাথে বর্ণনা সূত্রের প্রমাণও পেশ করুন। উত্তোলন এবং অবতরণের রহস্য কি? তাও ব্যক্ত করুন।

উত্তর

কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের দাবী- হযরত ঈসা আ.কে জীবিত আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বরং তার মৃত্যু হয়েছে। তাকে দাফন করা হয়েছে। তাদের যুক্তি হল মানবদেহ আকাশে যাওয়া সম্ভব নয়। -এযালায়ে আওহাম খ. ১ পৃ. ৪৭; রুহানী খাযায়েন খ. ৩ পৃ. ১২৬

উত্তোলন এবং অবতরণ কেবল কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিতই নয়, বরং এর অসংখ্য দৃষ্টান্তও রয়েছে।

১. যেভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে মিরাজ রাত্রিতে নভোমণ্ডল গিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তদ্রূপ হযরত ঈসা আ.-এর আকাশে উত্তোলন এবং কিয়ামতের প্রাক্কালে অবতরণও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

২. যেভাবে হযরত আদম আ.-এর আকাশ হতে অবতরণ সম্ভব হয়েছিল, তদ্রূপ হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণও সম্ভব। “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের ন্যায়।”

৩. হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব রাযি.-এর ফেরেশতাদের সাথে আকাশে উড়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাই তাকে “জাফর তাইয়ার”

বলা হয়। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, হযরত জাফরের পুত্র হাসান আবদুল্লাহর সূত্রে ইমাম তাবারী বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে বললেন, হে জাফরের পুত্র আবদুল্লাহ! তোমার পিতা ফেরেশতাদের সাথে আকাশে উড়ে বেড়ায়। (অপর এক বর্ণনায় আছে জাফর জিব্রাইল, মিকাইলের সাথে উড়ে বেড়ায়।) তাবুক যুদ্ধে তাঁর হাত কর্তনের বিনিময়ে তাঁকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়। -ফতহুল বারী খ. ৭ পৃ. ৬২; আযযরকানী শরহুল মাওয়াহেব খ. ২ পৃ. ২৭৫

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের ন্যায় তাঁকে দু'টি পর প্রদান করেছেন। এটি খুবই শক্তিশালী বর্ণনা। হযরত আলী রাযি. এ সম্পর্কে একটি কবিতাও পাঠ করেন-

وجعفر الذى يضحى ويمسى ☆ يطير مع الملائكة ابن امي

“জাফর সকাল-সন্ধ্যা ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়ায়, সে আমার মায়েরই সন্তান।”

৪. হযরত আমের ইবনে ফুহায়রা রাযি. “বিরে মুআওয়ানা” যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর তাঁর জানাযা আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। এ ঘটনা হাফেয আসকালানী আসাবায়, হাফেয ইবনে আবদিল বার ইস্তিয়াবে এবং আল্লামা যুরকানী শরহে মাওয়াহিবের ২ খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন।

জাব্বার ইবনে সালমা আমের ইবনে ফুহায়রার হত্যাকারী। সে এ ঘটনার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে যাহূহাক ইবনে সুফিয়ান কালাবীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং নিশ্চিন্ত মন্তব্য করে

دعانى الى الاسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة ورفعته الى السماء.

“আমের ইবনে ফুহায়রার শাহাদত বরণ এবং তাঁর আকাশে উঠে যাওয়াই আমার মুসলমান হবার কারণ।” যাহূহাক এ ঘটনা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লিখে প্রেরণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, فان الملائكة وارت جثته وانزل فى عيسى
“ফেরেশতা তার দেহকে লুকিয়ে ফেলে এবং ইল্লিইনে রাখে।”

ইমাম বাইহাকী এবং আবু নাসিম “দালায়েলুল নবুওয়ত” নামক গ্রন্থে উক্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

হাফেয আসকালানী আসাবা নামক গ্রন্থে জাব্বার ইবনে সালমার আলোচনা করতে গিয়ে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিতও করেছেন। শাইখ জালালউদ্দীন সুউতী রহ. ‘শরহুসসুদূর’ নামক গ্রন্থে বলেন, আমের ইবনে ফুহায়রার আকাশে উঠে যাবার ঘটনা ইবনে সাআদ হাকেম ও মুসা ইবনে উকবাও বর্ণনা করেছেন। মূলত এ ঘটনা বিভিন্ন সূত্র দ্বারা বর্ণিত হয়ে আসছে।

৫. ‘রজীর’ ঘটনায় মক্কার কুরাইশরা যখন হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.কে সূলিবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখে, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে উমইয়া যমিরী রাযি.কে তাঁর মৃতদেহ নামানোর জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর মৃতদেহ সূলী থেকে নামিয়েছেন মাত্র অমনি প্রচণ্ড ঝাকুনি অনুভব করলেন। পিছনে তাকাতে দেখতে পেলেন হযরত খুবাইবের মৃতদেহ ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত এর কোন সন্ধান কেউ পায়নি। ইমাম ইবনে হাম্বল রহ. স্বীয় মসনদে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। -যুরকানী শরহে মাওয়াহিব খ. ২ পৃ. ৭৩

শাইখ জালালউদ্দীন সুউতী রহ. বলেন, ভূপৃষ্ঠ হযরত খুবাইব রাযি.কে গিলে ফেলে। তাইতো তাকে “বলীউল আরদ” বলা হয়। আবু নাসিম রহ. বলেন, সঠিক ঘটনা হল আমের ইবনে ফুহায়রা রাযি.-এর ন্যায় খুবাইব রাযি.-এর মৃতদেহও ফেরেশতারা আকাশে উঠিয়ে নিয়েছে। আবু নাসিম রহ. আরো বলেন, যেভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আ.কে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন, তদ্রূপ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মাঝে আমের ইবনে ফুহায়রা রাযি., খুবাইব ইবনে আদী রাযি. এবং আলা ইবনে হাযরামী রাযি.কেও আকাশে উঠিয়ে নেন।

৬. উলামায়ে কেরাম আযীয়াগণের ওয়ারেস। তদ্রূপ উলামায়ে কেরামের এলহামও কেরামত। নবীগণের ওহী এবং মুজেষারও ওয়ারিস।

শাইখ জালালউদ্দীন সুউতী রহ. বলেন, আমের ফুহায়রা রাযি. এবং খুবাইব রাযি. উভয়ের আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ঘটনা ঐ ঘটনারই সমর্থন করে, যা নাসাঈ, বাইহাকী এবং তাবারানী যাবের রাযি. হতে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন। ওহোদের যুদ্ধে হযরত তালহা রাযি.-এর আঙ্গুল আঘাতপ্রাপ্ত

হয়। ব্যাখ্যায় তাঁর যুবান দিয়ে ‘হাসসা’ শব্দটি বের হয়। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি এর স্থলে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে তবে লোকেরা দেখতে পেত যে, ফেরেশতারা তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে মহাশূণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

ইবনে আবীদুন্নীয়া ‘যিকরুল মাউতা’ নামক গ্রন্থে যায়েদ ইবনে আসলাম হতে বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাইলের এক আবেদ পাহাড়ে ইবাদতে রত ছিল। যখন অনাবৃষ্টি দেখা দিত, তখন মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে বৃষ্টির দোআ করার জন্য আবেদন করত। তিনি প্রার্থনা করলে এর বরকতে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। ঐ আবেদের ইত্তিকাল হবার পর মানুষ তাঁর দাফন-কাফনের কাজে রত ছিল। হঠাৎ দেখতে পেল আকাশ হতে একটি কাষ্টখণ্ড অবতরণ করে ঐ আবেদের মৃতদেহের পাশে অবস্থান করছে। জনৈক ব্যক্তি আবেদের মৃতদেহ কাষ্টখণ্ডের ওপর রেখে দেয়ার পর তা উপরের দিকে উঠে যেতে লাগল। এক পর্যায়ে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। উপস্থিত লোকজন এ দৃশ্য অবলোকন করে। -শরহুসসুদূর পৃ. ২৫৭ ছাপা বয়রুত ১৯৯৪ ই.

৭. হযরত হারুন আ.-এর মৃতদেহ আকাশের দিকে উঠে যাওয়া এবং পরবর্তীতে হযরত মুসা আ.-এর প্রার্থনার বরকতে অবতরণ করার ঘটনা মুসতাদরিকে হাকেমি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। -মুসতারিক খ. ৩ পৃ. ৪৬৪ ছাপা বয়রুত

উপরোক্ত ঘটনাগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল, অবিশ্বাসী এবং মুলহিদরা যাতে উত্তমরূপে বুঝে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় এবং মুখলিস বান্দাদের বিশেষ পদ্ধতিতে সাহায্য করে থাকেন। কখনো কখনো তাদের ফেরেশতাদের মাধ্যমে আকাশে উঠিয়ে নন। দুশমন এ দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে। যাতে তাদের সম্মুখে আল্লাহর কুদরতের কারিশমা প্রকাশ পায়। এর দ্বারা যেন মুজেযা এবং কেরামত অস্বীকারকারী অপমানিত হয়। এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশের মাধ্যমে মুমিন, সত্যবাদীরা প্রশান্তি লাভ করে। মিথ্যাবাদীদের বিপক্ষে দলীল হয়ে দাঁড়ায়। এ ঘটনাগুলো দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মানবদেহ আকাশে উঠিয়ে নেয়া আল্লাহ তাআলার নিয়মের পরিপন্থীও নয়। বরং বিশেষ বিশেষ

ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল, তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাদের আকাশে উঠিয়ে নেন। এতে তাঁর কুদরতেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মানবজাতিও আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে অবগত হতে পারে। মোটকথা মানবদেহকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া কোন দূরহ এবং অসম্ভব নয়। বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষে তা সম্ভব। এমনিভাবে পানাহার ব্যতীত মানুষের জীবন-যাপন করাও সম্ভব।

অবতরণের হেকমত

১. হযরত ঈসা আ.-এর উত্তোলন এবং অবতরণের রহস্য সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন, ইহুদী সম্প্রদায় দাবী করত, আমরাই ঈসা আ.কে হত্যা করেছি। যেমন, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে, তাদের কথা আমরাই আল্লাহর রসূল ঈসা ইবনে মরীয়মকে হত্যা করেছি। -সূরা নিসা ১৫৭

শেষ যুগে দাজ্জাল আসবে। সেও ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। ইহুদীরা তার অনুগামী, অনুসারী হবে। তাই আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আ.কে জীবিত আকাশে উঠিয়ে নেন এবং কেয়ামতের প্রকালে আকাশ হতে অবতরণ করাবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। লক্ষণীয় যে, ইহুদীরা যে সত্তা সম্পর্কে দাবী করত, আমরা তাকে হত্যা করেছি, তা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাঁকে আল্লাহ তাআলা জীবিত আকাশে উঠিয়ে নেন এবং জীবিত রাখেন এবং তাঁকে তোমাদের হত্যার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। এর দ্বারা এ কথা যাতে প্রমাণিত হয় যে, যাকে তোমরা হত্যার দাবী করেছিলে, তাকে হত্যা করতে পারনি। বরং আল্লাহ তাআলা তোমাদের হত্যার জন্য তাকেই অবতরণ করাবেন। এ হেকমত ফতহুলবারীর ঈসা আ. অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ৩৫৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২. হযরত ঈসা আ.কে তৎকালীন শাম হতে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং শামেই তাঁকে প্রেরণ করা হবে। তাঁর মাধ্যমে শাম বিজয়ী হবে। যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের কয়েক বছর পরে মক্কা বিজয়ের জন্য সেখানে আগমন করেন। তদ্রূপ ঈসা আ.ও কিয়ামতের সন্নিহিতে আকাশ হতে অবতরণ করে শাম জয় লাভ করবেন। ইহুদীদের ধ্বংস করবেন।

৩. হযরত ঈসা আ. অবতরণ করে ত্রুশ ধ্বংস করবেন। এর রহস্য হল ইহুদী এবং খ্রীস্টানরা যে দাবী করে ঈসা আ.কে ত্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। তাঁকে ত্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। বরং তিনি আল্লাহর বিশেষ হেফাযতে ছিলেন। তিনি অবতরণ করে ত্রুশ ধ্বংস করবেন।

৪. কোন কোন উলামায়ে কেরাম এ রহস্যও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আশীয়ায়ে কেরাম হতে এমর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি তোমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পাও, তবে অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

বনী ইসরাইলের নবুওয়তের ধারা হযরত ঈসা আ. আগমনের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হয়। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেন। যে সময় দাজ্জাল আগমন করবে, তখন আকাশ হতে প্রেরিত হবেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের সাহায্য করবেন। দাজ্জাল প্রকাশ পাবার পর উম্মতে মুহাম্মদী কঠিন বিপদে নিমজ্জিত হবে। তারা সাহায্যের মুহতাজ হবে। তাই হযরত ঈসা আ. সে সময় অবতরণ করে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সাহায্য করবেন। যে অঙ্গীকার আশীয়ায়ে কেরাম করেছিলেন, হযরত ঈসা আ. নিজের এবং সকল নবীগণের পক্ষ হতে তা পূর্ণ করার জন্য আগমন করবেন।

প্রশ্ন নম্বর দশ

হযরত ঈসা আ.-এর হায়াত সম্পর্কে কাদিয়ানী সম্প্রদায় যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায়, এর তিনটি উল্লেখ করে উত্তর প্রদান করুন।

উত্তর

কাদিয়ানীদের উত্থাপাতি প্রশ্ন এক.

হযরত ঈসা আ. আকাশে জীবিত হলে সেখানে কি পানাহার করেন?

উত্তর-১

মানুষ যখন এ দুনিয়া থেকে উর্ধ্বাকাশে চলে যায়, তখন সেখানে আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য পায়। পার্থিব জীবনের উপায়-উপকরণ তাকে পায় না। এভাবেও বলা যায় যে, পার্থিব জীবনে দেহ প্রাধান্য পায়, আর সেখানে আত্মার প্রাধান্য। দেহ হয় আত্মার অধীনস্ত। সুতরাং হযরত ঈসা আ. সেখানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আধ্যাত্মিক খাদ্য লাভ করে থাকেন। তিনি কি পানাহার করেন, এ ধরনের প্রশ্ন অবান্তর।

২. আসহাবে ফীল তিনশত বছর ধরে পানাহার ব্যতীত জীবিত থাকার কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا

‘তারা তাদের গুহায় তিনশত বছর অবস্থান করেছিল, আরও নয় বছর অধিক। -সূরা কাহাফ ২৫

৩. হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দাজ্জাল প্রকাশ পাবার পর প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। ঈমানদারদের জন্য খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য হবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! তখন ঈমানদারদের কি অবস্থা হবে? তিনি ইরশাদ করলেন,

يجزئهم ما يجرى اهل السماء من التسبيح والتقديس

অর্থাৎ সে সময় ফেরেশতাদের ন্যায় ঈমানদারদের আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা এবং তাসবীহ আদায় খাদ্যের কাজ দিবে। -মিশকাত পৃ. ৪৭৭

৪. হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘সওমে বিসাল’-লাগাতর রোযা রাখতেন। তিনি বলতেন, ايكم “তোমাদের মধ্যে কে আমার মত আছ যে, লাগাতর রোযা রাখবে। আমার প্রতিপালক আমাকে গায়েব হতে

পানাহার করান। গায়েবী খাবারই আবার খাদ্য।” এ থেকে জানা গেল যে, পানাহার একটি ব্যাপক বিষয়। যা কখনো অনুভব হয় এবং কখনো গায়েবী হয়। সুতরাং ‘প্রত্যেক দেহই খাদ্য গ্রহণ করে’ এর দ্বারা মানবদেহ পানাহার ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে না বলা সঠিক নয়।

৫. জান্নাতে হযরত আদম আ. পার্থিব জগতের খাদ্যগ্রহণ করেননি। সুতরাং হযরত ঈসা আ.ও জিবরাইলের ফুতে জন্মলাভ করেছেন। তাই তার মতই তাসবীহ এবং তাহলীলের মাধ্যমেই জীবন-যাপন করছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে **ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم** ‘আল্লাহর নিকট ঈসা আদমের ন্যায়।’ -সূরা আলে ইমরান ৫৯। আদম আ. আকাশে যা আহার করতেন, ঈসা আ.ও তাই আহার করছেন।

৬. হযরত ইউনুস আ. মাছের পেটে পানাহার ব্যতীত জীবিত থাকার কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, **فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون** ‘সুতরাং যদি তিনি আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী না হতেন, তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন মাছের পেটে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।’ -সূরা সাফ্যাত ১৪৩, ১৪৪। এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউনুস আ. যদি তাসবীহ পাঠকারী না হতেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই অবস্থান করতেন এবং পানাহার ব্যতীতই জীবিত থাকতেন।

কাদিয়ানীদের প্রশ্ন দুই

যে ব্যক্তি আশি এবং নব্বই বছরে উপনীত হয়, সে অঙ্ক হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, **ومنكم من يرد الى اذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا** ‘এবং তোমাদের মধ্যে কতককে উপনীত করা হবে নিকৃষ্ট অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা জানত সে সম্বন্ধে অঙ্ক হয়ে যাবে।’ -সূরা নাহল ৭০

উত্তর

১. ‘আরযালুল উমর’-এর ব্যাখ্যায় কাদিয়ানী নিজের পক্ষ হতে আশি কিংবা নব্বই বছরের সীমা লাগিয়েছে। কুরআন-হাদীসের কোথাও এর সীমা নির্ধারিত হয়নি।

২. আসহাবে ফীল তিনশত বছর জীবিত থেকেও তো অজ্ঞ হয়ে যায়নি।

৩. হযরত আদম আ. এবং হযরত নূহ আ. শতশত বছর জীবিত ছিলেন। আর নবীদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাওয়া অসম্ভব।

কাদিয়ানীদের প্রশ্ন তিন

ভূপৃষ্ঠ থেকে নভোমণ্ডল পর্যন্ত দূরত্ব মাত্র কয়েক মিনিটে অতিক্রম করা কিভাবে সম্ভব?

উত্তর

১. আধুনিক বিজ্ঞানীদের মন্তব্য হল আলোর গতি প্রতি মিনিটে এক কুটি বিশলক্ষ মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে। বিদ্যুৎ এক মিনিটে পাঁচশ বার পৃথিবী প্রদিক্ষণ করে থাকে। কোন কোন তারকা এক ঘণ্টায় আটলক্ষ আশি হাজার মাইল ব্যাপী নড়াচড়া করে। এ ছাড়াও মানুষ যখন দৃষ্টি ওপরের দিকে উঠিয়ে তাকায়, তখন তার দৃষ্টি এক মুহূর্তেই আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যদি আকাশ অন্তরায় না হত, তাহলে আরো দূর পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি পৌঁছা সম্ভব ছিল।

২. সূর্য উদিত হবার সময় এক মুহূর্তে গোটা দুনিয়ায় তার আলো ছড়িয়ে যায়। অথচ গোটা দুনিয়া হল ৩৬৩৬৩৬ ফরসখ। এ তথ্য সাবউশিদাদ নামক গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে। তিন মাইলে এক ফরসখ হয়। ৬১০৯০৯০৮কুটি মাইল। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের অভিমত হল, সূর্য পরিপূর্ণরূপে উদিত হবার পর মহাশূণ্যে ৫১৯৬০০ লক্ষ ফরসখ নড়াচড়া করে। প্রত্যেক ফরসখ যেহেতু তিন মাইল। তই মোট দূরত্ব হল ১৫৫৮৮০০ লক্ষ মাইলের।

৩. যেখানে শয়তান এবং জিনের পক্ষে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এক মুহূর্তে অতিক্রম করা সম্ভব, সেখানে জগত শ্রষ্টা আল্লাহ তাআলা কি এর ক্ষমতা রাখে না? তিনি তাঁর কোন বিশেষ বান্দাকে কয়েক মুহূর্তে এতো দীর্ঘ দূরত্ব পরিভ্রমণ করাতে সক্ষম হবেন না?

৪. আসিফ ইবনে বরখিয়ার রানী বিলকিসের সিংহাসনকে সুলাইমান আ.-এর খেদমতে চোখের পলক ফেলার পূর্বে উপস্থিত করে দেন। অথচ বিলকিসের দেশে যেতে কয়েক মাস লেগে যেত। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وقال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه
مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ○

‘যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আমি তা আপনাকে এনে দেব আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই। অতঃপর সুলাইমান যখন তা তার সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন, তখন বললেন, এতো আমার রবের একটি অনুগ্রহ।’ -সূরা নামল ৪০

৫. এমনিভাবে বায়ু হযরত সুলাইমান আ.-এর বশীভূত হবার কথাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। তাঁর সিংহাসন যেখানে ইচ্ছে উড়িয়ে নিয়ে যেত। কয়েক মাসের দূরত্ব মাত্র কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করত। যেমন, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে, فسخرن له الريح تجري بأمره বায়ুকে তার বশীভূত করে দিলাম। যা তার নির্দেশে যেখানে তিনি ইচ্ছা করতেন সেখানে মৃদু গতিতে প্রবাহিত হত।’ -সূরা সাদ ৩৬

৬. বর্তমানে মুলহিদরাতো প্লেনের হাজার মাইল দূরত্বের পথ ঘণ্টায় অতিক্রম করার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে। কি জানি তারা সুলাইমান আ.-এর সিংহাসনের প্রতি বিশ্বাস রাখে কিনা? প্লেন তো মানুষের আবিস্কৃত মেশিনের সাহায্যে উড়ে থাকে। পক্ষান্তরে সুলাইমান আ.-এর সিংহাসন আল্লাহর নির্দেশে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত। এতে কোন মানুষের দখল ছিল না। এটি নবীর মুজেরা ছিল।

কাদিয়ানীদের প্রশ্ন চার

মির্য়া কাদিয়ানী লিখে, মানবদেহ আকাশে গমন করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কেননা, একটি মানবদেহ অগ্নিমণ্ডল এবং হিমমণ্ডল কিভাবে সুস্থ এবং নিরাপদে অতিক্রম করতে পারে?

নোট : অগ্নিমণ্ডল এবং হিমমণ্ডলের ধারণা প্রাচীন গ্রীক দর্শনের আবিষ্কার। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ চাঁদে এখন ভূমি এলটমেন্ট দেয়াও শুরু করেছে। প্রশ্ন জাগছে মহাশূণ্যের কোথায় অগ্নিমণ্ডল এবং হিমমণ্ডল আছে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির এ যুগে গ্রীক দর্শনের উদ্ভট ধারণা পেশ করার কি প্রয়োজন আছে? এ ছাড়াও এ বিষয়ে আশীয়ায়ে কেরামের জীবনি থেকে উত্তর পাওয়া যাবে।

উত্তর

১. যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতে এবং ফেরেশতার দ্বারা দিনরাত্রি অগ্নিমণ্ডল ও হিমমণ্ডল অতিক্রম করেছে, সেভাবেই হযরত ঈসা আ. তা অতিক্রম করবেন। যে পথ দিয়ে হযরত আদম আ. আকাশ হতে অবতরণ করেছেন, সেপথেই হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণ করা সম্ভব।

২. হযরত ঈসা আ.-এর নিকট আকাশ হতে খাদ্যেপূর্ণ তশতরী অবতরণের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে

اذ قال الحواريون يعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ○ قالوا نريد ان ناكل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ○ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا و اخرنا و اية منك و ارزقنا وانت خير الرزقين ○ قال الله اني منزلها عليكم

“স্মরণ কর সে সময়েকে যখন হাওয়ারীরা বলেছিল, হে ঈসা ইবনে মরীয়ম! আপনার রব কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাজা প্রেরণ করতে পারেন? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। তারা বলল, আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাব এবং আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জেনে নেব যে, আপনি আমাদের সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষী হয়ে যাব। ঈসা ইবনে

মরীয়ম বললেন, হে আল্লাহ আমাদের রব! প্রেরণ করুন আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যভর্তি খাঞ্জা, যা হবে আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ, আর আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে জীবিকা দান করুন, আর আপনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। আল্লাহ বললেন, অবশ্যই আমি তা তোমাদের কাছে প্রেরণ করব।” -সূরা মায়েরা ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫

খাদ্যভর্তি খাঞ্জা তো অগ্নিমণ্ডল অতিক্রম করেই এসেছে। সে মতে মির্যা গোলাম আহমদের ভুল ধারণানুযায়ী খাদ্যভর্তি খাঞ্জা জ্বলে ছায়ভস্ম হয়ে যাবার কথা। নাউযুবিল্লাহ। এসবই হচ্ছে মানুষরূপি শয়তানদের মন্তব্য। এ জাতীয় মন্তব্য আশীয়া কেরামকে অস্বীকার করার বাহানা মাত্র।

৩. আল্লাহ তাআলা কি ঈসা আ.-এর জন্য অগ্নিমণ্ডলকে ইবরাহীম আ.-এর ন্যায় শিতল এবং শান্তিময় করে দিতে সক্ষম নন? আল্লাহ তাআলা নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحن الذى بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ○

“যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, হও, অমনি তা হয়ে যায়।” -সূরা ইয়াসীন ৮২

এটম বোমা

এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করার পূর্বে কাদিয়ানীর দু’টি উদ্ধৃতি পেশ করা হল। প্রথম উদ্ধৃতিতে কাদিয়ানী সুস্পষ্টভাবে হযরত মুসা আ.কে জীবিত বলে স্বীকার করে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে হযরত মুসা আ. জীবিতাবস্থায় আসমানে অবস্থান করছেন বলে স্বীকৃতি দেয়। উদ্ধৃতি দু’টির উপকারিতা হল, যখন কোন কাদিয়ানী প্রশ্ন করবে যে, ঈসা আ. আসমানে কিভাবে গিয়েছেন? তাৎক্ষণিকভাবে এর উত্তরে বলবেন, যেভাবে হযরত মুসা আ. গিয়েছেন। তারা প্রশ্ন করে আসমানে কি খায়? উত্তরে বলুন, মুসা আ. যা খান তাই। উদ্ধৃতি দু’টি নিম্নে পেশ করা হল:

بل حیات کلیم الله ثابت بنص القرآن الکریم الا تقرأ فی القرآن ما قال الله تعالى عزوجل فلا تکن فی مریة من لقاءه. وانت تعلم ان هذه الآية نزلت فی موسى فهی دلیل صریح علی حیات موسى علیه السلام لأنه لقی رسول الله ﷺ والاموات لا یلاقون الاحیاء ولا تجد تمثیل هذه الآیات فی شان عیسی علیه السلام نعم جاء ذکر وفاته فی مقامات شتى.

-রুহানী খাযায়েন খ.৭, পৃ.২২১

هذا موسى فتی الله الذی اشار الله فی كتابه الى حیاته وفرض علينا ان نؤمن انه حی فی السماء ولم یمیت وليس من المیتین.

-রুহানী খাযায়েন খ.৮, পৃ.৬৯

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এমন হতভাগা ছিল যে, সব কথাতেই সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করত।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিহাদ অব্যাহত থাকবে।

কাদিয়ানী বলল, জিহাদ হারাম।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নবুওয়ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কাদিয়ানী বলল, অব্যাহত আছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈসা আ. জীবিত।

কাদিয়ানী বলল, মৃত্যুবরণ করেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশ্বাস হল, হযরত মুসা আ. মৃত্যুবরণ করেছেন। কাদিয়ানী বলল, আসমানে জীবিত আছেন।

যে ব্যক্তি রসূলের কথার বিরোধিতা করে, সে ইবলিস হতেও বড় কাফের।

মির্য়া গোলাম আহমদের মিথ্যাচার

প্রশ্ন নম্বর এক

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করুন। তার নবুওয়তের দাবী করা পর্যন্ত বিভিন্ন সময় যে সব দাবী করেছে, তাও স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর

নাম এবং বংশ পরিক্রমা

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে লিখে, “আমার নাম গোলাম আহমদ। পিতার নাম গোলাম মুরতাযা। দাদার নাম আতা মুহাম্মদ। গুল মুহাম্মদ হল পর দাদার নাম। মুগল বরলাস হল আমার বংশ। আমার বংশের মুরব্বীদের যেসব পুরাতন কাগজপত্র আমার নিকট সংরক্ষিত আছে- তা থেকে জানা যায় যে, তারা সমরকন্দ থেকে এ দেশে আগমন করেছেন।” -কিতাবুল বারীয়া হাশিয়া পৃ. ১৩৪; রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ১৬২-১৬৩

জন্ম তারিখ এবং জন্মস্থান

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পৈত্রিক ভূমি হল কাদিয়ান। বাটালা হল তহসিল। জেলা গুরুদাসপুর পাঞ্জাব। জন্ম তারিখ সম্পর্কে তার বক্তব্য হল-

“আমার জন্ম ১৮৩৯ অথবা ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে আমি ১৬-১৭ বছরের কিশোর ছিলাম।” -কিতাবুল বারীয়া হাশিয়া পৃ. ১৪৬; রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ১৭৭

শিক্ষা

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানেই কয়েকজন শিক্ষকের নিকট হতে শিক্ষাগ্রহণ করে। এ সম্পর্কে মির্য়া নিজেই নিম্নরূপ বর্ণনা করে:

“শিশুকালে আমার শিক্ষালাভ এভাবে হয় যে, আমার ছয়-সাত বছর বয়সে ফার্সি শিখার জন্য একজন শিক্ষককে আমার জন্য চাকর রাখা হয়।

(শিক্ষকের জন্য কল্পিত শব্দ চয়ন করল-লেখক) তার নাম ছিল ফযলে এলাহি। আমার বয়স দশে যখন উপনীত হল, তখন আমার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আরবী শিক্ষক রাখা হয়। তার নাম ছিল ফযল আহমদ। আমি মনে করি যে, যেহেতু আমার শিক্ষা আল্লাহর বিশেষ ফযলে হয়েছিল, তাই আমার শিক্ষকদের নামের প্রথম অংশ হল ফযল। উল্লিখিত মৌলভী সাহেব একজন দ্বীনদার এবং বুয়ুর্গ ছিলেন। তিনি খুবই যত্ন এবং পরিশ্রম করে পড়াতেন। আমি ছরফ (আরবী শব্দবিন্যাস শাস্ত্র) এবং নাহবের (আরবী বাক্যবিন্যাস শাস্ত্র) কিছু নীয়মনীতি তাঁর নিকই পড়ি। আমার বয়স ১৭/১৮ বছরে উপনীত হলে একজন মৌলভী সাহেবের নিকট কয়েক বছর পড়ার সৌভাগ্য হয়। তার নাম ছিল গুল আলী শাহ। তাকে আমার পিতা কাদিয়ানে অবস্থান করে পড়ানোর জন্য নওকর রেখেছিলেন। শেষোক্ত মৌলভী সাহেবের নিকট নাহব, মানতেক এবং হেকমতসহ বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী অধ্যয়ন করি। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব পিতার নিকট অধ্যয়ন করি। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ছিলেন। সে সময়ে কিতাব অধ্যয়নে এতো মনোনিবেশ ছিলাম যে, মনে হত দুনিয়াতে ছিলাম না।” —কিতাবুল বারীয়া হাশিয়া পৃ. ১৬১-১৬৩, রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ১৭৯-১৮১

যৌবন এবং চাকুরী

যখন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যৌবনে পদার্পন করে তখন কিছু নাদান বন্ধুদের কল্যাণে বেপরওয়া জীবন-যাপন করতে শুরু করে। নিম্নের ঘটনা থেকে এ সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যায়। মির্যা পুত্র বশীর আহমদ লিখে:

“আমাকে আমার পিতা বলেন, যৌবনকালে একবার হযরত মসীহ মাউদ (মির্যা) তোমার দাদার পেনশন উঠানোর জন্য গেল। মির্যা ইমামুদ্দীনও পিছনে পিছনে আসল। পেনশন উসূল করার পর সে তাকে ধোঁকা দিয়ে কাদিয়ানে না এসে অন্যত্র নিয়ে যায়। এদিক সেদিক ঘুরতে লাগল। সব টাকা শেষ করে সে তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। হযরত মসীহ মাউদ লজ্জায় ফিরে আসেননি এবং যেহেতু তোমার দাদার ইচ্ছা হল কোথাও কোন চাকুরীর ব্যবস্থা হয়ে যাক। তাই তিনি শিয়ালকোট শহরে ডিপটি কমিশনারের কার্যালয়ে সল্ল বেতনের চাকুরী নিল।”

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-১৯৯

-সীরাতুল মাহদী খ. ১, পৃ.৪৩, রেওয়ায়েত ৪৯, লেখক সাহেবযাদা বশীর আহমদ কাদিয়ানী

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে প্ররোচনাকারী মির্য়া ইমামুদ্দীন কোন ধরনের লোক ছিল তা নিম্নের মন্তব্যে বুঝা যায়।

“মির্য়া নিয়ামউদ্দীন এবং মির্য়া ইমামুদ্দীন এরা সীমাহীন বেদ্বীন এবং নাস্তিক স্বভাবের ছিল।” -সীরাতুল মাহদী খ.১, পৃ. ১১৪ রেওয়ায়েত ১২৭

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক

শিয়ালকোট চাকুরীর সময় মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইউরোপিয়ান মিশনারী এবং ইংরেজ অফিসারদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে। ধর্মীয় আলোচনার ছদ্মাবরণে খ্রীস্টান পাদ্রীদের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করত। তাদের সহায়তা-সহযোগিতারও পূর্ণ আশ্বাস দেয়। মির্য়া মাহমুদ রচিত সীরাতে মসীহ মাউদের ১৫পৃষ্ঠায় বৃটিশ ইন্টালেজিস শিয়ালকোট মিশনের ইনচার্জ মিষ্টার রিওয়ান্ট বাটলারের সাথে মির্য়ার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ হয়েছে। এটি ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের কথা। এর কিছু দিন পর মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী শিয়ালকোটের কাচারীর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কাদিয়ানে বাস করতে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে লেখালিখি শুরু করে। মির্য়া শিয়ালকোটের ডিপটি কমিশনারের কাচারীতে ১৮৬৪ সাল থেকে নিয়ে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত চার বৎসর চাকুরী করে। -সীরাতুল মাহদী খ. ১ পৃ. ১৫৪-১৫৮

ইসলামের সত্যতা প্রমাণের স্লোগানে ইসলামকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্র

কাদিয়ান পৌছেই প্রথমে সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গোলাম আহমদ কাদিয়ানী খ্রীস্টান, হিন্দু, আর্যদের সাথে অসম্পূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠান করে। এরপর ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বারাহীনে আহমদীয়া নামক একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করে। যাতে অধিকাংশ বিষয় সাধারণ মুসলমানের আকীদা নিয়ে লেখা। এর সাথে সাথে নিজের কিছু এলহামের কথাও অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য লিখিত গ্রন্থের মাধ্যমে কৌশলে ইংরেজদের পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং বলিষ্ঠভাবে জিহাদ হারামের ঘোষণা দেয়। মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়াত-২০০

থেকে নিয়ে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বারাহীনে আহমদীয়ার চার খণ্ড লিখে।
১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করে।

মির্খার দাবীসমূহ

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ হতে মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বিভিন্ন দাবী শুরু করে। তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দাবী নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. ১৮৮০ সালে আল্লাহর পক্ষ হতে এলহাম পাবার দাবী করে।

২. ১৮৮২ সালে মুজাদ্দিদ হবার দাবী করে।

৩. ১৮৯১ সালে মসীহ মাউদ হবার দাবী করে।

৪. ১৮৯৯ সালে যিল্লী-বুরুখী নবী হবার দাবী করে।

৫. ১৯০১ সালে শরীয়তধারী পৃথক নবী দাবী করে।

এছাড়াও সে সময় সময় বিস্ময়কর কিছু দাবী করে।

বায়তুল্লাহ হবার দাবী

“খোদা এলহামের মাধ্যমে আমার নাম বায়তুল্লাহ রেখেছেন।”
-আরবাইন ৪ পৃ. ১৫, হাশিয়া, রুহানী খাযায়েন খ. ১৭ পৃ. ৪৪৬

১৮৮২ সালে মুজাদ্দিদ হবার দাবী

“যখন তেরশত শতাব্দির শেষ এবং চৌদ্দশত শতাব্দি শুরু হয়, তখন আল্লাহ তাআলা এলহামের মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, তুমি এ শতাব্দির মুজাদ্দিদ।” -কিতাবুল বারীয়া পৃ. ১৮৩, হাশিয়া, রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ২০১

১৮৮২ সালে মামুর মিনাল্লাহ হবার দাবী

“আমি আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়ে প্রেরিত হয়েছি।” -নুসরাতুল
হক বারাহীনে আহমদীয়া খ. ৫ পৃ. ৫২; রুহানী খাযায়েন খ. ২১ পৃ. ৬৬;
কিতাবুল বারীয়া পৃ. ১৮৪, হাশিয়া, রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ২০২

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়াত-২০১

১৮৮২ সালে ভীতি প্রদর্শনকারী হবার দাবী

الرحمن علم القرآن لتندرقوما ما انذر ابائهم

“আল্লাহ তোমাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে ঐ সমস্ত লোকদের ভীতি প্রদর্শন করবে যাদের পূর্ব পুরুষেরা ভীত হয়নি।” - তাযকিয়া পৃ. ৪৪; যরুরতুল ইমাম পৃ. ৩১; রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ৫০২; বারাহীনে আহমদীয়া খ. ৫ পৃ. ৫২; রুহানী খাযায়েন খ. ২১ পৃ. ৬৬

১৮৮৩ সালে আদম, মরীয়ম এবং আহমদ হাবার দাবী

يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة يا احمد اسكن انت وزوجك الجنة تفخت فيك من لدنى روح الصديق.

“হে আদম, হে মরীয়ম, হে আহমদ! তুমি এবং যে তোমার অনুসারী সাথী জান্নাতে অর্থাৎ প্রকৃত মুক্তির স্থানে প্রবেশ কর। আমি আমার পক্ষ হতে সত্যতার রুহ তোমার মাঝে ফুকে দিলাম।” - তাযকিয়া পৃ. ৭০; বারাহীনে আহমদীয়া পৃ. ৪৯৭; রুহানী খাযায়েন খ. ১ পৃ. ৫৯০

ব্যাখ্যা : মরীয়ম দ্বারা ঈসার মাতা মরীয়ম উদ্দেশ্য নয়। আদম দ্বারা মানব-জাতির পিতা আদম উদ্দেশ্য নয়। না আহমদ দ্বারা এ স্থানে হযরত খাতামুল আশীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য। তেমনিভাবে ঐ এলহামের সকল স্থানে মূসা, ঈসা ও দাউদসহ বিভিন্ন নাম নেয়া হয়েছে, সেসব নাম দ্বারা তারা উদ্দেশ্য নয়। বরং সর্বত্র এই অধমই উদ্দেশ্য।” - মাকতুবাতে আহমদীয়া খ. ১ পৃ. ৮২; মাকতুবাতে বনামে মীর আব্বাস আলী। উদ্ধৃত তাযকিয়া পৃ. ৭১-৭২; হাশিয়া

১৮৮৪ সালে রেসালতের দাবী

انى فضلنك على العالمين قل ارسلت اليكم جميعا ‘আমি তোমাকে গোটা জাহানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। বলে দাও, আমাকে তোমাদের সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।’ - তাযকিয়া পৃ. ১২৯; মাকতুবাতে হযরত মসীহ মাউদ মির্যা, তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৪, আরবাইন নম্বর ২ পৃ. ৭; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭ পৃ. ৩৪৩

১৮৮৬ সালে তাওহীদ এবং তাফরীদ (নিঃসঙ্গ) হবার দাবী

‘তার নিকট এলহাম হয় যে, তুমি আমার নিকট এমন, যেমন আমার তাওহীদ এবং তাফরীদ (নিঃসঙ্গ)।’ -তায়কিরা পৃ. ৩৮১ দ্বিতীয় সংস্করণ

‘তুমি আমার হতে, আমি তোমার হতে।’ -তায়কিরা পৃ. ৪৩৬ ২য় সংস্করণ

১৮৯১ সালে মসীহর সদৃশ্য হবার দাবী

‘আল্লাহ জালা শানুহর ওহী এবং এলহামের দ্বারাই আমি মসীহর সদৃশ্য হবার দাবী করি। আমার নিকট এ কথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, আমার সম্পর্কে প্রথমে কুরআন শরীফ এবং নবীর হাদীসে সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং অঙ্গীকার করা হয়েছে।’ -তায়কিরা পৃ. ১৭২ তৃতীয় সংস্করণ, তাবলীগে রেসালত খ. ১, পৃ. ১৫৯; মজমুআ ইশতিহারাত খ. ১ পৃ. ২০৭

১৮৯১ সালে মসীহ ইবনে মরীয়ম হবার দাবী

‘এলহাম হয়েছে যে, جعلناك المسيح بن مريم (আমি তোমাকে মসীহ ইবনে মরীয়ম করেছি।) তাদের বলে দাও আমি ঈসার কদমের ওপর এসেছি।’ -তায়কিরা পৃ. ১৮৬ তৃতীয় সংস্করণ; এয়ালায়ে আওহাম পৃ. ৪৩৪; রুহানী খাযায়েন খ. ৩ পৃ. ৪৪২

‘ইবনে মরীয়মের আলোচনা পরিত্যাগ কর। তার চেয়ে উত্তম হল গোলাম আহমদ।’ -দাফিউল বালা পৃ. ২০; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২৪০

১৮৯২ সালে ‘কুন ফায়াকুন’-এর ক্ষমতা রাখার দাবী করা

এলহাম হয়েছে, انما امرك اذا اردت شيئا ان يقول له كن فيكون “তোমার কথা হল, তুমি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করবে, তখন তাকে বলবে হয়ে যাও, তা হয়ে যাবে।” -তায়কিরা ২০৩ তৃতীয় সংস্করণ; বারাহীনে আহমদীয়া খ. ৫ পৃ. ৯৫, রুহানী খাযায়েন খ. ২১, পৃ. ১২৪

১৮৯৮ সালে মসীহ এবং মাহদী হবার দাবী

بشرني وقال ان المسيح الموعود الذي يرقبونوه والمهدي المسعود الذي ينتظرونه هو انت.

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-২০৩

‘আল্লাহ আমাকে সুসংবাদ প্রদান করেন এবং বলেন যে, ঐ মসীহ মাউদ এবং মাহদী মাসউদ যার প্রতিক্ষা করে সেই হল তুমি।’ -তায়কির পৃ. ২৫৭ তৃতীয় সংস্করণ; এতমামুল হুজ্জাত পৃ. ৩; রুহানী খাযায়েন খ. ৮ পৃ. ২৭৫

১৮৯৮ সালে যুগের ইমাম হবার দাবী

‘সুতরাং এ সময় আমি নির্দিধায় বলতে পারি যে, আল্লাহর ফযল ও দয়ায় যুগের ইমাম হলাম আমি।’ - যরুরতুল ইমাম পৃ. ২৪; রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ৪৯৫

১৯০০ সাল থেকে নিয়ে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত যিল্হী নবী হবার দাবী

‘যখন আমি বুরূযীভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বুরূযী রঙে মুহাম্মদী কামালাত নবুওয়তে মুহাম্মদীয়া আমার যিল্লিয়াতের আয়নার অনুরূপ, তখন এমন কোন মানুষ আছে, যে পৃথকভাবে নবুওয়তের দাবী করবে।’ -এক গলতী কা এযালা পৃ. ৮; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২১২

নবুওয়ত ও রেসালাতের দাবী

১. انا انزلناه قريبا من القاديات

‘আমি তাকে কাদিয়ানের নিকটবর্তী অবতীর্ণ করেছি।’ -বারাহীনে আহমদীয়া হাশিয়া পৃ. ৪৯৯; রুহানী খাযায়েন খ. ১ পৃ. ৫৯৩; আলহাকাম সংখ্যা ৩০, তারিখ ২৪ আগস্ট ১৯০০ উদ্ধৃতি তায়কির পৃ. ৩৬৭ তৃতীয় সংস্করণ

২. ‘সত্য খোদা তিনি যিনি কাদিয়ানে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছেন।’ -দাফিউল বালা পৃ. ১১; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২৩১

৩. ‘আমি রসূলও এবং নবীও অর্থাৎ প্রেরণ করা হয়েছে। এবং খোদা হতে অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্তও।’ -এক গলতী কা এযালা পৃ. ৭; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২১১

৪. ‘খোদা তিনিই যিনি স্বীয় রসূলকে অর্থাৎ এ অক্ষমকে হেদায়েত, সত্যদ্বীন এবং উত্তম চরিত্র দিয়ে প্রেরণ করেছেন।’ -আরবাইন নম্বর ৩; পৃ. ৩৬; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭ পৃ. ৪২৬ যমীমা; তোহফায়ে গ্লোরিয়া পৃ. ২৪; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭ পৃ. ৭৩

৫. ‘ঐ ক্ষমতাবান খোদা যিনি কাদিয়ানীকে প্রেগ হতে নিরাপদ রেখেছেন। কেননা, তোমরা জেনে রাখ তিনি রসূলকে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছেন।’ -দাফেউল বালা পৃ. ৫; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২২৫, ২২৬

স্বতন্ত্র শরীয়তধারী রসূল এবং নবী হবার দাবী

১. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اى مرسل من الله

‘বল, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রসূল হয়ে আগমন করেছি।’ -ইশতিহার মিয়াকুল আখবার পৃ. ৩; মজমুআ ইশতিহারাত খ. ৩ পৃ. ২৭০; তায়কিরা পৃ. ৩৫২ তৃতীয় সংস্করণ

২. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا.

‘আমি তোমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছি। ফেরাউনের নিকট প্রেরিত রসূলের ন্যায়।’ -হাকীকাতুল ওহী ১০১; রুহানী খাযায়েন খ. ১২ পৃ. ১০৫

৩. ‘এবং যদি বল যে, শরীয়তধারী ব্যক্তি মিথ্যার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী নয়। প্রথমত এ দাবী ভিত্তিহীন। আল্লাহ শরীয়তের সাথে মিথ্যার কোন শর্ত জুড়ে দেননি। এ ছাড়াও শরীয়ত কি তা বুঝতে হবে? যে ব্যক্তি ওহীর মাধ্যমে আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করল, স্বীয় উম্মতের জন্য আইন নির্ধারণ করল, সেই শরীয়তধারী। সুতরাং এ সংজ্ঞার আলোকে আমার বিরোধীরা অপরাধী। কেননা, আমার শরীয়তে আদেশ-নিষেধ উভয়টি আছে। যেমন এলহাম হয়,

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم.

(মুমিনদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে, লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এটাই তাদের পরিশুদ্ধতা) এ উক্তি বারাহীনে আহমদীয়াতে উল্লেখ হয়েছে। এতে আদেশও আছে, নিষেধও আছে। এভাবে তেইশ বছর অতিক্রম হয়েছে। এমনভাবে আজ পর্যন্ত আমার ওহীতে আদেশও আছে, নিষেধও আছে। যদি বল যে, শরীয়ত দ্বারা ঐ শরীয়ত উদ্দেশ্য যাতে নতুন বিধি-বিধান থাকবে, তবে এ ধারণাও বাতিল। আল্লাহ বলেছেন,

ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى

অর্থাৎ কুরআনী শিক্ষা তাওরাতের বিদ্যমান আছে। যদি বল যে, শরীয়ত দ্বারা এমন শরীয়ত উদ্দেশ্য যাতে পরিপূর্ণ বিধি-নিষেধ বিদ্যমান আছে। তবে এ ধারণাও বাতিল। কেননা, যদি তাওরাত এবং কুরআনে পূর্ণ বিধি-নিষেধ উল্লেখ থাকত, তবে ইজতিহাদের কোন সুযোগ থাকত না।’ -আরবাইন নং ৪ পৃ. ৬; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭ পৃ. ৪৩৫, ৪৩৬

يس انك لمن المرسلين على صراط مستقيم .8

‘হে সরদার! তুমি সহজ সরল পথে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত।’
-হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১০৭; রুহানী খাযায়েন খ. ২২ পৃ. ১১০

فكلمنى ونادانى وقال انى مرسلك الى قوم مفسدين وانى جاعلك
للناس اماما وانى مستخلفك اكراما كما جرت سنتى فى الاولين.

‘তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন, আমাকে ডেকেছেন এবং বললেন, আমি তোমাকে বিশৃঙ্খলার দিবসে রসূল করে প্রেরণ করব। আমি তোমাকে মানুষের ইমাম বানাব। তোমাকে সম্মানিত প্রতিনিধি করব, যেভাবে পূর্ববর্তী যুগ হতে আমার নিয়ম চলে আসছে।’ -আনজামে আখহাম পৃ. ৭৯; রুহানী খাযায়েন খ. ১১ পৃ. ৭৯

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

“তিনি সত্যধর্ম এবং হেদায়েত দিয়ে রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হয়।” -এজাযে আহমদী পৃ. ৭; রুহানী খাযায়েন খ. ১৯, পৃ. ১১৩

“এখন প্রকাশ পেল যে, এ এলহামগুলোতে আমার সম্পর্কে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইনি খোদার দূত, খোদার আদিষ্ট, খোদার আমীন, খোদার পক্ষ হতে প্রেরিত। যা কিছু বলে, তার প্রতি ঈমান আন, তার দুশমন জাহান্নামী।” -আনজামে আখহাম পৃ. ৬২; রুহানী খাযায়েন খ. ১১ পৃ. ৬২

এ হলো মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কয়েকটি দাবী। যেমন আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, এসব দাবীর দু’টি কারণ রয়েছে।

(ক) মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে বৃটিশ শাসকের করুণার পাত্র হয়ে থাকা।

(খ) মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া।

নোট : এ দু’টি কারণকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর গোমর ফাক করে দিতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষ এ কথা বুঝতে পারে যে, মির্যার এসব দাবী আধ্যাত্মিকতা, যৌক্তিকতা কিংবা বাস্তবতার ভিত্তিতে ছিলনা। কেবল রিপূর পূজা এবং মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে সে এসব দাবী করেছিল।

প্রশ্ন নম্বর দুই

ঈমানের সংজ্ঞা কি? দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় বলতে কি বুঝায়? কুফরের অর্থ কি? ‘কুফর দুনা কুফর’ বলতে কি বুঝায়? কাফের, মুলহিদ, মুরতাদ, যিন্দিক এবং মুনাফিক প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ব্যক্ত করুন। এবং এ কথাও ব্যক্ত করুন যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় এগুলোর কোনটির অন্তর্ভুক্ত? ‘লুযুমে কুফর’ এবং ‘ইলতিযামে কুফর’ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে কাদিয়ানীদের এ সন্দেহের উত্তর প্রদান করুন যে, কাদিয়ানীরা বলে থাকে যারা কাদিয়ানীদের কাফের বলে তারা পরস্পর একে অপরকে কাফের বলে। এ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর

ঈমানের সংজ্ঞা

ঈমান শব্দটি ‘আমন’ এবং ‘আমানত’ শব্দ হতে গঠিত। অভিধানে ঈমান এমন সংবাদেব সত্যায়নকে বলে, যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। কেবল সংবাদদাতার আমানত, বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা করে তা মেনে নিয়েছি।

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলতে বুঝায় যে, আশ্বিয়ায়ে কেরামের ওপর আস্তা রেখে আল্লাহর হুকুম এবং অদৃশ্যের সংবাদকে বিশ্বাস করা। যেমন, কেবল নবীদের সংবাদেব ওপর ভিত্তি করে ফেরেশতাদেব না দেখে তাদেবকে সত্য মানা। মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদেব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মানার নাম ঈমান নয়। কেননা, এটি দেখার ওপর নির্ভর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেব কথার ওপর বিশ্বাস করা হবে না। প্রাধিকানযোগ্য যে, কেবল জানার নাম ঈমান নয়, বরং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা জরুরী।

দ্বীনেব প্রয়োজনীয় বিষয় বলতে কি বুঝায়?

শরীয়তের পরিভাষায় দ্বীনেব প্রয়োজনীয় বিষয় বলতে ঐ অকাউট এবং নিশ্চিত বিষয়কে বলে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পরম্পরায় অকাউটভাবে প্রমাণিত। এবং ব্যাপক পরিচিতিও লাভ করেছে। সাধারণভাবে মুসলমানরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। ঈমান এবং ইসলামেব জন্য ঐ বিষয়গুলো মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক।

যেখানে অস্পষ্টতা রয়েছে সেখানে তাবিল বা ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। আরবী এবং শরীয়তের নীতিমালায় এর অবকাশ রয়েছে। ঐ ব্যাখ্যা বা তাবিল গ্রহণযোগ্য যা কিতাবুল্লাহ, হাদীসে রসূল এবং উম্মতেব ঐক্যমতেব বিরোধী নয়। শরীয়তের যে বিধিবিধান এমন দলীল দ্বারা প্রমাণিত যা (قطعى الثبوت) অকাউট প্রমাণ এবং (قطعى الدلائل) অকাউট দলীল নির্ভর। এতে তাবিল বা ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ ক্ষেত্রে তাবিল করাকে অস্বীকারেবই সামর্থক বলা হবে।

কুফরের সংজ্ঞা

শরীয়তে কুফর হল ঈমানের বিপরিত। আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আস্থা রেখে নিঃসংকোচে মেনে নেয়ার নাম হল ঈমান। আল্লাহ তাআলার যে নির্দেশ অকাউ এবং নিশ্চিতরূপে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তা না মানার নামই হল কুফর। অকাউ এবং নিশ্চিতের শর্ত এজন্য সংযুক্ত করা হয়েছে যে, দ্বীনের বিধি-বিধান দু'পদ্ধতিতে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। একটি হল 'তাওয়াতুর' পদ্ধতিতে। আর অপরটি হল 'খবরে ওয়াহেদ' পদ্ধতিতে। তাওয়াতুর পদ্ধতি হল, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে আমাদের পর্যন্ত পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে পৌঁছেছে যে, প্রত্যেক যুগেই তা একটি জামায়াত কর্তৃক বর্ণিত হয়ে আসছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে এসময় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক যুগেই মুসলমানরা বর্ণনা করে আসছে। এটি এমন অকাউ এবং নিশ্চিত বিষয় যে, যাতে ভুলের সম্ভাবনাও নেই। এ ধরনের অকাউ এবং নিশ্চিত বিষয়কে অস্বীকার করাই হল কুফর। আর যে বিষয় খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বর্ণিত তা অস্বীকার করা কুফর নয়।

'কুফর দুনা কুফর'

কুফরের ব্যবহার কখনো অমৌলিক বিষয়ের ওপরও হয়ে থাকে। যেমন سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (মুসলমানকে গালি দেয়া ফিসক এবং হত্যা করা কুফর)। ঈমানকে নূর এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। ঈমানের দৃষ্টান্ত হল দিবস এবং কুফরের দৃষ্টান্ত হল রাত্রি। এখন দিন বা রাতের মধ্যবর্তী সময় যেমন, প্রভাত ইত্যাদিকে দিন বা রাত বলা হয় না, তদ্রূপ দৃষ্টান্ত হল 'কুফর দুনা কুফরের' মাঝে।

'লুযুমে কুফর'

এক ব্যক্তি জেনে বুঝে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল। যেমন, কেউ বলল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও নবুওয়ত অব্যাহত

আছে। ওহী এখনো অবতীর্ণ হয়। কেউ যদি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বাস করে এরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, তবে তাকে ইলতিয়ামে কুফর বলা হয়। কুফরের নিম্নস্তর হল লুযুমে কুফর। আর ইলতিয়ামে কুফর হল মারাত্মক এবং চরমপর্যায়ের কুফর। কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইচ্ছাকৃতভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গীর আকীদা রাখে বিধায় তারা ইলতিয়ামে কুফরের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাফের

অভিধানে কুফরের অর্থ হল অস্বীকার করা। শরীয়তের অকাউ বিধানাবলীর কোন একটির অস্বীকারকরীকে শরীয়তের পরিভাষায় কাফের বলা হয়।

মুলহিদ এবং যিন্দিক

যে সব বিষয় অকাউভাবে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত তার কোন একটির অপব্যাখ্যা করা। তার এমন ব্যাখ্যা বর্ণনা করা, যা উম্মতের সর্বসম্মত আকীদার বিপরিত। কুরআন মজীদে এরূপ করাকে ইলহাদ আর হাদীস শরীফে যিন্দিক হিসেবে বলা হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুলহিদ এবং যিন্দিক ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে ইসলামের শব্দতো উচ্চারণ করে, কিন্তু এর এমন অর্থ বর্ণনা করে, যার দ্বারা তার আসল রূপই পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন, সালাত এবং যাকাতের এমন অপব্যাখ্যা করে যে, কুরআনেতো সালাত কেবল দোআ এবং যিকিরের অর্থে নেয়া হয়েছে। বিশেষ পদ্ধতিতে নামায পড়া জরুরী নয়। যাকাত আত্মার পরিশুদ্ধতার অর্থে নেয়া হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দানের অর্থে ব্যবহার হয়নি।

যিন্দিকের গুরুত্ব

যিন্দিক সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ., ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যিন্দিকের তওবা কবুল হবে না। কেননা, সে কুফরকে ইসলাম হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা চালায়। কুকুরের মাংস খাসির মাংস বলে বিক্রি করে। মদের ওপর যমযমের লেবেল এটে দেয়। এটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। একে মৃত্যুদণ্ড দেয়া জরুরী। গোলাম

আহমদ কাদিয়ানী হচ্ছে একজন যিন্দিক। -তোহফায়ে কাদিয়ানীয়াত খ.
১ পৃ. ৬৬৭-৬৬৮

মুরতাদ

ইরতাদ শব্দের অর্থ হল ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান এবং ইসলামে প্রবেশের পর কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে ইরতাদ বলে। ইমাম রাগেব ইসপাহানী র. মুফরাদাতে লিখেন-
هو الرجوع من الاسلام الى الكفر 'ইসলাম থেকে কুফরের প্রতি ফিরে যাবার নামই হচ্ছে ইরতাদ।'

মুরতাদের হুকুম

চার ইমামের ঐক্যমত হল, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে, তাকে তিন দিনের সময় দেয়া হবে। তার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। তাকে বুঝান হবে। যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে ক্ষমা করা হবে। নতুবা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই।

মুনাফিক

যে ব্যক্তি নিজ অন্তরে কুফর লুকায়িত রেখে মুখ দিয়ে ইসলামের মিথ্যা স্বীকৃতি দেয়। এ জাতীয় মুনাফেক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে কেবল দু'টি সুরত হবে। হয়ত মুসলমান নতুবা কাফের। কেননা, ওহী অবতীর্ণের ধারা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কার অন্তরে কি আছে তা কিভাবে জানা যাবে?

কাদিয়ানী সম্পর্কে হুকুম

কাদিয়ানীরা হল যিন্দিক। তারা তাদের ধর্মমতকে ইসলাম বলে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম ইসলামকে কুফর বলে। কাদিয়ানীরা সব সময়েই যিন্দিক হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের হুকুম সাধারণ কাফেরের মত নয়। তাদের অপরাধ হল ইসলামকে কুফর বলা এবং কুফরকে ইসলাম বলা। তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের বেলাও একই

হুকুম প্রযোজ্য। চাই ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হোক, কিংবা জন্মগতভাবে কাদিয়ানী হোক, অথবা কাদিয়ানীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাদের সকলকেই মুরতাদই বলা হবে। সকলের বেলাই একই হুকুম কার্যকর হবে। তারা কেবল ইসলামকে ত্যাগ করছেন, বরং তারা দ্বীন ইসলামকে কুফর এবং কুফরকে দ্বীন ইসলাম বলে বিশ্বাস করে থাকে।

মুসলমানদের পরস্পর পরস্পরকে কাফের বলা

কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিজেদের স্পষ্ট কুফর হতে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র ফেরানোর জন্য বলে থাকে যে, যে উলামারা আমাদেরকে কাফের বলছে, তারাও একে অপরকে কুফরের ফতোয়া দিয়ে থাকে। সুতরাং তাদের ফতোয়ার কোন মূল্য নেয়। কাদিয়ানীদের অবাস্তর উক্তির উত্তর নিম্নরূপ—

১. মানুষকে কাফের বানানো উলামাদের দায়িত্ব নয়; বরং কুফরকে প্রকাশ করাই হচ্ছে তাঁদের দায়িত্ব। তা ছাড়া একপক্ষ অপর পক্ষকে কুফরের যে ফতোয়া দিয়ে থাকে, তা তাদের চিন্তাশীল প্রতিনিধিত্বকারী সকলের পক্ষ হতে দিয়ে থাকে না। যারা এরূপ করে থাকে মুসলমানদের প্রত্যেক গ্রুপের গবেষক, চিন্তাশীল এবং উদারপন্থী উলামায়ে কেরাম তাদের এরূপ অসতর্কতা এবং চরমপন্থা নীতির সাথে দ্বীমত করে থাকেন। সুতরাং গুটি কয়েকে চরমপন্থী অসতর্ক ব্যক্তির তথাকথিত ফতোয়ার ওপর নির্ভর করে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল, ভিত্তিহীন এবং ভ্রষ্টপূর্ণ কর্মকাণ্ড। বাস্তব কথা হচ্ছে কোন কোন গ্রুপে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের বিরোধীদের মোকাবেলায় এমন চরমপন্থা নীতি অবলম্বন করে যা কুফরের পর্যায় নিয়ে পৌছায়। কিন্তু এর বিপরিত তাদের মাঝে বহু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম এমন আছেন, যারা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোতে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মতামত দিয়ে থাকেন, যাতে সীমালঙ্ঘন না হয়। এমন কি তারা সীমালঙ্ঘনকারীদেরও তিরস্কার করে থাকেন।

২. মুসলমানদের পরস্পরের বিরোধ মূলত প্রেক্ষাপটের বিরোধের কারণে হয়ে থাকে। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হল, যখনই মুসলমানদের সম্মিলিত কোন বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন সকলের পরস্পরের মত-বিনিময়, আলোচনা চরমপন্থীদের বিতর্কিত ফতোয়া অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

এক. একে অপরকে কুফরের ফতোয়া দেয়া চরমপন্থীদের একান্ত নিজস্ব মত। এটি কোন চিন্তাশীল দলের সর্বসম্মত অভিমত নয়। যদি তাই হত, তাহলে তারা মুসলমান হিসেবে কখনো ঐক্যবদ্ধ হত না।

দুই. প্রত্যেক গ্রুপেই সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাই যারা বিরোধকে আপন সীমার ভিতর রাখে। পরস্পরের বিরোধকে কুফরের স্তরে নিয়ে যায় না। যদি তাই হত, তাহলে পরবর্তীতে তাদের সম্মিলিত প্রোগ্রাম সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হত না।

তিন. ইসলামের মৌলিক ঐ আকীদা যা ঈমান এবং কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে, তাতে সকলেই ঐক্যমত।

৩. যদিও কেউ কেউ কুফরের বিষয়ে চরমপন্থা এবং বাড়াবাড়ীর নীতি অবলম্বন করে, তাই বলে একথা কিভাবে বলা যবে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে কেউই কাফের হবে না? কোন কাফেরকে সকলে মিলে কাফের বললেও সে কাফের হবে না?

অভিজ্ঞ ডাক্তার থেকে কখনো কি কোন ভ্রান্তি হতে পারে না? কোন মানুষ কি এ কথা বলবে যে, একজনের ভ্রান্তির অপরাধে কোন চিকিৎসকের মতামতকে গ্রহণযোগ্য ভাবা হবে না? আদালতের রায়ে কি জজ থেকে কখনো ভুল হয়ে থাকে না? তাই বলে কি একজনের ভুলের কারণে আদালতে তাল্লা লাগিয়ে দেয়া হবে? কিংবা জজদের কোন ফয়সালাই মানা হবে না। ইমারত বা সড়ক নির্মাণে কি প্রকৌশলীরা ভুল করে থাকে না? তাই বলে কি কোন বিবেকবান ব্যক্তি এ পরামর্শ দিবে যে, এক প্রকৌশলীর ভুলের কারণে ইমারত নির্মাণের দায়িত্ব কবর খননকারীদের দেয়া হোক? কোন কোন শাখাগত বিষয়ে ফতোয়া প্রদানে অসতর্কতা অবলম্বন করার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম এবং কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ে কুরআন-হাদীস ত্যাগ করে কাদিয়ানীদের বিকৃত মতামতকে গ্রহণযোগ্য ভাবা হবে? আল্লামা ইকবাল কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণার দাবী করে বলেন, মুসলমানদের অগণিত ফেরকার মাযহাবী বিতর্ক ঐ বুনিয়াদী বিষয়াবলীর ওপর কোন প্রভাব পড়বে না, যে বিষয়ে

সব পক্ষ ঐক্যবদ্ধ। যদিও তারা একে অপরকে ইলহাদের ফতোয়া প্রদান করে।” -হরফে ইকবাল পৃ. ১২৭ ছাপা আল-মানার একাডেমী লাহোর ৪৭

প্রশ্ন নম্বর তিন

কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কি আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে? কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং অপরাপর কাফেরদের মধ্যে কি কি পার্থক্য বিস্তারিত-ভাবে বলুন। কাদিয়ানীদের ব্যাপারে কি হুকুম? কাদিয়ানীরা যদি মসজিদ নির্মাণ করে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে কাদিয়ানীদের দাফন করে, তবে এ ব্যাপারে শরীয়তের দিক নির্দেশনা কি?

উত্তর

কাদিয়ানীদের কাফের হবার কারণ

ভাওয়ালপুরের মোকাদ্দমায় হযরত সাইয়িদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. কাদিয়ানীদের কাফের হবার ছয়টি কারণ নির্ধারণ করেছেন।

১. খতমে নবুওয়তের অস্বীকার।
২. নবুওয়তের দাবী। পূর্বের নবীদের মত সেও নবুওয়তের দাবী করে।
৩. ওহী লাভের দাবী। তার ওহীর ওপর কুরআনের ন্যায় ঈমান আনা ওয়াজিব মনে করা।
৪. হযরত ঈসা আ.কে অপমান করা।
৫. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপমান।
৬. উম্মতে মুহাম্মদীকে ব্যাপকভাবে কাফের বলা।

-রুয়েদাদে মোকাদ্দমায়ে মির্যাইয়া ভাওয়ালপুর খ.১, পৃ.৪১৭

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সকল রচনাবলী কুফরীতে পরিপূর্ণ। তাইতো হযরত আল্লামা সাইয়িদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. যথার্থই বলেছেন, “মুসাইলামায়ে কায্যাব এবং মুসাইলামায়ে পাঞ্জাব (গোলাম

আহমদ)-এর কুফর ফেরআউনের কুফর থেকেও মারাত্মক।”
-এহতেসাবে কাদিয়ানীয়াত খ. ২ পৃ. ১১

হযরত শাহ কাশ্মিরী রহ. যে ছয়টি কারণে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফের বলেছেন, সংক্ষিপ্তভাবে এর দালীলিক আলোচনা করব।

১. খতমে নবুওয়তের অস্বীকার

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়ত পবিত্র কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ এবং উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর পরে গোলাম আহমদের নবুওয়তের দাবী করাই হচ্ছে খতমে নবুওয়তকে অস্বীকারের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আর খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী হল সুস্পষ্ট কাফের। এ প্রসঙ্গে নিম্নের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য:

وكونه ﷺ خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة. واجمعت عليه الامت فيكون مدعى خلافه ويقتل ان اصر.

“হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হবার পক্ষে পবিত্র কুরআন গোষক, হাদীস শরীফ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে এবং উম্মত এর ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছে। সুতরাং এর অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। যদি এর ওপর জোর দেয়, তাকে হত্যা করা হবে।” -রুহুল মাআনী খ. ৮ পৃ. ৩৯

২. মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়তের দাবী

(১) “সত্য খোদা তিনি যিনি কাদিয়ানে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছেন।”
-দাফেউল বালা পৃ. ১১; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২৩১

(২) “আমার দাবী হল আমি নবী এবং রসূল।” -মালফুযাত খ. ১০ পৃ. ১২৭

(৩) “সুস্পষ্টভাবে আমাকে নবী খেতাব দেয়া হয়েছে।” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৫০; খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ১৫৪

(৪) قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا

“বলুন! হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসূল।” -তায়কেরা পৃ. ৩৫২; মজমুআয়ে এলহামাতে মির্যা

(৫) انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا كما ارسلنا الى فرعون رسولا

“আমি তোমাদের নিকট রসূল স্বাক্ষী প্রেরণ করেছি, যেভাবে ফেরআউনের নিকট রসূল প্রেরণ করেছি।” -মজমুআয়ে এলহামাতে মির্যা; তায়কেরা পৃ. ৬১০

৩. ওহীর দাবী এবং স্বীয় ওহীকে কুরআনের অনুরূপ বলা

(১) “আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি ঐ এলহামের ওপর ঈমান আনছি, যেভাবে কুরআন শরীফের ওপর, খোদার অন্যান্য কিতাবের ওপর। যেভাবে আমি কুরআন শরীফকে নিশ্চিত এবং অকাউভাবে খোদার কালাম জানি, সেভাবে ঐ কালামকেও যা আমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। খোদার কালাম বলে বিশ্বাস করি।” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ২২০, রুহানী খাযায়েন খ. ২২ পৃ. ২২০

(২) “যা কিছু আমি আল্লাহর ওহী দ্বারা শ্রবণ করি, আল্লাহর শপথ তা সর্বপ্রকার ভ্রান্তি হতে পবিত্র মনে করি। কুরআনের মত আমার ওহী সর্বপ্রকার ভ্রান্তি হতে পবিত্র। এটা আমার ঈমান। খোদার কসম এটি কালাম মজীদ, যা এক আল্লাহর মুখ হতে বের হয়েছে। যে বিশ্বাস তাওরাতের ওপর মূসা আ.-এর ছিল এবং কুরআনের ওপর হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল। বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমি তাদের কারো থেকে কম নই। যে মিথ্যাবাদী সে অভিশপ্ত।” -নুয়ুলুলমসীহ পৃ. ৯৯; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ৪৭৭

(৩) “সমর্থনের জন্য আমি ঐ সকল হাদীস পেশ করছি যা কুরআন অনুযায়ী এবং আমার ওহীর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অপর হাদীসগুলোকে আমি বাজে হিসেবে ছুড়ে ফেলি।” -এজাযে আহমদী পৃ. ৩০, রুহানী খাযায়েন খ. ১৯ পৃ. ১৪০

এখানে মির্যা কাদিয়ানীর নবুওয়তের দাবীর কেবল তিনটি উদ্ধৃতি দেয়া হল। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে মির্যা কাদিয়ানী তথাকথিত স্বীয় ওহীকে কুরআন মজীদেদের সম পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছে এবং হাদীসেরও অপমান করেছে।

৪. হযরত ঈসা আ.-এর অপমান

(১) “খোদা এ উম্মতের মধ্য হতে মসীহ মাউদ প্রেরণ করেছেন। যিনি পূর্বের মসীহ হতে স্বীয় সকল মর্যাদার দিক দিয়ে অগ্রসরমান। আর তিনি ঐ দ্বিতীয় মসীহের নাম রেখেছেন গোলাম আহমদ।” -দাফেউল বালা পৃ. ১৩; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮, পৃ. ২৩৩

(২) “খোদা এ উম্মতের মধ্য হতে মসীহ মাউদ প্রেরণ করেছেন। যিনি পূর্বের মসীহ হতে স্বীয় সকল শানে অগ্রসরমান। আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। যদি মসীহ ইবনে মরীয়ম আমার যুগে হতেন, তবে যে কাজ আমি করছি, তা তিনি কখনো করতে পারতেন না।” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৪৮; রুহানী খাযায়েন খ. ২২ পৃ. ১৫২

(৩) “আল্লাহ তাআলা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের খণ্ডগুলোতে আমার নাম ঈসা রেখেছেন। কুরআন শরীফে ঈসা আ. সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সবগুলো আয়াত আমার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং এ কথাও বলেছেন যে, তোমার আগমনের সংবাদ কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান আছে।” -বারাহীনে আহমদীয়া খ. ৫ পৃ. ৮৫; রুহানী খাযায়েন খ. ২১ পৃ. ১১১

শেষ উদ্ধৃতির এ অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, “খোদা তাআলা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্বের খণ্ডগুলোতে আমার নাম ঈসা রেখেছেন।” প্রশ্ন হল তাহলে কি বারাহীনে আহমদীয়া আল্লাহর কিতাব? নাউযুবিল্লাহ এরূপ কখনো হতে পারে না। এরূপ বলাই হল কুফরী।

৫. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপমান

মির্য়া কাদিয়ানী প্রায় তার সকল রচনাবলীতে সকল নবীকে অপমান, হেয় করেছে। নিম্নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় করে যে মন্তব্য করেছে তার কিছু উল্লেখ করা হল।

(১) “আমি বারংবার বলেছি যে, **واخبرين منهم لما يلحقوا بهم** এর অধীনে বুরুযীভাবে আমিই খাতামুল আযীয়া। খোদা আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়াতে আমার নাম মুহাম্মদ এবং আহমদ রেখেছেন। আমাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এ হিসেবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামুলনবী হওয়ায় আমার নবুওয়তের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, ছায়া কখনো তার মূল হতে পৃথক হয় না।” -এক গলতী কা এযালা পৃ. ৮; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২১২

(২) “ঐ নবীর জন্য চন্দ্রগ্রহণ নিদর্শন স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। আর আমার জন্য চন্দ্র-সূর্য উভয়টিরই প্রকাশ পেয়েছে। এখন আর কি অস্বীকার করবে?” -এজাযে আহমদী পৃ. ৭১; রুহানী খাযায়েন খ. ১৯ পৃ. ১৮৩

(৩) “কিন্তু তোমরা অন্তত ধ্যানের সাথে শ্রবন কর, এ সময় মুহাম্মদ নামের তাজাল্লী প্রকাশের নয়। অর্থাৎ এখন জালালী রঙের কোন খেদমত অবশিষ্ট নেই। কেননা, নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত সে জালাল প্রকাশ পেয়ে গেছে। সূর্যের কিরণ এখন সহনীয় নয়। এখন চন্দ্রের স্নিগ্ধতার প্রয়োজন। আর তাই হল আহমদের রঙে আমি।” -আরবাইন নম্বর ৪ পৃ. ১৪; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭ পৃ. ৪৪৫-৪৪৬

(৪) “খোদা আমার ওপর ঐ রসূলে করীমের ফয়েয অবতীর্ণ করেছেন এবং কামেল (পরিপূর্ণ) করেছেন। সেই নবীর লুতফ এবং অস্তিত্বকে আমার দিকে টেনেছেন। এক পর্যায়ে আমার (মির্য়া) অস্তিত্ব তাঁর (মুহাম্মদ) অস্তিত্ব হয়ে গেল। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার জামায়াতে প্রবেশ করবে, বাস্তবে সে খায়রুল মুরসালীনের সাহাবার অন্তর্ভুক্ত হবে। **واخبرين** এর অধীনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চিন্তাশীলদের নিকট

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-২১৮

বিষয়টি গোপন নয়। যে ব্যক্তি আমার এবং মুস্তফার মাঝে পার্থক্য করে, সে আমাকে দেখেনি, আমাকে চিনেনি।” -খুতবায়ে এলহামিয়া পৃ. ১৭১; রুহানী খাযায়েন খ. ১৬ পৃ. ২৫৮-২৫৯

(৫) মির্যা কাদিয়ানী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ হবার দাবী করে। নাউযুবিল্লাহ। তাই সে লিখে

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار.

“এ আয়াতে আমার নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে এবং রসূলও।” -এক গলতী কা এযালা পৃ. ৪; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২০৭

৬. উম্মতে মুহাম্মদীয়া কে কাফের বলা

(১) “খোদা তাআলা আমার নিকট প্রকাশ করেছেন যে ব্যক্তির নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছল এবং সে আমাকে গ্রহণ করল না, সে মুসলমান নয়।” -তায়কেরা মাজমুআয়ে এলহামাত পৃ. ৬০৭ তৃতীয় সংস্করণ

(২) “কুফর দু’প্রকার। প্রথমত এক ব্যক্তি ইসলামকেই অস্বীকার করছে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রসূল মানে না। দ্বিতীয়ত মসীহ মাউদ (মির্যা) কে মানে না। সকল দলীল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাকে মিথ্যা মনে করে। যাকে মানা এবং সত্য বলে জানার ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রসূল তাগিদ প্রদান করেছেন। প্রথম যুগের নবীদের কিতাবেও তাগিদ পাওয়া যায়। তাই সে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূলের নির্দেশকে অমান্য করায় কাফের। যদি চিন্তা করা হয়, তবে উভয় একই প্রকারের কাফেরের অন্তর্ভুক্ত হবে।” -হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৭৯; রুহানী খাযায়েন খ. ২২ পৃ. ১৮৫

এমনিভাবে মির্যা মাহমুদ এবং মির্যা বশীর আহমদ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে লিখে:

(৩) “মুসলমান যে হযরত মসীহ মাউদের (মির্যা কাদিয়ানী) বাইয়াতে অন্তর্ভুক্ত হবে না, চাই সে হযরত মসীহ মাউদের নাম নাও শুনুক, সে কাফের। ইসলামের গণ্ডী হতে বাহিরে।” -আয়নায়ে সদাকাত পৃ. ৩৫; মির্যা মাহমুদ ইবনে মির্যা কাদিয়ানী

(৪) “যে ব্যক্তি মূসাকে মানে, কিন্তু ঈসাকে মানে না, অথবা ঈসাকে মানে মুহাম্মদকে মানে না, অথবা মুহাম্মদকে মানে; কিন্তু মসীহ মাউদকে মানে না, সে কেবল কাফেরই নয়; বরং পাক্কা কাফের এবং ইসলামের গণ্ডী হতে খারিজ।” —কালিমাতুল ফযল পৃ. ১১০; মির্যা বশীর আহমদ এম, এ

কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং আহলে কেবলা

আহলে কেবলা বলতে আহলে ঈমান তথা ঈমানদারদেরকে বলা হয়। শরীয়তে আহলে কেবলা ঐ সকল লোককে বলা হয়, যারা দ্বীনের ওপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখে। আমরা কোন আহলে কেবলাকে ঐ সময় পর্যন্ত কাফের বলি না, যে পর্যন্ত না তার কর্ম এবং কথায় কুফরী প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি দ্বীনের অত্যাৱশ্যকীয় বিষয়গুলিকে অস্বীকার করে যেমন, খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরও নবুওয়তের দাবীদারকে সত্য মনে করা, সে শরীয়তের পরিভাষায় আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। আহলে কেবলার অর্থ এটা নয় যে, যে ব্যক্তি কেবল শুধু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ে থাকে। কেবলার দিকে ফিরে তো মুসাইলামা কাজ্জাবও নামায পড়েছিল। সুতরাং আহলে কেবলা তাকেই বলা হবে যে দ্বীনের অত্যাৱশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখার সাথে সাথে কেবলামুখী নামায আদায় করে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করবে সে কাফের। যেমন খ্রীস্টান, ইহুদী সম্প্রদায়। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় খ্রীস্টান এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানের খ্রীস্টানরা মিথ্যুক, তবুও তারা ঈসা আ.কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে। বর্তমান ইহুদীরা মিথ্যুক, তবুও মূসা আ.কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিজেৱাও মিথ্যুক এবং তাদের নবীও মিথ্যাবাদী। ইসলাম সত্য নবীর মিথ্যা অনুসারীদেরকে আহলে কিতাব বলে থাকে। ইসলাম না মিথ্যা নবীদাবীদারকে বরণ করে, না তার অনুসারীদেরকে। মিথ্যা নবীর অনুসারীদের জন্য ঐ হুকুমই প্রয়োগ করা হবে, যা হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. ইয়ামামায় মুসাইলামা কাজ্জাবের অনুসারীদের বেলায় প্রয়োগ করেছিলেন। অন্যান্য কাফেরদের ন্যায় কাদিয়ানীদের ভাবা সঠিক হবেনা। কাদিয়ানী হল যিন্দিক। যিন্দিককে ইসলাম কোনভাবেই মেনে নেয় না।

কাদিয়ানীদের ইবাদত স্থল

মুসলমানদের ইবাদতের কেন্দ্রের নাম হল মসজিদ। মুনাফিকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদের নামে একটি আখড়া নির্মাণ করেছিল। যাকে ইসলামের ইতিহাসে ‘মসজিদে যিরার’ বলা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ধুলায় মিশিয়ে দেয়ার নির্দেশ জারী করেন। ইসলাম যেখানে মুনাফিকদের কেন্দ্রকে মসজিদ বলে স্বীকৃতি দেয়নি, সেখানে কিভাবে কাদিয়ানীদের আখড়াকে মসজিদ বলে স্বীকৃতি দিবে। তাদের আযানকেও শরীয়ী আযান বলা যাবে না।

মুসলিম কবরস্থানে কাদিয়ানীদের দাফন

যেভাবে কোন হিন্দু, খ্রীস্টান, ইহুদীকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা জায়েয নয়, তদ্রূপ কোন কাদিয়ানীকেও মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা জায়েয নেই। যদি কেউ গোপনে দাফন করে, তবে তা প্রকাশ পাবার পর সাথে সাথে উঠিয়ে ফেলতে হবে।

হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্কেলভী রহ. কাদিয়ানী এবং অন্যান্য কাফেরদের হুকুম সম্পর্কে নিম্নরূপ লিখেন:

১. ঈমানের প্রথম শর্ত হল কুফর এবং কাফের হতে পবিত্র থাকা। অর্থাৎ কাফেরদের আল্লাহর শত্রু মনে করা। তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী রয়েছে।

২. অমুসলিমের সাথে বিবাহ-শাদী সম্পূর্ণরূপে হারাম।

৩. কাফের মুসলমানের ওয়ারিস এবং মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে না।

৪. অমুসলিমের অন্তোষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং শবদেহের সাথে সমাধিস্থলে যাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলঃ

ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله
وماتوا وهم فسقون

“তাদের থেকে কারো মৃত্যু হলে তার জন্য আপনি জানাযার নামায কখনো পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। কেননা, তারা তো কুফরী করেছে আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে, আর তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে ফাসিক অবস্থায়।” -সূরা তওবা ৮৪

৫. মুসলমানের জানাযায় অমুসলিম অংশগ্রহণ করার অনুমতি নেই। কেননা, এ সময় রহমত কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। পক্ষান্তরে অমুসলিমের অংশগ্রহণ অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৬. মৃত অমুসলিমের জন্য মাগফিরাতের দুআ জায়েয নেই যদিও তা নিকট-ত্বীয় হোক না কেন? আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হচ্ছে-

ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم

“নবী ও মুমিনের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিক-দের জন্য যদিও তারা নিকটাত্বীয়ও হয়।” -সূরা তওবা ১১৩

৭. অমুসলিমের জবেহকৃত এবং শিকারী প্রাণী মুসলমানের জন্য হালাল নয়।

৮. অমুসলিমকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা জায়েয নেই।

৯. যিম্মীদের জিহাদে শরীক করা যাবে না।

১০. দারুল ইসলামে বসবাসকারী অমুসলিম থেকে জিয়য়া নেয়া হবে। হযরত ওমর ফারুক রাযি. বলেছেন,

لا اكرمهم اذا اهانهم الله ولا اعزهم اذا اذلهم الله ولا ادنيهم اذا اقصاهم الله تعالى.

‘আল্লাহর কসম! আমি ঐ সমস্ত লোককে কখনো সম্মানিত করব না, যাদেরকে আল্লাহ হেয় করেছেন। ঐ সমস্ত লোককে কখনো শ্রদ্ধা কর না, যাদেরকে আল্লাহ লাঞ্চিত করেছেন। ঐ সমস্ত লোককে কখনো নিজের নৈকাটি-ভাজন হতে দিব না, যাদেরকে আল্লাহ দূরে রাখতে বলেছেন।’

প্রশ্ন নম্বর চার

১. নবুওয়তের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যাবলী কি?

২. মির্যা কাদিয়ানীর জীবন এবং নবুওয়তের বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট বর্ণনা করুন। অতঃপর বলুন, মির্যা কাদিয়ানীর মাঝে কি ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়?

উত্তর

হযরত আশীয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা বহু বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি পেশ করা হল।

১. নবীর জন্য জরুরী হল পরিপূর্ণ বিবেকসম্পন্ন হওয়া। আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহী অনুধাবনে যেন কোন ভুল না হয়। বিবেক-বুদ্ধিতে এতো উঁচু পর্যায়ের হবে যে, সে যুগে তার কোন দৃষ্টান্ত পেশ হবে অসম্ভব। কোন উম্মতের বিবেক-বুদ্ধি কোন নবী থেকে অধিক হবে না। বিবেক-বুদ্ধিতে নবী এতো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হবেন যে, বড় কোন বিবেকবানও তার সমপর্যায়ের হতে পারবে না। পক্ষান্তরে মির্যা কাদিয়ানীর ডান এবং বামের জুতারও খবর ছিলনা। -সীরাতে মাহদী খ. ১ পৃ. ৬৭, রেওয়ায়েত ৮৩

২. নবুওয়তের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, মেধাবী এবং প্রখর স্মৃতিশক্তি। সম্পন্ন হওয়া। পক্ষান্তরে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী হল, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগ ছিল। -মালফুযাত খ. ৮ পৃ. ৪৪৫

মির্যা কাদিয়ানী স্বীয় এক মুরিদেদের নিকট লিখে

میر حافظ بہت خراب ہے اگر کسی دفعہ کسی سے ملاقت ہو تب بھی بھول جاتا ہوں حافظ کی یہ باتری
(یعنی بدترین حالت) ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔

“আমার স্মৃতিশক্তির অবস্থা খুনই সুচনীয়া। কারো সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ হবার পরও ভুলে যায়। স্মৃতিশক্তির এ করুণ অবস্থা বর্ণনা করার মত নয়।” -মাকতুবা খ. ৫ পৃ. ৩১

৩. নবুওয়তের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, নবী পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। উম্মতের জ্ঞানের পরিধি হতে তার জ্ঞান হবে উন্নত, শ্রেষ্ঠ এবং

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়েত-২২৩

অধিক। পক্ষান্তরে মির্যা কাদিয়ানী ছিল এর বিপরিত। সে চন্দ্র মাসের সফর মাসকে চতুর্থ মাস গণনা করে। -তিরাইয়াকুল কুলুব পৃ. ৪২; রুহানী খাযায়েন খ. ১৫ পৃ. ২১৮

৪. নবুওয়তের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, নবী স্থায়ীভাবে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ হবেন। পক্ষান্তরে মির্যা কাদিয়ানী সম্পর্কে তার মুরিদদের দাবী হল, সে কখনো কখনো যিনায় লিপ্ত হত। -খুতবায়ে মির্যা মাহমুদ সাহেব আখবারে ফযল ৩১ আগস্ট ১৯৩৮ইং

“মির্যা কাদিয়ানী গায়রে মাহরাম নারীদের দ্বারা পা ম্যাসেজ করত।”
-সীরাতুল মাহদী খ. ৩ পৃ. ২১০ বর্ণনা ৭৮০

৫. নবুওয়তের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, নবী সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত হবেন। পক্ষান্তরে মির্যা কাদিয়ানী চরমপর্যায়ের মিথ্যাবাদী এবং অসাধু ছিল। সে পঞ্চাশটি কিতাব লেখার অঙ্গীকার করেছিল। এর বিনিময় পঞ্চাশ টাকা নিয়েছিল। কিন্তু মাত্র পাঁচটি কিতাব লেখে ঘোষণা দেয় যে, “পাঁচের দ্বারা পঞ্চাশের ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, পঞ্চাশ এবং পাঁচের মাঝে কেবল একটি শূণ্যের পার্থক্য।” -বারাহীনে আহমদীয়া খ. ৫ পৃ. ৭; রুহানী খাযায়েন খ. ২১ পৃ. ৯

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মিথ্যা এবং অসাধুতার আশ্রয়ে মানুষের সম্পদ আত্মসাত করে। তার মিথ্যাচারের কিছু চিত্র নিম্নে অঙ্কিত হল।

মির্যার মিথ্যাচারের দৃষ্টান্ত

এ কথা সকলের স্মরণ রাখতে হবে যে, সত্যবাদীতা এবং আমানতদারী নবুওয়তের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। মক্কার কুরাইশরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনা সত্ত্বেও তাঁকে সত্যবাদী এবং আমানতদার বলে বিশ্বাস করত। তারা বলত, ما جربنا الاصدقا

আল্লাহ তাআলা রসূল সম্পর্কে বলেন,

فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون

“আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।” -সূরা আনআম ৩৩

মির্য়া কাদিয়ানী ওহী প্রাপ্তির দাবী করে বলে- وما ينطق عن الهوى ان -আরবাইন নম্বর ৪ পৃ. ১৩৯; আরবাইন নম্বর ৩ পৃ. ৪৩

মির্য়া গোলাম আহমদ আরবের বিখ্যাত মিথ্যুক আবুল হোসাইন কাজ্জাবকে হার মানিয়ে দিয়েছে। তার মিথ্যা বর্ণনার কিছু নমুনা দেয়া হল।

১. “কুরআন শরীফ এবং হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, যখন মসীহ মাউদ প্রকাশ পাবেন, তখন উলামায়ে ইসলামের হাতে তাকে দুঃখ পেতে হবে। তাকে কাফের ঘোষণা দিবে। হত্যার ফতোয়া দিবে। তাকে চরমভাবে লাঞ্চিত করা হবে। তাকে ইসলামের সীমা হতে খারিজ এবং দ্বীন ধ্বংসকারী ভাবা হবে।” -আরবাইন নম্বর ৩ পৃ. ২০-২১

সূধী পাঠক! বলুন, পবিত্র কুরআনের কোথায় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে? এটি হাদীসের কোন কিতাবে উল্লেখ হয়েছে? মির্য়া কাদিয়ানী মাত্র তিন লাইনে পাঁচটি মিথ্যা কথা বলেছে।

২. “এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন শরীফ এমন কি তাওরাতের কোন সহীফাতেও এ সংবাদ বিদ্যমান ছিল যে, মসীহ মাউদের সময়ে মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। হযরত মসীহও আ. ইঞ্জিলে এ সংবাদ প্রদান করেছেন। নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হওয়া অসম্ভব।” -কিশতিয়ে নূহ পৃ. ৯

৩. “ঐ খলিফা যার সম্পর্কে বুখারীতে লেখা হয়েছে, আকাশ হতে আওয়াজ আসবে هذا خليفة الله المهدي (ইনি আল্লাহর খলিফা মাহদী)। চিন্তা করুন এ হাদীসটি কোন পর্যায়ের যা اصح الكتاب بعد كتاب الله (আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশ্বস্ত কিতাব) এ উল্লেখ হয়েছে।” -শাহাদাতুল কুরআন পৃ. ৪১

পাক ভারত থেকে ছাপা বুখারী শরীফের পৃষ্ঠা হল ১১২৯টি। এমন কেউ আছেন কি যে আমাদের বলতে পারবেন যে, বুখারী শরীফের অমুক পৃষ্ঠায় অমুক শিরনামে এটি উল্লেখ হয়েছে?

৪. “সহীহ বুখারীতে লেখা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আ. ইন্তিকাল করেছেন।” -কিশতীয়ে নূহ পৃ. ৮৭

এ বিষয়টি কোন পৃষ্ঠায় কোন শিরনামে লেখা হয়েছে তা উল্লেখ নেই।

৫. “আমার এবং আমার যুগের সম্পর্কে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন শরীফে সংবাদ বিদ্যমান আছে যে, এ সময় (অর্থাৎ মসীহ মাউদ আসার সময়) আকাশে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে এবং পৃথিবীতে মহামারী দেখা দিবে।” -দাফিউল বালা পৃ. ৩৪

তাওরাত-ইঞ্জিলের কথা বাদই দিলাম। মুসলমানের ঘরে ঘরে কুরআন শরীফ বিদ্যমান আছে। কোন কাদিয়ানী এমন আছে কি যে, কুরআনের কোথায় এ কথা উল্লেখ আছে তা দেখাতে পারবে?

৬. নবুওয়তের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল তাঁর পরে কেউ তাঁর উত্তরাধিকার হবে না। এ কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

لا نورث ما تركناه فهو صدقة

“আমরা কাউকে ওয়ারিস বানাইনা। যা রেখে যাই, তাই সদকা হয়ে যায়। -বুখারী খ. ১ পৃ. ৫২৬

নোট : হযরত ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসটি ১১ বার বুখারী শরীফে উল্লেখ করেন। আল-বেদায়া ওয়াননেহাযার প্রথম খণ্ডের ৩০২ পৃষ্ঠায় এরূপ উল্লেখ হয়েছে যে,

نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة.

হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্দোলভী রহ. ‘শরায়েতে নবুওয়ত’ নামক কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় এরূপ উল্লেখ করেনঃ

نحن معشر الانبياء لانرث ولا نورث ما تركنا فهو صدقة.

পক্ষান্তরে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পৈত্রিক সম্পত্তি লাভের প্রত্যাশায় ইংরেজ আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করে লড়াই করে। তার সন্তানেরাও তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয়।

৭. নবুওয়তের একটি শর্ত হল যুহুদ অর্থাৎ দুনিয়া বিমুখতা। জৈবিক চাহিদা থেকে মুক্ত থাকা। নবুওয়তের উদ্দেশ্যই হল মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া। উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি জৈবিক চাহিদায় আক্রান্ত, সে কিভাবে মানুষকে আল্লাহমুখী বানাবে? অথচ মির্যা কাদিয়ানী নর্তকীদের অর্থ গ্রহণেও প্রস্তুত ছিল। -সীরাতে মাহদী খ. ১ পৃ. ২৬১ বর্ণনা ২৭২। এ অর্থ ভোগের জন্য দালীলও দাঁড়া করায়। -আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম পৃ. ৬০৭

এমনিভাবে মির্যা কাদিয়ানী বেহশতী মাকবারাতে (?) কবর বিক্রির ব্যবসাও শুরু করেছিল। মির্যা কাদিয়ানী পেটুক ছিল। তার খাদ্য তালিকা নিম্নরূপ।

আস্ত মুরগীর কাবাব, ভুনা মাংস, স্যুপ, মিষ্টি চাউল ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কিছুই না খেত। -সীরাতুল মাহদী খ. ১ পৃ. ১৮২-১৮৩

মির্যার এলহামী একটি ওষুধ ছিল 'বদজামে ইশক'। এটি তৈরী হত জাফরান, মিশক এবং আফিনের দ্বারা। -সীরাতুল মাহদী খ. ৩ পৃ. ৫১ বর্ণনা ৫৬৯

মির্যা কাদিয়ানী মুরীদদের দ্বারা মদ খরিদ করত। -খুতুতে ইমাম বনামে গোলাম পৃ. ৫ কলম ১

মির্যা কাদিয়ানী মিশক এবং আম্বর ব্যবহার করত। -সীরাতুল মাহদী খ. ২ পৃ. ১৩৭ বর্ণনা ৪৪৪

৮. নবুওয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, নবী সম্ভ্রান্ত বংশের হয়ে থাকেন। মির্যা কাদিয়ানীর বংশ মুগল বরলাস ছিল। ইংরেজ দালাল ছিল। মির্যার ভাসা শুনুন:

‘আমি এমন বংশের লোক যে এ গবর্মেণ্টের (ইংরেজ) অকৃত্তিম শুভাকাজ্জি। আমার পিতা মির্যা গোলাম মোরতাযা গবর্মেণ্টের দৃষ্টিতে ওফাদার, অনুগত এবং খায়েরখাহ ছিল। সরকারের নিকট তার ভাল মূল্যায়ন ছিল। মিষ্টার গ্রিফন তাকে পাঞ্জাবের রঈস বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৭ সালে তার সাধ্যের বাইরেও ইংরেজ গবর্মেণ্টের সাহায্য করেন।’-কিতাবুল বারীয়া পৃ. ৪; রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ৪

৯. নবী পুরুষ হয়ে থাকেন। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হচ্ছে

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم

‘আপনার পূর্বে অনেক পুরুষকে নবী করে প্রেরণ করেছি, যাদের নিকট আমি ওহী প্রেরণ করতাম।’ ‘পক্ষান্তরে মির্যা কাদিয়ানী নিজে মরীয়ম এবং অন্তসত্তা হবার দাবী করেছিল।’ -কিশতিয়ে নূহ ৪৭; রুহানী খাযায়েন খ. ১৯ পৃ. ৫০

১০. নবী উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন। পক্ষান্তরে মির্যা কাদিয়ানী মা-বোনকে গালি দিতে বাদ দেয়নি। সে লিখে:

(ক) “যে ব্যক্তি আমার বিজয়ের সমর্থক হবে না, তবে বুঝা গেল যে, তার হারামযাদা হবার আশ্রয় সৃষ্টি হয়েছে। সে হালালযাদা নয়।” -আনোয়ারে ইসলাম পৃ. ৩০; রুহানী খাযায়েন খ. ৯ পৃ. ৩১

(খ) “শত্রু আমাদের বিজনভূমির শুকর হয়ে যায় এবং তাদের স্ত্রীরা কুকুর থেকেও অধম।” -নাজমুল হুদা পৃ. ৫৩; রুহানী খাযায়েন খ. ১৪ পৃ. ৫৩

এমন কোন গালমন্দ নেই যা মির্যা দেয়নি।

প্রশ্ন নম্বর পাঁচ

(ক) দলীল দ্বারা প্রমাণ করুন যে, মির্যা ইংরেজের দালাল ছিল। ইংরেজদের বিশেষ ফায়দা পৌছানোর লক্ষ্যে সে ধর্মের লেবাস পরিধান করে।

(খ) এ কথা সকলের নিকট সুস্পষ্ট যে, ইংরেজ মুসলমানের জিহাদী স্প্রীট নিয়ে সব সময় শক্তিত ছিল। তারা চাইত মুসলমান থেকে এ আবেগ-স্প্রীট বিদায় নিক।

মির্য়া ইংরেজের সে অভিলাষকে কিভাবে পূরণ করে তা লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইংরেজ লাগানো শয্যের বিজ ছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করার পর নিজেদের দখল সুদৃঢ় করা এবং মুসলমানদের জিহাদী আবেগকে নষ্ট করার জন্য মির্য়াকে কাজে লাগায়। আমাদের এ কথার সত্যতা মির্য়ার লেখা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

১. “এমন খান্দানের নিকট ইংরেজ গবর্নেন্ট প্রত্যাশা করে যারা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর দক্ষতার সাথে ইংরেজ সরকারের ওফাদার এবং আত্ম উৎসর্গকারী হিসেবে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়। রোপনকৃত বৃক্ষ থেকে নেহায়েতই সতর্কতার সাথে তারা কাজ নেয়। আমাদের খান্দান ইংরেজ সরকারের কল্যাণে রক্ত বিষর্জনে কোন কার্পণ্য করেনি, এখনো করবে না।” -কিতাবুল বারীয়া পৃ. ৩৫০; রুহানী খাযায়েন খ. ১৩ পৃ. ৩৫০

২. “সর্বপ্রথম আমি সংবাদ প্রদান করতে চাই যে, আমি এমন এক খান্দানের যাদেরকে ইংরেজ সরকার দীর্ঘ সময় ধরে আপন করে নেয়। এ খান্দান ইংরেজ সরকারের প্রথম শ্রেণীর শুভাকাজ্খি। এ রচনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমার পিতা, আমার খান্দান প্রথম হতেই ইংরেজ সরকারের ওফাদার ও শুভাকাজ্খি।” -মজমুআয়ে ইশতিহারাত খ. ৩ পৃ. ৯-১০

৩. “বর্তমানে আমি প্রায় ষাট বছরে উত্তীর্ণ। স্বীয় যবান, স্বীয় কলম দ্বারা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত আছি যে, যাতে করে মুসলমানদের অন্তরকে ইংরেজ সরকারের সাচ্চা মুহাব্বত, ভালবাসা, হিতাকাজ্খি এবং সহানুভূতিতার দিকে ফিরাতে পারি। তাদের কোন কোন কম জ্ঞানের অধিকারীর অন্তর হতে জিহাদের ভুল ধারণা দূর করতে পারি।” -মজমুআয়ে ইশতিহারাত খ. ৩ পৃ. ১১

৪. “এবং আমি এতো পরিমাণ কাজ করেছি যে, বৃটিশ ইন্ডিয়ায় মুসলমানকে ইংরেজ সরকারের পাক্ষা অনুসরণের দিকে ঝুকিয়ে দিয়েছি।” -মজমুআয়ে ইশতিহারাত খ. ৩ পৃ. ১১

৫. “আমার জীবনের অধিকাংশ সময় ইংরেজ সাম্রাজ্যের সমর্থন এবং সহযোগিতায় ব্যয় হয়েছে। আমি জিহাদ নিষিদ্ধ এবং ইংরেজের অনুগত্যতার পক্ষে এতো পরিমাণ কিতাব লেখেছি এবং ইশতিহার প্রকাশ করেছি যে, যদি সেগুলো একত্রিত করা হয়, তবে তা দ্বারা পঞ্চাশটি আলমারি পূর্ণ হয়ে যাবে। আমি কিতাবগুলো আরব, মিসর, সিরিয়া, কাবুল এবং রোমেও প্রেরণ করেছি। আমার সর্বদা এ প্রচেষ্টা থাকে যে, কি করে মুসলমান ইংরেজ সাম্রাজ্যের গুভাকাজি হয়ে যায়। খুনি মাহদী এবং খুনি মসীহর ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলো এবং জিহাদের পক্ষে উদ্ভুদ্ধকারী বিষয়গুলো যা নির্বোধদের অন্তরকে নষ্ট করে দেয়, তা কি ভাবে দূর হয়ে যাবে।” -তিরয়াকুল কুলুব পৃ. ১৫; রুহানী খাযায়েন খ. ১৫ পৃ. ১৫৫-১৫৬

৬. “আমি কোন বানোয়াট বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়; বরং ঐ বিশ্বাসের আলোকে যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আমার হৃদয়ে লালিত হচ্ছে, তা দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের মাঝে এ কথা প্রচার করতে বলা হচ্ছে যে, ব্রিটিশ সরকারের যারা বাস্তবিকই দয়ালু তাদের পূর্ণ আনুগত্য করা চাই। এবং ওফাদারীর সাথে তাদের সাথে কৃতজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা আল্লাহ তাআলার নিকট গুনাহগার সাব্যস্ত হতে হবে।” -মজমুআয়ে ইশতিহারাত খ. ৩ পৃ. ১১

৭. “আমি সত্যসত্য বলছি যে, উপকারীর অকল্যাণ কামনা করা হারামী এবং জারয সন্তানের কাজ। সুতরাং আমার মাযহাব যা আমি বারবার প্রকাশ করছি -তা হল ইসলামের দু’টি অংশ। এক. খোদার অনুসরণ করা। দ্বিতীয় ঐ সাম্রাজ্যের আনুগত্য করা যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। যে অত্যাচারির হাত হতে আমাকে আশ্রয় দান করেছে। সুতরাং সে সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকার। যদি ব্রিটিশ সরকারের অবাধ্য হই, তা হবে ইসলাম, খোদা এবং রসুলের অবাধ্য।” -শাহাদাতুল কুরআন পৃ. জিম-দাল; রুহানী খাযায়েন খ. ৬, পৃ. ৩৮০-৩৮১

৮. “জিহাদ অর্থাৎ ধর্মীয় যুদ্ধের কঠোরতা আল্লাহ তাআলা আস্তে আস্তে শিথিল করে দিয়েছেন। হযরত মুসা আ.-এর সময়ে এতো কঠোরতা ছিল যে, ঈমান গ্রহণও হত্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। দুশ্শপোষ্য শিশুকেও হত্যা করা হত। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-২৩০

যুগে শিশু, বৃদ্ধ এবং নারীদের হত্যা হারাম করা হয়। অতঃপর ঈমানহীন সম্প্রদায়ের কর প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া হয়। আর মসীহ মাউদের সময় জিহাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।” -আরবাইন নম্বর ৪ পৃ. ১৩; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭; পৃ. ৪৪৩

৯.

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ☆ | دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال | ☆ | اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال |
| ☆ | دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے | ☆ | اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے |
| ☆ | اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے | ☆ | اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے |
| ☆ | منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد | ☆ | دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد |

“হে বন্ধু! জিহাদ পরিত্যাগ কর। দ্বীনের জন্য যুদ্ধ-লড়াই করা হারাম।

দ্বীনের ইমাম মসীহ এসে গিয়েছে। দ্বীনের তরে সকল যুদ্ধের এখন হল অবসান।

এখন আকাশ হতে খোদার নূরের ঘটেছে আগমন। তাই যুদ্ধ এবং জিহাদের ফতোয়া বেকার।

খোদার দুশমন সে, যে করে জিহাদ। নবী অস্বীকারকারী, যার এ বিশ্বাস।” -যমীমা, তোহফায়ে গ্লোরিয়া পৃ. ৪১-৪২; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭ পৃ. ৭৭-৭৮

প্রশ্ন নম্বর ছয়

যে সব শব্দ বা বাক্য বলার কারণে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কাফের বলা হয়, সে ধরনের শব্দ বা বাক্য সুফীয়ায়ে কেরাম হতেও বর্ণিত আছে। তবে কেবল মির্যা কাদিয়ানীকে কেন কাফের ফতোয়া দেয়া হয়? মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সুফীয়ায়ে কেরামের যে সব বাক্য দ্বারা নিজের অবস্থানকে মজবুত করতে চায়, তার যথাযথ উত্তর প্রদান করুন।

উত্তর

উল্লেখ্য যে, দ্বীনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে কুরআন ও হাদীস শরীফ এবং ইজমায়ে উম্মত তথা উম্মতের ঐক্যমত। কাদিয়ানী সম্প্রদায় বহু বিষয়ে এখানে আঘাত করে। তারা অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দ্বারা নিজেদের ধর্মমতকে প্রমাণিত করতে চায়। যা নাকি সম্পূর্ণরূপে অন্যায়।

১. এ বিষয়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে সব বাক্য পেশ করে তা দু'প্রকার। (১) স্বপ্ন (২) শরীয়ত বিরোধী বাক্য।

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে আজ পর্যন্ত যে যে ব্যক্তি শরীয়ত পরিপন্থী যে সব বাক্য ব্যবহার করেছে -তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়ত সে স্বেচ্ছায় শরীয়ত পরিপন্থী কথা বলেছে। যদি এমন হয়, তবে সে কাফের। নতুবা নেশাখস্থ অবস্থায় শরীয়ত পরিপন্থী কথা বলেছে। এটা ওয়র হিসেবে বিবেচ্য। কাদিয়ানী সম্প্রদায় মিথ্যার অবস্থা সম্পর্কে নিজেরাই বলুক, সে কি কাফের না নেশাখস্থ? উল্লেখ্য যে, উভয় অবস্থাতে কেউ নবী হবার যোগ্য নয়।

২. বুয়ুর্গদের স্বপ্নের কোন গুরুত্ব শরীয়তে নেই। আকীদার ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই। মিথ্যা কাদিয়ানীর স্বপ্নের উত্তরে বুয়ুর্গদের স্বপ্ন পেশ করা সততা-দিয়ানতের পরিপন্থী। কেননা, মিথ্যাতো নবীর দাবীদার। আর নবীদের স্বপ্নতো ওহী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বুয়ুর্গদের স্বপ্নের শরীয়তে কোন মূল্য নেই।

৩. যদি কোন ব্যক্তি নেশাবস্থায় শরীয়ত পরিপন্থী কোন কথা বলে ফেলে। নেশাকেটে যাবার পর যখন তাকে বলা হয়, তুমিতো শরীয়ত বিরোধী কথা বলেছ, তখন সে দুঃখ প্রকাশ করে বলে, আমাকে মেরে ফেলনি কেন? দেখ পুনরায় কখনো যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কথা বলি, তবে আমাকে মেরে ফেলবে। মিথ্যা কাদিয়ানী এর বিপরিত। সে শরীয়ত বিরোধী মন্তব্যগুলোকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে দেয়। জাকজমকের সাথে তা প্রচার করে। এ কারণে সে গর্ববোধও করে।

৪. অধিকাংশ কাদিয়ানীরা বলে অমুকে লেখেছেন, অমুক বুয়ুর্গ স্বপ্ন দেখেছেন। যে বুয়ুর্গের নাম নেয়া হয়, সে কিতাবটি তাঁর লেখা নয়। অন্য

কেউ লেখেছেন। এর দায়ভার কেন ঐ বুয়ুর্গের ওপর চাপানো হয়? অথচ মির্য়ার লেখিত সবগ্রন্থেই কুফরী বাক্য পাওয়া যায়।

৫. মির্য়া কাদিয়ানীতো নিজেই স্বীকার করেছে যে, ‘পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মনীষীর মন্তব্য বাস্তবপক্ষে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ হতে পারে না।’
-এযালায়ে আওহাম খ. ২ পৃ. ২৬৯; রুহানী খাযায়েন খ. ৩ পৃ. ৩৮৯

৬. তাসাউফ ইত্যাদি সম্পর্কে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক শাস্ত্রের বিষয়বস্তু এবং এর অভিজ্ঞরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকেন।। তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, আকায়েদ এবং তাসাউফসহ প্রত্যেক শাস্ত্রের পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এর মাঝে সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং জটিল বিষয় তাসাউফ শাস্ত্র। এর কারণ হল এ শাস্ত্রের কিতাবগুলোর সম্পর্ক বাহ্যিক আমলের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। যা সূফীয়ায়ে কেরামের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অবস্থায় প্রকাশ পায়। প্রচলিত শব্দ দ্বারা এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। আকীদা এবং কর্মের বিধি-বিধান তাসাউফ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু নহে। তাই কোন কোন সূফীর কোন কোন মন্তব্য-বক্তব্য আকীদা এবং আমলের ক্ষেত্রে দলীল নয়। আলহামদুলিল্লাহ! অনেক সূফী যেমন আমাদের আকাবিরগণ আছেন, তাঁদের বক্তব্যে ঐ ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন নম্বর সাত

নবীগণ যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন, আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করে দেখান। কিন্তু মির্য়ার একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়নি। এ জাতীয় কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী এখানে উল্লেখ করুন।

উত্তর

এ বিষয়ে মির্য়ার মন্তব্যকেই মানদণ্ড হিসেবে ধরতে হবে। মির্য়া বলে, “যদি আমার শত ভবিষ্যদ্বাণী হতে একটিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে আমি স্বীকার করছি যে, আমি মিথ্যাবাদী।” -হাশিয়ায়ে আরবাইন নং ৪ পৃষ্ঠা- ৩০

‘নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী কখনো উল্টে যাবার সম্ভাবনা নেই।’
-কিশতিয়ে নূহ পৃ. ৯

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী : মির্যার মৃত্যু সম্পর্কে

মির্যা কাদিয়ানী নিজের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলে, ‘আমি মক্কায় কিংবা মদীনায় মৃত্যুবরণ করব।’ -তায়কেরা পৃ. ৫৯১ ওয় সংস্করণ

বাস্তব কথা হল মির্যার মক্কা-মদীনায় মৃত্যুতো দূরের কথা, মক্কা-মদীনা দেখারও তার সুযোগ হয়নি। তার এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য না হওয়ায় নিজ বক্তব্যানুযায়ী মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়। মিলে উদ্ধৃতিটি লক্ষ করুন:

‘ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ মাউদ আ. হজ্ব করেননি, ইতিকাফ করেননি। যাকাত প্রদান করেননি। তাসবীহ রাখতেন না। আমার সম্মুখে গুইসাপ খেতে অস্বীকার করেন।’ -সীরাতুল মাহদী খ. ৩ পৃ. ১১৯ বর্ণনা নং ৬৭২

এমনিভাবে সীরাতে মাহদীর প্রথম খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় লিখে, মির্যা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে লাহোরে মারা যায়। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মক্কা এবং মদীনায় মৃত্যুবরণের ভবিষ্যদ্বাণী জঘন্য মিথ্যা। এতে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী : ভূমিকম্প এবং পীর মঞ্জুর মুহাম্মদের সন্তান লাভ সম্পর্কে

পীর মঞ্জুর মুহাম্মদ মির্যা কাদিয়ানীর ঘনিষ্ঠ মুরিদ ছিল। তার জ্ঞী অন্তসত্তা হবার পর মির্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে বলে পুত্র সন্তান হবে। মির্যার ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণীটি নিম্নরূপ:

”پہلے یہ وحی الہی ہوئی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا۔ بہت جلد آنے والا ہے اور اسی کے لئے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اسی زلزلہ کیلئے ایک نشان ہوگا اس لئے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔“

‘প্রথমত কিয়ামতের ন্যায় একটি ভূমিকম্প হবে। এটি খুব শিঘ্রই সংঘটিত হবে। এর নিদর্শন হল পীর মঞ্জুর মুহাম্মদ লুধিয়ানবীর জ্ঞী মুহাম্মদী বেগমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। ঐ সন্তান

ভূমিকম্পের একটি নিদর্শন। তার নাম হবে বশীরুদ্দোলা।' -হাকীকাতুল ওহী হাশিয়া, রুহানী খাযায়েন খ. ২২ পৃ. ১০৩

সূধী পাঠক! মির্য়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পুত্র সন্তান জনগ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু খোদার কারিশ্মায় পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কণ্যা সন্তান জনগ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মির্য়ার বক্তব্য হল, এ গর্ববস্থায় পুত্রসন্তান জনগ্রহণ করবে, এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ভবিষ্যতে তো জনগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ মহিলাই মারা যায়। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা প্রমাণিত হল। ঐ মহিলা পুত্র সন্তান জন্ম দেয়নি এবং ভূমিকম্পও হয়নি। মির্য়া যে মিথ্যাবাদী এবারও তা প্রমাণিত হল।

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী : তিন বছরের মেধ্য রেল চলবে

ইমাম মাহদী এবং মসীহ মাউদের নিদর্শন হিসেবে মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবী করে যে, মক্কা-মদীনায় তিন বছরের মধ্যে ট্রেন চলবে। মির্য়ার বক্তব্য নিম্নরূপ:

‘এ ভবিষ্যদ্বাণী মক্কা মুআয্যামা এবং মদীনা মুনাওয়ারার রেল চলার দ্বারা বিশেষভাবে পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, রেল সার্ভিস দামেশক থেকে শুরু হয়ে মদীনা হয়ে মক্কা পর্যন্ত আসবে। আশা করা যায় কয়েক বছরের ভিতর এ কাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন যে উট তেরশ বছর ধরে হাজীদেরকে মক্কা হতে মদীনায় নিয়ে আসছে, তা বেকার হয়ে যাবে। আরব এবং সিরীয়াতে একটি বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হবে। এ কাজ খুবই দ্রুততার সাথে চলছে। আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যে, মাত্র তিন বছরের মধ্যে মক্কা-মদীনার রেলের কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে। হাজীরা আরব বন্ধুদের ন্যায় পাথর খাবার পরিবর্তে ফল খেতে খেতে মদীনায় পৌঁছবে।’ -তোহফায়ে গ্লোরিয়া পৃ. ১০৩; রুহানী খাযায়েন খ. ১৭ পৃ. ১৯৫

কাদিয়ানীর অনুসারীদের নিকট এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মক্কা-মদীনার মাঝে কি ট্রেন চলছে? উত্তর যদি না বোধক হয়, অবশ্যই তাই হতে হবে -তবে কি মির্য়া মিথ্যুক নয়? গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মিথ্যাবাদী হবার জন্য আর কি দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন আছে? এ কিতাবটি ১৯০২ সালে লেখা হয়েছে। মির্য়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৯০৫ সালের ভিতর ট্রেন চলার

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়াত-২৩৫

কথা। শত বছরের বেশী হয়ে গেল, কিন্তু এখন পর্যন্ত ট্রেন চলছে না। এমনকি যে ট্রেন সিরিয়া থেকে মদীনা পর্যন্ত চলত, তাও ঐ মিথ্যুকের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী : গোলামুন হালিম-এর সুসংবাদ

মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার চতুর্থ ছেলে মুবারক আহমদকে মুসলেহে মাউদ, বয়সপ্রাপ্ত *كان الله نزل من السماء* (আল্লাহ যেন আকাশ হতে অবতরণ করেছেন) ইত্যাদি এলহামের সত্যায়নকারী সাব্যস্ত করেছে। উক্ত পুত্র সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সেই মারা যায়। এ সন্তান মৃত্যুর পর সব মহল হতে মির্য়ার ওপর তিরস্কারের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। অতঃপর মির্য়া এলহাম তৈরী করে মুরিদদের অন্তর ঠাণ্ডা করার প্রয়াস চালায়। সে মোতাবেক ১৬ ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে একটি তথাকথিত এলহাম শুনায়-

انا نبشرك بغلام حلیم 'অবশ্যই আমি তোমাকে একজন সহনশীল সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করব।' -আল-বুশরা খ. ২ পৃ. ১৩৪

এর এক মাস পর পুনরায় এলহাম শুনায়-

'আপনার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে অর্থাৎ আগামীতে জন্মগ্রহণ করবে।' انا نبشرك 'আমি তোমাকে একজন সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।' ينزل منزل المبارك 'সে মুবারক আহমদের সাদৃশ্য হবে।' -আল-বুশরা খ. ২ পৃ. ১৩৬

এর কিছুদিন পর পুনরায় এলহাম শুনায়:

سأهب لك غلاما زكيا. رب هب لي ذرية طيبة. انا نبشرك بغلام اسمه يحيى.

'আমি একজন পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমার খোদা আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর। তোমাকে একজন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া।' -আল-বুশরা খ. ২ পৃ. ১৩৬

মির্য়ার এলহামের আলোকে বুঝা যায় যে, তার একটি পবিত্র পুত্র সন্তান হবে। নাম হবে ইয়াহইয়া, যা মুবারক আহমদের সাদৃশ্য এবং

স্থলাবিধিক্ত হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর মির্যার গৃহে আর কোন পুত্র সন্তানই জন্মগ্রহণ করেনি। তাই এসব এলহাম যে মিথ্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ আল্লাহ তাআলা নবী-গণকে মুজিয়া দানে ধন্য করেন। মুজিয়ার মাধ্যমেই তাঁরা অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলেন। মুজিয়া সাধারণভাবে সংঘটিত ঘটনার বিপরিত ঘটনাবলীকে বলা হয়। মিথ্যা নবীদাবীদারদের নিকট হতে কোন মুজিয়া প্রকাশ পায়না। তাই মির্যার নিকট হতে কোন মুজিয়া প্রকাশ পায়নি।

প্রশ্ন নম্বর আট

(ক) মুহাম্মদী বেগমের বিবাহ সম্পর্কে মির্যার সাংঘর্ষিক দাবীগুলো সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যাক্ত করুন।

(খ) আমরা জানি যে, নবীদের কথা সাংঘর্ষিকপূর্ণ হয় না। অথচ মির্যার কথা এ দ্বারা পরিপূর্ণ। কমপক্ষে এর তিনটি দৃষ্টান্ত পেশ করুন।

উত্তর

মুহাম্মদী বেগম হল মির্যার মামাত ভাই মির্যা আহমদ বেগের কন্যা। মির্যা কাদিয়ানী তাকে বলপূর্বক বিবাহ করতে চেয়েছিল। কোন এক জমিনের হেবানামা সংক্রান্ত বিষয়ে মির্যা আহমদ বেগের মির্যা কাদিয়ানীর স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। তিনি তার নিকট গিয়ে স্বাক্ষর করার আবেদন করলে, মির্যা একে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উপযুক্ত সময় মনে করে। সে আহমদ বেগকে বলল, এস্তেখারা করার পর আমি স্বাক্ষর করব। কিছু দিন পর পুনরায় আহমদ বেগ স্বাক্ষর করতে বললে মির্যা উত্তরে বলে, তোমার মেয়ে মুহাম্মদী বেগমকে আমার সাথে বিবাহের শর্তে স্বাক্ষর করব। এতে কল্যাণ হবে। মির্যার ধমকের ভাষা ছিল নিম্নরূপ।

‘আল্লাহ আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, এ ব্যক্তি অর্থাৎ আহমদ বেগের প্রথম কন্যার বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেও এবং তাকে বল সে তোমাকে প্রথমে জামাই হিসেবে বরণ করুক। তোমার নূর হতে রশ্মি অর্জন করুক। আরো বলো আমাকে ঐ জমিন হেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যার প্রত্যাশা তুমি কর। এর সাথে আরো জমিন দেয়া হবে এবং বিভিন্নভাবে করুনা করা হবে। তবে শর্ত হল, তোমার মেয়ের বিবাহ

আমার সাথে দিতে হবে। তুমি যদি আমার কথা মেনে নাও, তবে আমিও তোমার কথা মেনে নিব। আর যদি তুমি কবুল না কর, তবে খবরদার! আমাকে খোদা বলেছেন যে, যদি কোন ছেলের সাথে ঐ কণ্যার বিবাহ হয়, তবে তা কণ্যার জন্য এ বিবাহ বরকতময় হবে না এবং তোমার জন্যও নয়।’ -আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম; খাযায়েন খ. ৫ পৃ. ৫৭২-৫৭৩

মির্খার হুশিয়ারী বাক্যের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হল, এক পর্যায়ে মির্খা আহমদ বেগ এবং তার পরিবারের লোকেরা মুহাম্মদী বেগমের বিবাহ মির্খা কাদিয়ানীর সাথে দিতে সাফ অস্বীকৃতি জানায়। মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য বহু কৌশল অবলম্বন করে। মুহাম্মদী বেগমের বিবাহ মির্খা সুলতান আহমদ নামক এক ব্যক্তির সাথে হয়। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তাকে আর বিবাহ করতে পারেনি। এক পর্যায়ে সে মারা যায়। এ বিষয়ে মির্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা নিম্নরূপ:

‘খোদা তাআলা এ অধমের বিরোধী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছেন যে, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি, যার নাম আহমদ বেগ, যদি সে তার বড় মেয়ের বিবাহ (মুহাম্মদী বেগম) এ অধমের সাথে না দেয়; তবে সে তিন বছরের মধ্যে মারা যাবে। এমনকি আরো অল্প সময়ের ভিতর মারা যাবে। আর যে বিবাহ করবে, সে বিবাহের দিন হতে নিয়ে আড়াই বছরের ভিতর মারা যাবে। অবশেষে ঐ মহিলা অধমের বিবি হবে।’ -ইশতিহার ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং তাবলীগে রেসালত খ. ১ পৃ. ৬১। মজমুআয়ে ইশতিহারাত খ. ১ পৃ. ১০২ হাশিয়া

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যায় মির্খা কাদিয়ানী বলে,

‘আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী কেবল একটি নয়; বরং এতে ছয়টি দাবী রয়েছে। এক. বিবাহ পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা। দুই. বিবাহের সময় পর্যন্ত ঐ মেয়ের পিতার জীবিত থাকা। তিন. বিবাহের পরে ঐ মেয়ের পিতার অল্প সময়ের ভিতর মারা যাওয়া। যা তিন বছর পর্যন্ত পৌছবে না। চার. তার স্বামীর আড়াই বছরের ভিতর মারা যাওয়া। পাঁচ. ঐ মেয়ে আমার বিয়ে করা পর্যন্ত জীবিত থাকা। ছয়. তার আত্মীয়দের বিরোধিতা

আয়নায়ে কাদিয়ানীয়ত-২৩৮

সত্ত্বেও বিবাহের সব রুসম ভেঙ্গে আমার বিবাহে আসা।’ -আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম; রুহানী খাযায়েন খ. ৫ পৃ. ৩২৫

এ সম্পর্কে আরবী এলহাম নিম্নরূপঃ

كذبوا بايتنا وكانوا بها يستهزؤون فسيكفيهم الله ويردها اليك لا تبديل
لكلمت الله ان ربك فعال لما يريد. انت معي وانا معك عسى ان يبعثك ربك
مقاما محموداً.

-আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রুহানী খাযায়েন খ.৫, পৃ. ২৮৬-২৮৭

এছাড়াও আঞ্জামে আখহামের ৩১ পৃষ্ঠায় এবং তাযকেরার বিভিন্ন স্থানে এ ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন শব্দে উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তাআলার অপার মহিমায় মির্যা কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তার একটি দাবীও বাস্তবে সংঘটিত হয়নি। মুহাম্মাদী বেগমের স্বামী আড়াই বছর তো দূরের কথা মির্যার মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মাদী বেগমও ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে এক মিথ্যুক, ভণ্ড বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি ১৯ নভেম্বর ১৯৬৬ সালে মুসলমান হিসেবে লাহোরে ইন্তিকাল করেন।

মোট কথা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার এ ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারাই একজন মিথ্যুক, ভণ্ড, প্রতারক, ধোকাবাজ হিসেবে প্রমাণিত হয়। কোন বিবেকবান মানুষ তাকে সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী বলতে পারে না।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মুরীদদের অবস্থান

২৬ মে ১৯০৮ সালে লাহোরে যখন কাদিয়ানী ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, মুহাম্মাদী বেগমের সাথে বিবাহ হয়নি, তখন কাদিয়ানীরা বলে বেড়াত যে, এ বিবাহ জান্নাতে হবে। এর উত্তরে যখন বলা হল যে, মুহাম্মাদী বেগম মির্যার ওপর ঈমান আনেনি বিধায় কাদিয়ানীর ধারণা মতে তার অস্বীকারকারী জাহান্নামে যাবে। তবে কি মির্যা কাদিয়ানী জাহান্নামে বরাত নিয়ে যাবে? এর উত্তরে কাদিয়ানীরা বলে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অস্পষ্ট

বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এখন বলতে হয় যে, কাদিয়ানীদের কি এ কথাও জানা নেই যে, নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহর ওয়াদা। তা অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে। কখনো এর ব্যতিক্রম হয় না।

মির্যার বিরোধপূর্ণ বক্তব্য

একজন সত্যনবী যা বলেন তা ওহীর আলোকেই বলে থাকেন। এ কারণে তাঁর কথা বিরোধপূর্ণ বক্তব্যের দোষ হতে মুক্ত-পবিত্র। বিরোধপূর্ণ বক্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, বক্তব্য প্রদানকারী যা বলছেন, তা আল্লাহর পক্ষ হতে বলছেন না; বরং তা নিজের পক্ষ হতে বানানো, মনগড়া বক্তব্য। পবিত্র কুরআন বলছে— **لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ** অর্থাৎ যদি তা গায়রুল্লাহর পক্ষ হতে হত, তবে এতে অনেক বৈপরিত্য পেত। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের আলোকে যদি আমরা মির্যার বক্তব্যকে পরখ করি তবে তা মানুষের হাসির খোরাক বৈ কিছু হবে না। এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. ‘মির্যা সাহেবের নিকট প্রশ্ন করা হল, আপনি তো ফতহে ইসলাম নামক কিতাবে নবুওয়তের দাবী করেছেন। উত্তরে মির্যা বলল, নবুওয়তের দাবী নয়; বরং আল্লাহর হুকুমে মুহাদ্দিস হবার দাবী করি।’—এযালায়ে আওহাম খ. ১ পৃ. ৪২১-৪২২, রুহানী খাযায়েন খ. ৩ পৃ. ৩২০

এর বিপরিত অন্যত্র মির্যা বলে, ‘যদি খোদার পক্ষ হতে গায়বের সংবাদ বাহীকে নবী না বলা হয়, তবে বল কোন নামে তাকে ডাকা হবে? যদি বল, তার নাম মুহাদ্দিস রাখা চাই। তবে আমি বলব, তাহদীস শব্দের অর্থ কোন অভিধানে গায়েব প্রকাশকে বলা হয়নি।’—এক গলতি কা এযালা পৃ. ৫; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২০৯

২. ‘খাতামুল মুসরসালীনের পরে কোন নবুওয়ত এবং রেসালতের দাবীদারকে মিথ্যুক এবং কাকেরই বলে জানব। আমার বিশ্বাস রেসালতের ওহী হযরত আদম আ. থেকে শুরু হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে শেষ হয়েছে।’—মজমুআয়ে ইশতিহারাৎ খ. ১ পৃ. ২৩০

এর বিপরিত মির্যার বক্তব্য হল, ‘আমার দাবী আমি হলাম নবী এবং রসূল।’ -মালফুযাত খ. ১০ পৃ. ১২৭

৩. ‘এ কথাতো সত্য যে, মসীহ স্বীয় মাতৃভূমি গালিলে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এ কথা কখনো সত্য নয় যে, যে দেহ দাফন হয়ে গিয়েছে, তা পুনরায় জীবিত হবে।’ -এযালায়ে আওহাম পৃ. ৪৭২; রুহানী খাযায়েন খ. ৩ পৃ. ৩৫৩

এর বিপরিত মির্যা বলে ‘এবং হযরত মসীহ স্বীয় দেশ হতে বের হয়ে যান। যেমন বলা হয়েছে কাশ্মিরে আগমন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। কাশ্মিরে এখনো তাঁর কবর বিদ্যমান।’ -সতবচন হাশিয়া ১৬৪; রুহানী খাযায়েন খ. ১০ পৃ. ৩০৭

৪. ‘আমি কেবল সাদৃশ্য হবার দাবী করি। আমার এটাও দাবী নয় যে, কেবল আমার দ্বারাই সাদৃশ্য হবার ধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে; বরং আমার মতে আগামীতে আমার ন্যায় আরো দশ হাজার মসীহর সাদৃশ্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে।’ -এযালায়ে আওহাম পৃ. ১৯৯; রুহানী খাযায়েন খ. ৩ পৃ. ১৯৭

এর বিপরিত অন্যত্র বলে, ‘যদি কুরআন আমার নাম ইবনে মরীয়ম না রাখে তবে আমি মিথ্যুক।’ -তোহফাতুলনাদওয়াহ পৃ. ৫, রুহানী খাযায়েন খ. ১৯, পৃ. ৯৮

৫. ‘এখানে কেউ যতে এ ধারণা না করে যে, আমি এ বক্তৃতায় নিজেকে হযরত মসীহর ওপর ফযীলত দিচ্ছি। কেননা, এটি একটি আপেক্ষিক ফযীলত, যা নবীর তুলনায় অনবীকে দেয়া হয়।’ -তিরইয়াকুল কুলুব পৃ. ১৫৭, রুহানী খাযায়েন খ. ১৫ পৃ. ৪৮১

এর বিপরিত মির্যা অন্যত্র লিখে ‘খোদা এ উম্মতের মাঝে মসীহ মাউদকে প্রেরণ করেছেন, যিনি পূর্বের মসীহ হতে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।’ -রিভিউ অফ রিলিজিয়াস নম্বর ৬ পৃ. ২৫৭, খ. ১; হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৪৭, রুহানী খাযায়েন খ. ২২, পৃ. ১৫২, দাফিউল বালা পৃ. ১৩, রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২৩৩

নিম্নে তার আরো একটি বিরোধপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করা হবে। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হযরত ঈসা আ.কে মৃত হিসেবে প্রমাণের জন্য কতই না চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তার এ দাবীর পক্ষে কুরআন-হাদীস ও

ইতিহাস ভিত্তিক কোন প্রমাণ ছিল না। হযরত ঈসার মৃত্যুর স্থান এবং সমাধিস্থল নিয়ে মিথ্যা একেক সময় একেক ধরনের মন্তব্য করে।

সে সেতারারে কায়সারীয়া নামক গ্রন্থে লিখেঃ

‘অকাউ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আ.-এর কবর কাশ্মিরের শ্রীনগরে অবস্থিত। তিনি ইহুদীদের দেশ হতে পালিয়ে নসীবাইনের পথে আফগানিস্তানে আসেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নুমান পর্বতে অবস্থান করেন। অতঃপর কাশ্মিরে আগমন করেন। ১২০ বছর বয়সে শ্রীনগরে ইন্তিকাল করেন। শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় তাকে দাফন করা হয়।’-সেতারারে কায়সারীয়া পৃ.১২-১৩

মিথ্যার এ সব বিরোধপূর্ণ বক্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, মিথ্যা যা কিছু বলত সবই নিজের পক্ষ হতে বলত। আল্লাহর পক্ষ হতে নয়।

প্রশ্ন নম্বর নয়

و لو تقول علينا بعض الاقاويل. لآخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين .

‘তিনি যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করতেন, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে ফেলতাম তার হৃৎপিণ্ডের শিরা’
-সূরা হাক্বা ৪৪-৪৫।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত দ্বারা মিথ্যা কি প্রমাণ করতে চায় তা উল্লেখ করে এর উত্তর লেখুন।

هلا شفقت قلبه (তুমি কি তার অন্তর ছিড়ে দেখেছ) এ দ্বারা মিথ্যা কি বলতে চায়? এমনিভাবে হযরত আবু মাহযুরা রাযি.-এর আযান দ্বারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে? বিষয়গুলোর সঠিক উত্তর প্রদান করুন এবং মিথ্যার দাবী খণ্ডন করুন।

উত্তর

و لو تقول علينا بعض الاقاويل. لآخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين .

-সূরা হাক্বা ৪৪-৪৬

উক্ত আয়াতের অর্থে কাদিয়ানী বলে, আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন, যদি মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার সম্পর্কে কোন মিথ্যা রচনা করে, তবে আমি হৃৎপিণ্ডের শিরা কেটে ধ্বংস করে দিব।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মির্যা কাদিয়ানী আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। তাই তাকে ২৩ বছরের ভিতর ধ্বংস করে দেয়া হত। তার শাহরগ কেটে দেয়া হত। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের ২৩ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

উত্তর -১

এ আয়াতের পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তাআলার এ ঘোষণা কোন নীতিমালা হিসেবে নয়, বরং এটি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, যা কেবল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাও বাইবেলে উল্লেখ হয়েছে যে, যদি আগত নবী নিজের পক্ষ হতে কোন মিথ্যা এলহাম অথবা নবুওয়তের দাবী করে, তবে দ্রুত মারা যাবে। বাইবেলে নিম্নরূপ উল্লেখ হয়েছে:

‘আমি তাদের জন্য তাদের মধ্য হতে তোমার ন্যায় একজন নবী প্রেরণ করব। তার মুখে আমার কালাম উচ্চারণ করা, আমি তাকে যা নির্দেশ দিব (উদ্দেশ্য মুহাম্মদে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা তিনি তাদের নিকট (স্বীয় উম্মতের নিকট) প্রচার করবেন। যে কেউ আমার কথাকে না মানবে, আমি তার থেকে তার হিসাব নিব। কিন্তু যে নবী বিয়াদবী করে আমার নামে এমন কথা বলে, যা আমি তাকে বলতে নির্দেশ দেয়নি, অথবা অন্যান্য মাবুদের নামে কিছু বলে, তবে এ নবীকে হত্যা করা হবে।’ -ইঞ্জিল মুকাদ্দাস, আহাদ নামা কদীম ১৮৪; কিতাব ইস্তিসনা বাব ১৮ আয়াত- ১৮-২১

উত্তর -২

যদিও এ নীতিমালাকে ব্যাপকভিত্তিক মেনে নেয়া হয়, তবুও তা সত্য নবীগণের বেলায় প্রজোয্য হবে, মিথ্যা নবী দাবীদারদের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, মিথ্যা নবী দাবীদারদের বেলায় অবকাশ পাওয়া নীতিমালার জন্য

প্রতিবন্ধক নয়। ফেরাউন, নমরুদ, বাহাউল্লাহ ইরানী প্রমুখের খোদার এবং নবী দাবীদাররা বেশ অবকাশ পেয়েছে।

উত্তর -৩

এ দলীলের আলোকে মির্যা কাদিয়ানী নিজেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়। ১৯০১ সালে মির্যা নবুওয়তের দাবী করে। তার অনুসারীরা দু'দলে বিভক্ত। লাহোরী গ্রুপ তাকে নবী মানে না। এর বিপরিত কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাকে নবী স্বীকার করে। তাকে যারা নবী মানে, তাদের মতে মির্যা কাদিয়ানীর মৃত্যু ১৯০৮ সালে হয়। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মির্যা কাদিয়ানী ২৩ বছর পূর্ণ করার পূর্বে উদরাময় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ায় তার দলীল মিথ্যা হয়ে যায়।

এর উত্তর - ১৮ شققت

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে হযরত উসামা রাযি. আরয করলেন, যুদ্ধে ওমুক ব্যক্তি আমার সামনে পড়ে যায়। আমার তরবারীর আওতায় এসে যাওয়ায় সে কালেমা উচ্চারণ করতে থাকে। তারপরও আমি তাকে হত্যা করি। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এ কাজ হতে আমি দায়মুক্ত। তিনি আরয করলেন, হে রসূলুল্লাহ! সে তো মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য কালেমা পাঠ করে। তার এ কথায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ۱۸ شققت (তুমি কি তার পক্ষ বিদীর্ণ করেছ?)

এ থেকে কাদিয়ানী প্রমাণ করতে চায় যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কালেমা পাঠ করবে তার এ কালেমা পাঠ গ্রহণযোগ্য হবে। এর উত্তর হল এটি ঐ ব্যক্তির বেলায় প্রজোয্য যার অবস্থা অজ্ঞাত। কিন্তু যদি তার পক্ষ হতে এমন কোন বক্তব্য-মন্তব্য পাওয়া যায়, যা কুফরের প্রতি ইঙ্গিতবহ, তবে তাকে কাফিরই বলা হবে। নতুবা তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রজোয্য হবে না। যার পক্ষ থেকে এরূপ ইঙ্গিত না পাওয়া যাবে, তাকে কাফের বলা হবে না। কাদিয়ানীদের এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেয়া সম্পূর্ণরূপে ভুল। কেননা, তাদের কুফরের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ভুরিভুরি। তাই উম্মতের সর্বসম্মত মতে কাদিয়ানী এবং তার অনুসারী সকলেই কাফের-অমুসলিম।

(৫) “এবং আমাকে সুসংবাদ দেয়া হয়, যে তোমার পরিচয় পাবার পরও তোমার সাথে শত্রুতা এবং বিরোধিতা করবে, সে জাহান্নামী।” -তায়কেরা পৃ. ১৬৮, ২য় সংস্করণ

(৬) “খোদা তাআলা আমার নিকট প্রকাশ করেছেন যে, যার নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছেছে এবং আমাকে মানেনি, সে মুসলমান নয়।” -তায়কেরা পৃ. ৬০০, ২য় সংস্করণ

(৭) “আমি নিজেই এ কথার দাবীদার যে, দুনিয়াতে এমন কোন নবী আগমন করেননি যিনি ইজতেহাদী ভুল করেন নি।” -তাতমীমায়ে হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৩৫; রুহানী খাযায়েন খ. ২২ পৃ. ৫৭৩

(৮) “খোদা তাআলা আমাকে এতো নিদর্শন দেখিয়েছেন, যদি নূহের যুগে দেখানো হত, তবে তারা নিমজ্জিত হত না।” -তাতমীমায়ে হাকীকাতুল ওহী পৃ. ১৩৭; রুহানী খাযায়েন খ. ২২ পৃ. ৫৮৫

(৯) “এ উম্মতের ইউসূফ অর্থাৎ এ অধম (মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) বনী ইসরাঈলের ইউসূফ হতে উত্তম। কেননা, এ অধম বন্দী হবার প্রার্থনা করেও বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু ইউসূফ ইবনে ইয়াকুবকে বন্দী করা হয়।” -বারাহীনে আহমদীয়া খ. ৫ পৃ. ৯৯; রুহানী খাযায়েন খ. ২১ পৃ. ৯৯

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে যে গালমন্দ করেছে, তা বিশ্বের সকল রেকর্ডকে ভঙ্গ করেছে। যেমন-

(১০) “তার (হযরত ঈসা আ.) গালি দেয়া, অপরের দোষচর্চার কুঅভ্যাস ছিল। ক্ষুদ্র বিষয়ে গোসসা করতেন। নিজেকে আবেগের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। আমি একে দুঃখজনক মনে করি না। কেননা, তিনি ইহুদীদের গালি দিতেন, আর ইহুদীরা তার থেকে প্রতিশোধ নিত। এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, তার (ঈসা আ.) সীমাহীন মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল।” -হাশিয়ায়ে আজ্জামে আখহাম পৃ. ৫; রুহানী খাযায়েন খ. ১১ পৃ. ২৮৯

হযরত আবু মাহযুরা রাযি.-এর আযানের উত্তর

হযরত আবু মাহযুরা রাযি.-এর বয়স তখনো কম। তিনি এখনো মুসলমান হননি। একদা তিনি খেলায় রত ছিলেন। হযরত বেলাল রাযি. আযান দিচ্ছিলেন। তিনি তা নকল করে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে লাগলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে তাকে ডেকে আযানের শব্দগুলো পুনরায় উচ্চারণ করতে বললেন। হযরত আবু মাহযুরা রাযি. বলতে লাগলেন। কিন্তু **اشهد ان محمد رسول الله** পর্যন্ত বলার পর তিনি সংকোচবোধ করতে লাগলেন। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখে মুখে বললে তিনিও তাঁর সাথে সাথে উচ্চারণ করতে লাগলেন। তিনি তার ললাট, বুকে হাত দ্বারা স্পর্শ করেন এবং তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর হৃদয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। এ দ্বারা কাদিয়ানী এ কথা বলতে চায় যে, আবু মাহযুরা অমুসলিম অবস্থায় আযান দেন। তাই আমাদেরও আযান দেয়া জায়েয। উত্তরে বলতে হয় যে, আবু মাহযুরাকে তো আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরও কি এরূপ অনুমতি দেয়া হয়েছে কিনা?

উত্তর

আযান মুসলমানদের একটি সংরক্ষিত নিদর্শন। কোন অমুসলিমের জন্য এ নিদর্শনের ব্যবহারের কোনভাবেই অনুমতি নেই। অমুসলিমরা যদি ইসলামী সংরক্ষিত নিদর্শনগুলো ব্যবহার করতে থাকে, তবে এগুলো শিশুদের খেলনার বস্তুরূপে পরিণত হবে। ইসলামের ইতিহাসে কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না যে, নামাযের জন্য অমুসলিম কর্তৃক আযান দেয়া হয়েছে? যে দিন হযরত আবু মাহযুরা রাযি. হযরত বেলালের নকল করে আযান দিয়েছিলেন, সে দিন তো হযরত বেলাল রাযি. নামাযের উদ্দেশ্যেই আযান দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন নম্বর দশ

প্রমাণ করুন যে, মির্যা কাদিয়ানী অসৎ, অসভ্য, গালমন্দকারী এবং দুর্ব্যবহারকারী ছিল। সে তার বিরোধীদের গালি দিত, আশীয়ায়ে কেরামের বিশেষ করে হযরত ঈসা আ.-এর কুৎসা বর্ণনা করত। এ বিষয় সংক্ষিপ্ত কিছু লেখুন।

উত্তর

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জন্ম ১৮৩৯ কিংবা ১৮৪০ সালে মির্যা গোলাম মুর্তাযার ঘরে হয়। ভারতের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রাম হল তার জন্মস্থান। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানের মাঝে অনৈক্য এবং জিহাদকে হারাম ঘোষণা করিয়ে নিজেদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মির্যা গোলাম আহমদকে ব্যবহার করে। সে এতোই গালমন্দকারী ছিল যে, সামান্য বিষয়ে মানুষকে গালমন্দ করতে সংকোচবোধ করত না। তার বিরোধীদেরকে হারামযাদা, বেশ্যার সন্তান, কাফের এবং জাহান্নামী বলা তার সকাল-সন্ধ্যার ওয়ীযা ছিল। সে তার গ্রন্থে লিখে—

(১) “এবং যে আমাদের বিজয়ের দাবীদার হবে না, স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, তার হারামযাদা হবার আশ্রয় রয়েছে এবং সে হালালযাদা নয়।”
—আনোয়ারুল ইসলাম পৃ. ৩০; রুহানী খাযায়েন খ. ৯ পৃ. ৩১

(২) “যে আমার বিরোধী তার নাম খ্রীস্টান, ইহুদী এবং মুশরিক রাখা হয়েছে।” —নুয়ুলুল মাসীহ হাশিয়া পৃ. ৪; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ৩৮২

(৩) “আমার এ গ্রন্থগুলোকে প্রত্যেক মুসলমান মুহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখে এবং এর জ্ঞানভাণ্ডার দ্বারা উপকৃত হয়। আমার দাওয়াতের সত্যায়ন করে তা গ্রহণ করে, কিন্তু বেশ্যার সন্তানরা আমার সমর্থন করে না।”
—আইনায়ে কামালাতে ইসলাম পৃ. ৫৪৭-৫৪৮; রুহানী খাযায়েন খ. ৫ পৃ. ৫৪৭-৫৪৮

(৪) “দুশমন আমাদের জঙ্গলের শুকর এবং তাদের স্ত্রীরা কুকুর থেকেও অধম।” —নাজমুল হুদা পৃ. ৫৩; রুহানী খাযায়েন খ. ১৪ পৃ. ৫৩

(১১) “অত্যন্ত লজ্জার কথা হল তিনি (ঈসা আ.) ‘পর্বত শিক্ষা’ যাকে ইঞ্জিলের হার্ড বলা হয়, তা ইহুদীদের কিতাব তালমুদ হতে চুরি করে লিখেছেন। অতঃপর নিজের শিক্ষা বলে প্রকাশ করেছেন।” -হাশিয়া আঞ্জামে আখহাম পৃ. ৬; রুহানী খাযায়েন খ. ১১ পৃ. ১৯০

(১২) “তঁার (ঈসা আ.) পরিবারতো অত্যন্ত পবিত্র। তার তিন স্তরের দাদী এবং নানী অসং ও ব্যভিচারিণী ছিল। এ রক্তই তার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কিন্তু সম্ভবত এটি খোদার জন্য একটি শর্ত। তার যাযাবর নারীর সাথে সংশ্রব সম্ভবত এ কারণেই হয়েছিল যে, বংশীয় সম্পৃক্ততা এখানে পাওয়া যায়। নতুবা কোন পরহেযগার মানুষ এক যাযাবর যুবতীকে এমন সুযোগ দিতে পারে না যে, তার মাথা স্থায়ী নাপাক হাত স্পর্শ করবে, ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের আতর তার মাথায় মালিশ করবে এবং নিজের চুলের দ্বারা তার পা মালিশ করবে। বুদ্ধিমানরা বুঝে নিতে পারবে তিনি কোন পকৃতির মানুষ ছিলেন।” - যমীমা আঞ্জামে আখহাম পৃ. ৭; রুহানী খাযায়েন খ. ১১ পৃ. ২৯১

(১৩) “ইউরোপের লোকদের মদ যে পরিমাণ ধ্বংস করেছে, এর প্রধান কারণই হল হযরত ঈসা আ. মদ পান করতেন। কোন অসুস্থতা কিংবা পুরাতন অভ্যাসের কারণে সম্ভবত মদ পান করতেন।” -কিশতীয়ে নুহ হাশিয়া ৭৩; রুহানী খাযায়েন খ. ১৯ পৃ. ৭১

(১৪) “খোদা এ উম্মতের মাঝে মসীহ মাউদকে প্রেরণ করেছেন, যিনি প্রথম মসীহ হতে সকল মর্যাদার বেলায় উন্নত। তিনি দ্বিতীয় মসীহর নাম গোলাম আহমদ রেখেছেন।” -দাফেউল বালা পৃ. ১৩; রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২৩৩

(১৫) “ইবনে মরীয়মের আলোচনা পরিত্যাগ কর, গোলাম আহমদ তার চেয়েও উত্তম।” -দাফেউল বালা পৃ. ২০, রুহানী খাযায়েন খ. ১৮ পৃ. ২৪০

সূধী পাঠক! এ ধরনের কুমন্তব্য এমন জঘন্য ব্যক্তি করছে, যে নিজেই শারাবের আশক্ত ছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন খুতুতে ইমাম বনামে গোলাম পৃ. ৫) গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজে পর নারী দ্বারা শারীরিক সেবা নিত। -সীরাতে মাহদী খ. ৩ পৃ. ২১০

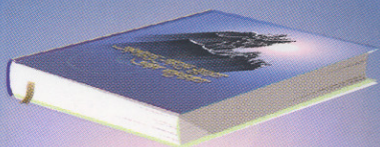
ঔষধের সাথে আফিম সেবন করত। -তায়কেরা পৃ. ৭৬১, ৩য় সংস্করণ

এমনিভাবে সে নগ্ননারীদের প্রদর্শনী করত। -তায়কেরা পৃ. ১৯৯, ৩য় সংস্করণ

এ কারণেই তো তার অনুসারীদের মধ্যে লাহোরী গ্রুপ যারা তাকে নবী নয় আল্লাহর ওলী বনে মানে, তারা তাকে ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত করে। -আল ফযল কাদিয়ানী খ. ২৬, নম্বর ২০০ তারিখ ৩১ আগস্ট ১৯৩৮

এরকম বদ স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি যদি দাবী করে আমি নবী, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তবে তার চেয়ে বড় অন্যায়কারী, মিথ্যাবাদী আর কে আছে? না, কখনো না। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলতেন, মির্যা কাদিয়ানী ফেরাউন, হামান থেকেও বড় কাফের। এ ফেতনার বিষবাষ্প থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গোটা উম্মতকে রক্ষা করা আমাদের মৌলিক দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্য আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন!

برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله اولا وآخرا



আকায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

লেখক : মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাহির মাসউদ

ভাষান্তর : মুহাম্মাদ মুকাদ্দাহ হুছাইন

খানকাহু সিরাজিয়া
বনানী, ঢাকা